الأغلاط الشائعة

(মাসিক আলকাউসারে 'প্রচলিত ভুল' বিভাগে প্রকাশিত)
[মুহাররম ১৪২৬ হিজরী হতে মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী পর্যন্ত]

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা

الأغلاط الشائعة

প্রচলিত ভুল

(মাসিক আলকাউসারে 'প্রচলিত ভুল' বিভাগে প্রকাশিত)
[মুহাররম ১৪২৬ হিজরী হতে মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী পর্যন্ত]

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
আমীনুত তালীম
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা।

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

প্রচলিত ভুল

(মাসিক আলকাউসারে 'প্রচলিত ভুল' বিভাগে প্রকাশিত)
[মুহাররম ১৪২৬ হিজরী হতে মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী পর্যন্ত]

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা।

·াশনায়	রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। দোকান ঃ ০১৯১৫-৪৬২৬০৮ সার্বিক যোগাযোগ-০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯
প্রথম প্রকাশ	নভেম্বর ২০১২
প্রকাশনা সংখ্যা	১০
প্রচ্ছদ	মুহা. মাহমুদুল ইসলাম

মূল্য ১৮০/- (একশ আশি টাকা মাত্র)

ISBN : 978-984-33-3784-9
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail /hotmail.com

PROCHOLITO BHUL
Mawlana Md. Abdul Malek. Published by Rahnuma Prokashoni
Price Tk. 180.00. US $ 5 00 only

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ্ তাআলার কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। মাত্র যাত্রা শুরু করা রাহনুমা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে 'প্রচলিত ভুল' গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহর দরবারে আবারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আলহামদুল্লিাহ!

গ্রন্থটি মাসিক আলকাউসারের নিয়মিত বিভাগ 'প্রচলিত ভুল' শিরোনামে মুহাররম ১৪২৬ হিজরী (ফেব্রুয়ারি ২০০৫) থেকে মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী (ডিসেম্বর ২০১১) পর্যন্ত প্রকাশিত প্রচলিত ভুল বিষয়ের সমষ্টি। এতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন ভুল যেমন জাল হাদীস, ভুল ধারণা, কুসংস্কার, ঐতিহাসিক ভুল, মাসআলাগত ভুল ইত্যাদি চিহ্নিত করে অত্যন্ত সহজ-সরল কিন্তু দালীলিকভাবে সংশোধন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য- মাসিক আলকাউসারের নিয়মিত পাঠকের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রচলিত ভুল বিভাগটি ধারাবাহিকভাবে প্রতি মাসে প্রকাশিত অংশটুকুর শুরুতে মাসের নাম ও সাল উল্লেখ করে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে যে মাস বাদ পড়েছে সেসব মাসে আলকাউসারে কারণবশত বিভাগটি প্রকাশিত হয় নি।

রাহনুমা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে মারকাযুদ দাওয়াহ্ এবং হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেবের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁর কাছে আমরা একটি পাণ্ডুলিপির জন্য বিনীত আবেদন জানিয়েছিলাম। সে আবেদন কবুল করে তিনি আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তা প্রকাশের জন্য রাহনুমা প্রকাশনীর প্রতি আস্থা রেখেছেন। আমরা তাঁর প্রতি কৃতার্থ ও অভিভূত। جزاك الله خيرا

দয়াময় আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা- হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে হযরত মাওলানাকে নেক হায়াত দান করো, সু-স্বাস্থ্য দান করো এবং তাঁর এলমী, ফিক্‌রী ও এছলাহী সকল খেদমতের সঙ্গে এ গ্রন্থটি কবুল কর এবং এর দ্বারা আমাদের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি দূর করে দাও।

আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করতে বন্ধুবর মাওলানা ফজলুল বারী যে সহযোগিতা, কষ্ট, ত্যাগ এবং অল্প সময়ে অধিক পরিশ্রমের যে নমুনা পেশ করেছেন তার বদলা একমাত্র আল্লাহ পাকই দিতে পারেন। দয়াময় আল্লাহ তাকে উভয় জাহানে উত্তম বদলা দান করুন।

এ গ্রন্থটির প্রকাশে যে সময় প্রয়োজন ছিল তা না পাওয়ায় এবং আমাদের চলার শুরুতে অনভিজ্ঞতার কারণে যদি কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যায় তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাচ্ছি। অনুরোধ করছি সকলকে, কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়লে অবশ্যই আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিবো ইনশাআল্লাহ্।

ইয়া আল্লাহ্! আমাদের এই প্রয়াসটুকু কবুল করুন। এর বদৌলতে এ গ্রন্থের রচয়িতা ও তাঁর পরিবারের সকলকে কবুল করুন। মারকাযুদ দাওয়াহ্ ও এর সহযোগী এবং শুভাকাঙ্খীদেরকে কবুল করুন। রাহনুমা প্রকাশনী, প্রকাশক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন। আমীন।

বিনীত–
প্রকাশক

তারিখ
২৫ রমাযান ১৪৩৩ হিজরী
রবিবার

بسم الله الرحمن الرحيم

পেশ লফয

الحمد لله، و سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد

মাসিক আলকাউসারের প্রকাশনার শুরু থেকেই 'প্রচলিত ভুল' নামে স্বতন্ত্র বিভাগ রাখা হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ্ (পাঠকের বক্তব্য অনুযায়ী) এর দ্বারা সকলের অনেক ফায়দাও হচ্ছে। ধীরে ধীরে এ বিভাগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জমা হয়েছে। অনেক পাঠকের জোর আবদার সেগুলো কিতাব আকারে প্রকাশ করা হোক। এ উদ্দেশ্যে বেরাদারে আযীয মাওলানা ফজলুল বারীকে অনুরোধ করি, তিনি যেন নযরে ছানী করেন এবং কোথাও কোনো অসংগতি চোখে পড়লে আমার সাথে মাশওয়ারা করেন। তিনি তা করেছেন। আযীযে মুহতারাম মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ্ও তা একবার দেখে দিয়েছেন। এখন রাহনুমা প্রকাশনী থেকে এটি কিতাব আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা সংকলনটি কবুল করুন। এর অসিলায় মারকাযুদ দাওয়াহ্, এর সকল বিভাগ এবং মারকাযের শুভাকাঙ্খীদেরও কবুল করুন। আমীন।

উল্লেখ্য, এই সংকলনে মুহার্‌রম ১৪২৬ হিজরী (ফেব্রুয়ারি ২০০৫) থেকে মুহার্‌রম ১৪৩৩ হিজরী (ডিসেম্বর ২০১১) পর্যন্ত প্রকাশিত প্রচলিত ভুল সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০০৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৬ পর্যন্ত আযীযে মুকাররম বেরাদরম মাওলানা যুবায়ের হোসাইনের এবং মার্চ ২০১০ থেকে

সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত বেরাদারে আযীয মাওলানা ত্বহা হোসাইন দানেশের লেখা। বাকী অংশ আল্লাহ্র ফযল ও করমে এই অধমের। আলকাউসারের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তাদের দুজনের লেখাগুলোও আমার নযরে ছানীর পর প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের প্রতি দরখাস্ত- মারকাযুদ দাওয়াহ্ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দুআয় শামিল রাখবেন। ফেরেশতা আপনাদের দুআয় আমীন বলবেন এবং আপনাদের জন্যও অনুরূপ কল্যাণের দুআ করবেন।

শেষ কথা, ভুল চিহ্নিতকরণ ও ভুল সংশোধন করতে গিয়েও ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং আমাদের অনুরোধ, কোন অসংগতি চোখে পড়লে অবশ্যই আমাদের অবহিত করবেন, আমরা কৃতজ্ঞ হব।

هذا، و صلى الله تعالى و سلم على سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه أجمعين، و الحمد لله رب العالمين .

১৯/৯/১৪৩৩ হিজরী
০৮/০৭/২০১২ ঈসায়ী
বুধবার

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা
প্রধান দফতর : ৩০/১২ পল্লবী, ঢাকা
প্রধান প্রাঙ্গণ : হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

সংখ্যাভিত্তিক সূচি

বিষয়ভিত্তিক সূচি

ভুল বিশ্বাস

হাদীস নয়

ভুল উচ্চারণ

ভুল নাম

ভুল কথা/বলার ভুল

ভুল কাজ

ভুল ঘটনা

ভুল প্রচলন

বিদআত

ভুল আমল

ভুল ধারণা

ভুল মাসআলা

ভুল প্রথা/রীতি/নিয়ম/পদ্ধতি/রসম/পন্থা/চিন্তা

ভুল ভাবনা

ইতিহাস বিষয়ক ভুল

ভুল তথ্য

অন্যান্য

ভুল বিশ্বাস

দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি বাকীতে না করা, ফেরতও না নেওয়া।

আমাদের সমাজে একটি ধারণা ও বিশ্বাস ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি বাকিতে হতে পারবে না, ঠিক দুপুরে এবং সন্ধ্যার পরেও বাকি দেওয়া যাবে না। এ সময়গুলোতে মাল ফেরতও নেওয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন, এতে সারাদিন ব্যবসা মন্দা যাবে এবং এটি একটি অলক্ষুণে বিষয়।

এটি একটি ভুল ধারণা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস এবং একদিক থেকে শরয়ী নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিকও বটে। কারণ, একজন ক্রেতা যদি ঠিকই নগদ মূল্য দিতে অক্ষম হয় এবং তার কাছ থেকে পরবর্তী সময়ে মূল্য না পাওয়ার আশঙ্কা অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে বাকিতে বিক্রি করা বরং নেকীর কাজ। কারণ এতে একজন মানুষকে সহযোগিতাও করা হচ্ছে, সাথে সাথে ব্যবসা তো হচ্ছেই।

আর পণ্য ফেরত নিতে গেলে যদি ব্যবসায়ীর বড় কোন ক্ষতি না হয় বরং শুধু ঐ বস্তুটির লাভ থেকে সে বঞ্চিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে যথাসম্ভব তা ফেরত নেওয়াই শরীয়তের উপদেশ। হাদীসে এর জন্য ফযীলতের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন লজ্জিত ক্রেতার পণ্য ফেরত নিল, আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের দিনে তার ক্রটি ঢেকে রাখবেন।"

–সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫০৩৬, সুনানে আবু দাউদ ২/১৩৪

সুতরাং দোকান খোলার পর প্রথম বাকি দেওয়াকে এবং পণ্য ফেরত নেওয়াকে অলক্ষুণে ভাবা শরীয়ত ও যুক্তি উভয় দৃষ্টিতেই বর্জনীয়।

হাদীস নয়

اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম অন্বেষণ কর!

ইসলামে ইল্‌মে দ্বীন অন্বেষণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তাই বিভিন্নভাবে ইল্‌ম অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

ইল্‌মের যেমন কোন শেষ নেই; তেমনি তা শিক্ষা করার জন্য কোন সময়ও নির্দিষ্ট নেই। শৈশব থেকে আমরণ ইল্‌ম অর্জন করে যেতে হবে। এটাই ইল্‌মের দাবি।

তবে 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্‌ম অন্বেষণ কর' কথাটি একটি প্রবাদ ও হিতোপদেশ মাত্র; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। যদিও অনেকের নিকট তা হাদীস হিসেবেই প্রসিদ্ধ।

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু ওদ্দাহ রহ. এ সম্পর্কে বলেন ঃ

ليس بحديث نبوي، و إنما هو من كلام الناس، فلا تجوز إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كما يتناقله بعضهم، إذ لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا ما قاله أو فعله أو أقره.

و كون هذا الكلام صحيح المعنى في ذاته و حقا في دعوته : لا يسوغ نسبته إلى النبي صلى الله عليه و سلم. قال الحافظ أبوالحجاج الحلبي المزي : ليس لأحد أن ينسب حرفا يستحسنه من الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، و إن كان ذلك الكلام في نفسه حقا، فإن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه و سلم حق، و ليس كل ما هو حق قاله الرسول صلى الله عليه و سلم. انتهى من كتاب -ذيل الموضوعات للحافظ السيوطي صـــ ٢٠٢

و هذا الحديث الموضوع : (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد) مشهور على الألسنة كثيرا. و من العجب أن الكتب المؤلفة في (الأحاديث المشتهرة) لم تذكره. (من حاشية - قيمة الزمان عند العلماء)

অর্থাৎ, এটি হাদীসে নববী নয়; বরং একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। এটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্বন্ধিত করা মোটেও

বৈধ হবে না। (যেমন কেউ কেউ করে থাকে।) কেননা, তাঁর প্রতি শুধু সেটিকেই সম্বন্ধিত করা যাবে যা তিনি বলেছেন, করেছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন।

"যে কোন কথা ভার মনে হলেই তাকে হাদীসে রাসূল বলা জায়েয হবে না; যদিও কথাটি সঠিক হোক না কেন। কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল হাদীসে নববীই হক তথা সত্য; কিন্তু দুনিয়ার সকল সঠিক কথাই হাদীসে নববী নয়। বিষয়টি ভালভাবে বোঝা উচিত।"

–কীমাতুয যামান ইন্দাল উলামা ৩০ (টীকা)

ভুল উচ্চারণ

'আকামত' 'মুসওয়াদ্দা' 'আল-বিসমিল্লাহ'

'আকামত' أَقَامَة ঃ এ উচ্চারণটি ভুল। নামাযের জামাআতের আগে আযানের মত যে কাজটি করা হয় তা হচ্ছে ইকামত إِقَامَة আকামত أَقَامَة নয়। এটি আরবী ভাষার باب الإفعال এর মাসদার।'

'মুসওয়াদ্দা' مُسْوَدَّة ঃ এ উচ্চারণটি ভুল। পাণ্ডুলিপি অর্থে আরবীতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে মুসাওওয়াদা مُسَوَّدَة মুসওয়াদ্দা مُسْوَدَّة নয়। মুসাওওয়াদা শব্দটি باب التفعيل থেকে ইসমে মাফউলের সীগা।

'আল-বিসমিল্লাহ' এভাবে লেখা বা বলা সম্পূর্ণ ভুল। আরবী ভাষায় ال (আল) ব্যবহারের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র রয়েছে। যে শব্দের সাথে 'আল' প্রযোজ্য, শুধু সে শব্দের সাথেই 'আল' ব্যবহার করা যাবে। অন্য ক্ষেত্রে 'আল' ব্যবহার করা বা বাংলা কোন শব্দের সাথে 'আল' ব্যবহার করা ভুল। অনেকে 'আল' শব্দটিকে বরকতময় বা সম্মানজনক কিছু একটা মনে করেন। বিষয়টি আসলে এমন নয়। এ ধরনের আরো কয়েকটি ভুলের নমুনা নিম্নরূপ– আল-সুরেশ্বর, আল-মক্কা, আল-সৈয়দ ইত্যাদি।

ভুল ঘটনা

হযরত জাবের রাযি. এর দুই শিশু ছেলের বকরী জবাই খেলা।

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করেন। মেহমানদারির জন্য একটি বকরী জবাই করেন। বকরী জবাইয়ের সময় হযরত জাবের রাযি. এর দুই শিশুছেলে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হযরত জাবের রাযি. বকরী নিয়ে চলে গেলে দুই ভাই

মিলে ‘বকরী জবাই খেলা’ শুরু করল এবং এক ভাই আরেক ভাইকে শুইয়ে বকরীর মত জবাই করে দিল। এরপর ভয়ে সেও মারা গেল।
রাসূল কষ্ট পাবেন ভেবে হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু ধৈর্য্যের সাথে ছেলে দুটোর লাশ ঘরের কুঠরিতে নিয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে বসে জাবের রাযি.-কে বললেন, তোমার ছেলে দুটোকে ডাক। তিনি বললেন, হুজুর আপনি খান, ওরা ঘুমাচ্ছে। তখন রাসূল বুঝতে পেরে উঠে গিয়ে কম্বল উঁচু করে ডাকলেন, হে জাবেরের দুই ছেলে উঠে এস। তখন ভোরের পাখির মত ছেলে দুটো উঠে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চা দুটোকে নিয়ে খেতে লাগলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হযরত জাবের রাযি. অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ থেকে দুফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।
উল্লেখিত ঘটনাটি ভুল। লোকমুখে বহুল প্রচলিত হলেও এর কোন দালীলিক ভিত্তি নেই।

মার্চ-২০০৫

ভুল বিশ্বাস

বিনা ওযুতে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর নাম মুখে নেওয়া!

কিছু লোকের মুখে শোনা যায় এবং কোন কোন চটি বইয়েও পাওয়া যায়, ‘বিনা ওযুতে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর নাম মুখে নিলে শরীরের তিনটি পশম ঝরে যায়।’
এটি একটি ভুল বিশ্বাস। অবাস্তব ও অযৌক্তিক একটি বিশ্বাস। প্রথমত: ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থে এ বিশ্বাসের কোন অস্তিত্ব নেই। দ্বিতীয়ত: আব্দুল কাদের জিলানী রহ. ওলীকুল শিরোমণি হওয়ার পাশাপাশি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন উম্মত এবং আল্লাহ্ তাআলার বান্দা। যখন মহান আল্লাহ্ তায়ালা ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম বিনা ওযুতে উচ্চারণ করলে পশম ঝরে না, তাহলে বড় পীর সাহেবের নাম মুখে নিলে পশম ঝরবে কেন?
তৃতীয়ত: একটি পরিষ্কার জায়গায় দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখুন। আসলেই এমন কোন ব্যাপার ঘটে কি না। তাহলে কেন এ অবাস্তব বিশ্বাসটি পোষণ করবেন, যা বড় পীর সাহেব রহ. নিজেও কখনো কামনা করেন নি।

হাদীস নয়

যার কোন পীর নেই তার পীর শয়তান!

مَنْ لَيْسَ لَهٗ شَيْخٌ فَشَيْخُهٗ إِبْلِيْسُ

যে ব্যক্তি তার মুরুব্বী তথা দ্বীনদার উস্তাদ, পিতা-মাতা অথবা কোন হক্কানী বুযুর্গের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না, সে ব্যক্তি সাধারণত শয়তানের ফাঁদে পড়ে থাকে। এজন্য হক্কানী উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হওয়া এবং নেককারদের সোহবত অবলম্বন করার প্রতি শরীয়ত গুরুত্বারোপ করেছে।

তবে উল্লিখিত কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়; কোন হক্কানী বুযুর্গের অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তি মাত্র।

ইমামুল আউলিয়া খাজা নিযামুদ্দীন রহ. এর মালফূযাত তথা বাণী সংকলন 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ' এ আছে ঃ "মাওলানা সিরাজুদ্দীন হাফেয বাদায়ূনী তাঁর দরবারের উপস্থিত হয়ে আরয করেন ঃ

مَنْ لَيْسَ لَهٗ شَيْخٌ فَشَيْخُهٗ الشَّيْطَانُ

(যার কোন পীর নেই, তার পীর শয়তান) এটি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস? হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. বলেন, না; এটি মাশায়েখের বাণী।" -ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ-আসসুন্নতুল জালিয়্যা ফিল চিশতিয়াতিল আলিয়্যা ৫৯, খাইরুল ফাতাওয়া ১/৩৬১

অনেকে উপরোক্ত কথাটি হাদীস মনে করে নাম মাত্র বায়আতকে (পীরের হাতে হাত দেওয়াকে) ফরযে আইন মনে করে থাকে, যা নিতান্তই ভুল। পক্ষান্তরে অনেকে হক্কানী উলামা মাশায়েখের সোহবত ও সংশ্রবের মোটেও প্রয়োজনবোধ করে না, যা আরো মারাত্মক ভুল।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন- ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২৩৬-২৩৮, তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ-মাওলানা আব্দুল মালেক।

ভুল ঘটনা

হযরত হাসান-হোসাইন রাযি.-এর ঈদের নতুন জামার জন্য কান্নাকাটি!

ঈদের সকাল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা হাসান-হোসাইন তাঁদের মা ফাতেমার কাছে ঈদের নতুন জামার জন্য কান্নাকাটি করছেন। 'আশ-পাশের সমবয়সী অনেকে নতুন জামা পরে হাসি-ফুর্তি করছে, কিন্তু আমাদের নতুন জামা নেই কেন?' মা ফাতেমা

কান্না গোপন করে তাদেরকে সান্তনা দিতে লাগলেন। অগত্যা তাদেরকে বললেন, তোমরা গোসল করে এস, আমি তোমাদের নতুন জামার ব্যবস্থা করছি।

বলাবাহুল্য, ব্যবস্থা করার মত তাঁর কাছে কোন উপায়ই ছিল না।

পুণ্যবতী মা ফাতেমা দুই পুত্রকে গোসল করতে পাঠিয়ে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে লুটিয়ে পড়লেন। বলতে লাগলেন, হে প্রভু! হাসান-হোসাইন গোসল করে এসে জামা চাইলে আমি তাদের কী জবাব দেব? তুমি কি চাও আজ ঈদের দিনে তাদের সামনে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হই এবং তারা মিসকীনের মত ঈদ করুক? আল্লাহ্ তাআলা তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামকে দর্জির বেশে দুটো জামা দিয়ে মা ফাতেমার ঘরে পাঠালেন। দরজায় নক করার শব্দ শুনে মা ফাতেমা সিজদা থেকে মাথা তুললেন এবং দর্জির কাছ থেকে জামা দুটো গ্রহণ করলেন। একটি জামা ছিল লাল, আরেকটি ছিল নীল। শিশু হাসান-হোসাইন ঘরে ফিরে নতুন জামা পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে গেল। দুজনে জামা দুটো বুকে জড়িয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের দিকে দৌড়াতে লাগল। ডাক দিল, নানা! এই দেখ আমাদের ঈদের নতুন জামা!

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা দুটো দেখে কেঁদে উঠলেন এবং লাল জামাটি হোসাইনকে ও নীল জামাটি হাসানকে পরিয়ে দিলেন, যা পরবর্তী সময়ে হযরত হোসাইন রাযি. এর শাহাদাত ও হযরত হাসান রাযি. এর বিষপানের প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

এ ঘটনাটির ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই। এর চেয়ে অলৌকিক ব্যাপারও নবী পরিবারের সাথে ঘটতে পারে। কিন্তু যে ঘটনা ঘটেনি বা ঘটেছে বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসূত্রে বা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না, সে ঘটনা প্রচার করার কোন সুযোগ নেই। আর এর কোন প্রয়োজনও নেই।

ভুল উচ্চারণ

আহমেদ/আহাম্মদ

দুটো উচ্চারণই ভুল। সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে 'আহমাদ' أَحْمَد বাংলা ভাষা হিসেবে সর্বোচ্চ 'আহমদ' উচ্চারণ করা যায়। আহমেদ, আহাম্মেদ, আহম্মদ বা আহাম্মদ উচ্চারণ করার কোন সুযোগ নেই। বিশেষত এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম হওয়ার কারণে এ নামকে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করা বড় ধরনের অন্যায়।

খাইরুল/শফীকুল

এ ধরনের উচ্চারণ ভুল। সাধারণত খাইরুল ইসলাম ও শফীকুল ইসলাম থেকে সংক্ষেপ করে এভাবে বলা হয়। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে এখানে ال হল দ্বিতীয় শব্দের অংশ। দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ না করে শুধু ال উচ্চারণ করাটা অনর্থক। এ ধরনের আরো যেমন মারকাযুল, আশরাফুল, আব্দুল ইত্যাদি।

ভুল নাম

নবীউল্লাহ

এভাবে কারো নাম রাখা ভুল। এ নামের অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র নবী'। উম্মতের কারো এ নাম হতে পারে না। কেননা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন্নাবিয়্যীন, তাঁর পরে কোন নতুন নবী আসবেন না। সুতরাং এ নামও আর কারো হবে না।

তাই এরূপ নাম কেউ রেখে থাকলে তা পরিবর্তন করা জরুরি। আর ইসলামী নাম রাখার ক্ষেত্রে আরবী ভাল জানে এমন কারো থেকে অর্থ জেনে নাম রাখা উচিত।

রাসূল মিয়া

এরূপ নাম রাখাও ঠিক নয়। রাসূল শব্দটি একটি সম্মানিত শব্দ। বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি পরিভাষা, যা উম্মতের কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই এ নাম রাখা ভুল।

এপ্রিল-২০০৫

সালামের কয়েকটি ভুল

১. সালামের জবাব দিয়ে আবার সালাম দেওয়া ঃ

এ রীতিটি ভুল। উত্তম হল সালাম পাওয়ার অপেক্ষা না করে আগে সালাম দেওয়া। কিন্তু কেউ সালাম দিয়ে দিলে তখন দায়িত্ব হল শুধু সালামের উত্তর দেওয়া।

২. সালামের জবাব না দিয়ে আবার সালাম দেওয়া ঃ

এ রীতিটিও ভুল। বড় কেউ যদি আগে সালাম দিয়ে ফেলে তখন আমাদের অনেকেই জবাব দিতে লজ্জাবোধ করে। তাই জবাব না দিয়ে নতুন করে

সালাম দেয়। এ রীতি পরিহারযোগ্য। কেউ সালাম দিলে তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব। তাই জবাবই দিতে হবে।

৩. কাউকে সালাম দেওয়ার পর 'সালাম দিয়েছি' বলা ঃ

সালাম দেওয়ার পর উত্তর না পেলে আমরা সাধারণত বলে থাকি 'সালাম দিয়েছি।' এভাবে বলা ঠিক নয়। নিয়ম হল আবার সালাম দেওয়া। শ্রোতাকে যথাযথভাবে শুনিয়ে সালাম দিতে হবে। সালামের উত্তর যেমন সালামদাতাকে শুনিয়ে দিতে হয়, তেমনি সালামও শ্রোতাকে শুনিয়ে দিতে হয়।

৪. মনে মনে বা নিম্নস্বরে সালামের জবাব দেওয়া ঃ

এ অভ্যাস পরিহারযোগ্য। সালামদাতাকে শুনিয়েই সালামের জবাব দিবে।

৫. অসময়ে সালাম দেওয়া ঃ

কুরআন হাদীসের আলোকে একথা স্পষ্ট যে, সালাম হচ্ছে সাক্ষাতের বিভিন্ন আদবের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকা ইত্যাদি এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে দেখা হলে করার মত কিছু আমল যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে গেছেন।

কিন্তু দেখা যায় দুআ বা মুনাজাত শেষ হলে অনেকে সালাম দিয়ে বসেন। এটি একটি ভুল আমল এবং একটি ভিত্তিহীন রেওয়াজ। দুআ বা মুনাজাত শেষ হওয়ার সাথে সালামের কোন সম্পর্ক নেই। তেমনি মুসাফাহা, মুআনাকারও কোন সম্পর্ক নেই।

৬. সালামের উচ্চারণে ভুল ঃ

সালাম একটি দুআ। ইসলামের শেআর ও প্রতীক পর্যায়ের একটি আমল। এর সহীহ উচ্চারণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। কমপক্ষে এতটুকু বিশুদ্ধ উচ্চারণ অবশ্যই জরুরি, যার দ্বারা অর্থ ঠিক থাকে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ

আরবী দেখে এর উচ্চারণ শিখে নেওয়া উচিত। অন্যথায় ع ও ح ইত্যাদি হরফের যথাযথ মাখরাজ আদায় হয় না। অনেকে অসাবধানতা বা তাড়াহুড়োর কারণে ভুল উচ্চারণে সালাম দিয়ে থাকে। এমনটি অনুচিত। সালামের ভুল উচ্চারণের কয়েকটি রূপ ঃ

১.স্লামালাইকুম ২.সালামালাইকুম ৩. আস্লমালাইকুম ৪. আস্লাআলাইকুম ৫. সেলামালাইকুম ৬. ইস্লামালাইকুম ৭. আচ্ছালামু আলাইকুম ইত্যাদি।

বলার ভুল

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া!

এ কথাটি ভুল। মৃত্যুশয্যায় মুমূর্ষু ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে 'জনাব কোতয়ালী সাহেব গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।'

এভাবে বলা ভুল। পাঞ্জা লড়ার বিষয়টি সাধারণত সমশক্তিসম্পন্নদের মাঝে হতে হয়, যেখানে হারজিত উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপারটি এমন নয়। মৃত্যু হল সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার হুকুম। এর সাথে একজন দুর্বল মানুষের পাঞ্জা লড়ার প্রশ্নই আসে না। কোন মুসলমান এ বিশ্বাসও রাখে না। অসাবধানতার কারণে এ ধরনের কথা মুখে চলে আসে, যা পরিহার করা জরুরি।

ভুল প্রবাদ

মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

এ প্রবাদটি ভুল এবং একটি ভুল বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এ প্রবাদটি প্রচলিত। আমাদের অনেকে রাগ বা অভিমান করে বলে ফেলেন 'তুমি আমার বাড়িতে না এলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি?' মহাভারত হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ, যা মূলেই ভুল ও অশুদ্ধ; কিন্তু এ প্রবাদটি ব্যবহার করে প্রকারান্তরে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, 'মহাভারত' সহীহশুদ্ধ গ্রন্থ। তুমি আমার বাড়িতে না এলেও এ গ্রন্থ অশুদ্ধ হবে না। তাই জোর তাগিদের সাথে বলে থাকি 'তুমি আমার বাড়িতে না এলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি?' একজন মুসলমানের জন্য এ প্রবাদটি অবশ্যই পরিহারযোগ্য।

বোরাকুন্নবী: একটি কাল্পনিক ছবি

আমাদের দেশে 'বোরাকের' একটি কাল্পনিক ছবির বেশ প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন চটি বইয়ে বোরাকের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এভাবে-'বোরাক একটি চতুষ্পদ জন্তু। এটি দেখতে মাথা হতে বক্ষ পর্যন্ত একটি অতি সুন্দরী রমণীর মত। মাথায় লম্বা কেশ। বক্ষ হতে পশ্চাৎ দিকে একটি সুন্দর ঘোড়ার মত। এত দ্রুতগামী যে চোখের পলকে যমীন হতে আসমানে পৌঁছে যেতে পারে।'

বোরাকের এ বিবরণটি সম্পূর্ণ অলীক ও কাল্পনিক। এ ভিত্তিহীন বিবরণের আলোকেই অনেকে বোরাকুন্নবীর একটি কাল্পনিক ছবি এঁকে প্রচার করে।
হাদীস ও তারীখের (ইতিহাসের) কিতাবে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হচ্ছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "জিবরীল আমার কাছে একটি প্রাণী নিয়ে আসল, যার গায়ের রং সাদা, গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট। এর গতি ছিল এমন যে তার দৃষ্টির শেষ সীমায় তার একেকটি কদম পড়ত।" –আস্সীরাতুন নববিয়া, ইমাম যাহাবী রহ. ১৫৪
এ বাহনটি ছিল মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত। আকাশ পথের সফর তিনি বোরাকে করেন নি। তাই বোরাক একপলকে আকাশ পর্যন্ত চলে যেত, একথাও ভুল ও ভিত্তিহীন। –আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর রহ. ৩/১০৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

একটি মারাত্মক জাল হাদীস
আমি 'মীম' বিহীন আহমাদ এবং 'আইন' বিহীন আরব!

أَنَا أَحْمَدُ بِلَا مِيْمٍ، وَ أَنَا الْعَرَبُ بِلَا عَيْنٍ

"আমি 'মীম' বিহীন আহমাদ এবং 'আইন' বিহীন আরব!" কোন মুলহিদ বেদ্বীন এ বাজে মিথ্যা কথাটিকে হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছিল।
আহমাদ (أحمد) শব্দ হতে মীম অক্ষরটি বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে আহাদ (أحد) আহাদ আরবী শব্দ, আল্লাহ্ তাআলার নাম। এর অর্থ একক প্রভু। সুতরাং মীমবিহীন আহমাদ হওয়ার অর্থ তিনি আল্লাহ্।
আর আরব (عرب) শব্দটি হতে 'আইন' বাদ দিলে বাকি থাকে রব। রব শব্দটিও আরবী; অর্থ হল প্রতিপালক। মোটকথা, 'আইন' বিহীন 'আরব' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় তিনি প্রতিপালক তথা আল্লাহ্। তাহলে কথাটার অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে আহাদ ও রব তথা আল্লাহ্ হওয়ার দাবি করছেন। নাউযুবিল্লাহ!
অর্থ দেখেই পাঠক বুঝতে পারছেন যে, এটি জাল রেওয়ায়াত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হতেই পারে না, এ ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই।
দ্রষ্টব্য ঃ খাইরুল ফাতাওয়া ১/২৯২; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/২৪২; তালীমুদ্দীন-ইসলাহী নেসাব ৩০৪-৩০৫

নামের ভুল

মুরসালীন/মুত্তাকীন

এভাবে কারো নাম রাখা বা কাউকে ডাকা ভুল। রাসূল ও নবী শব্দের সমার্থ শব্দ 'মুরসাল'। এর বহুবচন হচ্ছে 'মুরসালূন' বা 'মুরসালীন'। সে হিসেবে উম্মতের কোন ব্যক্তির জন্য এ নাম প্রযোজ্য নয়। বহু বচনে তো নয়ই, এক বচনেও নয়। এমনিভাবে 'মুত্তাকীন' শব্দটিও 'মুত্তাকী' শব্দের বহুবচন; বিধায় কোন ব্যক্তির নাম 'মুত্তাকীন' রাখা হলে এর যথাযথ কোন অর্থ দাঁড়ায় না।

হয়তবা নাম দুটোর মূলরূপ ছিল আনীসুল মুরসালীন ও মুহিব্বুল মুত্তাকীন বা এধরনের অন্য কিছু, যা অর্থগত দিক থেকে খুবই সুন্দর নাম; যার অর্থ যথাক্রমে রাসূলগণের প্রেমিক এবং পরহেযগারদের প্রেমিক। সংক্ষেপ করতে গিয়েই আমাদের ভুলটা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংক্ষেপের জন্য মুহিব ও আনীস বলে ডাকা যেতে পারে।

একটি নামের ভুল ব্যবহার

আমাদের দেশে কাজের ছেলেকে আব্দুল নামে ডাকার একটা ভুল প্রচলন রয়েছে। ভিন্ন নাম থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় এদেরকে 'আব্দুল' নামে ডাকা হয়। আরবী 'আব্দুন' শব্দের অর্থ দাস বা গোলাম। তাই এর প্রচলনটি ভুল ও অন্যায়। এ নামটি হয়ত 'আব্দুল্লাহ' (আল্লাহ্র বান্দা) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এ কারণেই আব্দুল্লাহকে 'আব্দুল', যার অর্থ কেবল 'দাস' বলে ডাকা উচিত নয়। প্রকৃতিগতভাবে আযাদ ও স্বাধীন কোন বান্দাকে আল্লাহ্র বান্দা না বলে 'বান্দা' বা 'দাস' এর পরিচায়ক আব্দুল বলে ডাকা নিঃসন্দেহে অন্যায় এবং বেয়াদবি। একজন মানুষ গৃহপরিচারক হয়ে তো দাস হয়ে যায় নি!

সালাম দেওয়ার একটি ভুল পদ্ধতি

বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করার ক্ষেত্রে দেখা যায় বক্তাগণ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ বন্দনার অবতারণা করার পর সালাম দেন। এ রীতিটি ভুল। যেমন বলে থাকেন, 'মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মাননীয় পরিচালক, মান্যগণ্য অমুক অমুক সাহেব ও আমার শ্রোতাবন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম।' নিয়ম হল শ্রোতাদের মুখোমুখি হওয়ার সাথে

সাথে সালাম দেওয়া। সাক্ষাতের নিয়মাবলির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সালামের কথাই বলা হয়েছে।

একটি ভুল ঘটনা

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর বাঘের আকৃতি ধারণ!

শোনা যায় শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. তাঁর মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় এক অসৎ লোক খারাপ উদ্দেশ্যে তাদের ঘরে আসে এবং তাঁর মায়ের সাথে জোরপূর্বক খারাপ কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে। তখন আব্দুল কাদের জিলানী রহ. তাঁর মায়ের নাক দিয়ে বাতাস হয়ে গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বাঘের আকৃতি ধারণ করে লোকটির ঘাড় মটকে দেন। লোকটির উপযুক্ত শাস্তি বিধান করে তিনি পুনরায় বাতাস হয়ে মায়ের নাক দিয়ে গর্ভাশয়ে ফিরে যান।

এ ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. রচিত গ্রন্থাবলি, তাঁর জীবনীর উপর রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলি এবং ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবেই এ ধরনের কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। মূলত শ্রোতাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যই একশ্রেণীর অসংযমী বক্তা এসব অলীক ঘটনা তৈরি করেছে।

ভুল প্রচলন

জানাযার নামাযের আগে মৃত ব্যক্তি 'ভাল ছিল' একথার স্বীকৃতি নেয়া!

কোন কোন এলাকায় মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাযের আগে তার অভিভাবক বা ইমাম সাহেব উপস্থিত মুসুল্লীদের জিজ্ঞেস করেন, 'এ লোকটি কেমন ছিল?' তখন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবাই উত্তরে বলে থাকে, 'ভাল ছিল।' এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করা হয় এবং তিনবার জবাব নেওয়া হয়। এটি করা হয় রেওয়াজ হিসেবে। এ রেওয়াজ ও প্রচলনটি ভুল। শরীয়তের কোন দলীলে এ ধরনের কোন আমলের অস্তিত্ব নেই। সাধারণত মনে করা হয়, এভাবে সম্মিলিতভাবে তার ব্যাপারে ভাল ছিল বললে মৃত ব্যক্তি ভাল হিসেবে স্বীকৃতি পাবে, আর আল্লাহ্ তাআলা তাকে মাফ করে দিবেন। কিন্তু বোঝার বিষয় হল, কোন ব্যক্তি যদি বাস্তবে ভাল না হয় তাহলে এরূপ বলার দ্বারা সে ভাল সাব্যস্ত হবে না এবং মানুষের মনেও এমন বিশ্বাস জন্মাবে না যে, সত্যি লোকটি ভাল ছিল। আর যদি বাস্তবে সে ভাল থেকে থাকে তাহলে এ রেওয়াজি স্বীকৃতির কোন প্রয়োজন নেই। তাই এ ভুল প্রচলনটি পরিহার করা জরুরি।

সুন্নত-বিদআত শিরোনামে দেখানো হবে কোন্ কাজটি সুন্নত হিসেবে আমাদের করার দরকার ছিল কিন্তু আমরা সে সুন্নত আমল না করে একটি বিদআতকে গ্রহণ করেছি। যদি সুন্নতের উপর আমাদের আমল থাকত তাহলে নিশ্চয়ই বিদআত প্রবেশ করতে পারত না।

সুন্নত

আযানের পর দরূদ ও দোয়া পাঠ করা!

আযানের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হাদীসে বর্ণিত দরূদ পাঠ করা। অর্থাৎ আযানের দুআর আগে দরূদ নিম্নস্বরে পাঠ করা সুন্নত। -সহীহ মুসলিম ১/১৬৬, হাদীস ৩৮৪

বিদআত

আযান শুরুর আগে 'আসসালাতু ...' ইত্যাদি পড়া!

আযান শুরু করার আগে আযানের শব্দাবলির ন্যায় 'আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া শাফীয়াল মুযনিবীন' ইত্যাদি পড়া। মূলত প্রথমোক্ত সুন্নতটি ছেড়ে দেওয়ার কারণেই এ দ্বিতীয়োক্ত বিদআতটি প্রবেশ করেছে। তাই বিদআত ছেড়ে সুন্নত ধরতে হবে।

হাদীস নয়

ভক্তি থাকলে পাথরেও মুক্তি মিলে!

لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللّٰهُ بِهِ.

'তোমাদের কেউ যদি পাথরের ব্যাপারেও সুধারণা রাখে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তা দ্বারা তার উপকার সাধন করবেন।'

এটি একটি হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ। বিশেষ করে এমন বে-ইল্‌ম লোক যারা ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-কবয ও পানি পড়া ইত্যাদি প্রদানে অভ্যস্ত; তাদের অনেকে গ্রাহকদের আস্থা কুড়ানোর জন্যে এ সব সস্তা-বুলি আওড়ে থাকেন।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. উক্তিটির অসারতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

هو من وضع المشركين عباد الأوثان

'এটি মূর্তি পূজারী মুশরিকদের জালকৃত।'

-আলমানারুল মুনীফ ফিস-সহীহি ওয়ায যয়ীফ ১৩৯

আল্লামা সাখাবী রহ. এ সম্পর্কে বলেন–

قال ابن تيمية : إنه كذب، و نحوه قول شيخنا : إنه لا أصل له.

"ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, এটি মিথ্যা কথা। আমাদের শায়খ (ইবনে হাজার আসকালানীও) বলেছেন, এর কোন ভিত্তি নেই।"

–আলমাকাসিদুল হাসানা ৪০২

আল্লামা তাহের পাটনী, মোল্লা আলী কারী, আল্লামা ইসমাইল আজলূনী এবং শায়খ কাউকজী রহ. এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

–তাযকিরাতুল মাওযূআত ২৮; আলমাসনূ ১৪৮; আলমাওযূআতুল কুবরা ৯৮; কাশফুল খাফা ২/১৩৮; আললুউলুউল মারসূ ৬৫।

জুন-২০০৫

ইনশাআল্লাহ্/ আলহামদুলিল্লাহ্

এ দুটো বাক্য যথাস্থানে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা অনেকে ভুল করে থাকি। একটির জায়গায় আরেকটি ব্যবহার করে ফেলি। বলে থাকি 'ইনশাআল্লাহ্ আমরা ভালই আছি', 'ইনশাআল্লাহ্ আমাদের এখানে অনেক ধান হয়েছে। এভাবে বলা ভুল। মূলত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অর্জিত কোন নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ্ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র'। আর ভবিষ্যতে কোন কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করলে বা সিদ্ধান্ত নিলে কাজটি যেন যথাযথভাবে সম্পাদন করা যায় সেজন্য আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বলতে হয় ইনশাআল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ চান)। তাই ভবিষ্যতের কোন কাজের ক্ষেত্রে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলা এবং অর্জিত কোন নেয়ামতের উপর 'ইনশাআল্লাহ্' বলা ভুল। বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

এটি গুনাহের কাজ তা আমরা সকলেই জানি। তবে অনেকেই জানি না এটি কত বড় গোনাহ; তাই অবলীলায় গোনাহটি করে যাই। যারা জানেন তাদের এক্ষেত্রে যে ভুলগুলো হয়–

১. অনেকে এক হাত মাটির দিকে ঝুলিয়ে মাথা নিচু করে নামাযীর সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যায় এবং মনে করে হাতের দ্বারা সুতরার কাজ হয়ে গেছে, বা ঝুঁকে ঝুঁকে যাওয়ার দ্বারা গোনাহটা আর হবে না। এ ধারণা ভুল।

২. অনেকে কাঁধের রুমাল নামাযীর সামনে ঝুলিয়ে পার হয়ে যায়। এ পদ্ধতিও ভুল।

এক্ষেত্রে আমাদের আরও অনেক ভুল হয়ে যায়। সেগুলো থেকেও বেঁচে থাকা জরুরি।

গাড়ীতে আরোহণের দুআ

যে কোনো গাড়িতে চড়ার দুআ হচ্ছে–

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ، وَ إِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

আর যে কোনো নৌযান যেমন নৌকা, স্টিমার ইত্যাদিতে আরোহণের দুআ হল– بِسْمِ اللهِ مَجْرِيْهَا وَ مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

এক্ষেত্রে আমরা সাধারণত যে ভুল করে থাকি তা হচ্ছে, গাড়িতে চড়ার সময় প্রথমোক্ত দুআটি না পড়ে দ্বিতীয় দুআটি পড়ে থাকি; যা মূলত নৌযানে আরোহণের জন্য নির্ধারিত। অনেক গাড়িতে নৌযানে ভ্রমণের দুআটি লেখাও থাকে। এ ভুলটি না হওয়া উচিত।

সুন্নত

দরূদ পড়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনলে সুন্নত হচ্ছে তাঁর উপর দরূদ পড়া। এটি আমাদের উপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক।

বিদআত

অঙ্গুল চুমু খেয়ে চোখে মোছা।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে অঙ্গুলি চুমু খেয়ে তা চোখে মোছা বিদআত। নবীজী এমনটি করতে বলেন নি। সাহাবী তাবেয়ীনেরও কেউ এমনটি করেন নি।

একটি ঈমান বিধ্বংসী বাতিল আকীদা: মিরাজের নব্বই হাজার কালাম।

"মিরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নব্বই হাজার কালাম ও বাণী লাভ করেছিলেন। তার

মধ্যে ত্রিশ হাজার কালাম যাহেরী, যেগুলো উলামায়ে কেরাম জানেন। আর অবশিষ্ট ষাট হাজার কালাম বাতেনী, যেগুলো রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে একমাত্র হযরত আলী রাযি.-কে বলে গেছেন। তাঁর নিকট থেকে সিনা পরম্পরায় পরবর্তী সূফী, ফকীর ও দরবেশদের নিকট গচ্ছিত। বাতেনী এই ষাট হাজার কালাম উলামায়ে কেরাম না-জানার কারণে তারা ফকীর-দরবেশদের মধ্যে একটা কিছু দেখলেই তাদের উপর আপত্তি করে বসেন।"

এ কথাটি জাল ও ভিত্তিহীন। কেননা প্রথমত এতে আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে এই মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে, তিনি মানুষকে দুপ্রকার শরীয়ত প্রদান করেছেন। একটি ত্রিশ হাজার কালামবিশিষ্ট শরীয়ত; আরেকটি ষাট হাজার কালামবিশিষ্ট শরীয়ত এবং উভয় শরীয়ত পরস্পর বিরোধী। এক শরীয়তে একটি বস্তু হালাল হলে অন্য শরীয়তে সে একই বস্তু হারাম। এরূপ পরস্পর বিরোধপূর্ণ কাজ কোন সৃষ্টির পক্ষেও নিকৃষ্ট; অথচ এটাকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলার শানে চালিয়ে দিয়েছে এসব দাজ্জালরা।

দ্বিতীয়ত এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও এই অপবাদ আসে যে, তিনি দীনের অধিকাংশ মৌলিক কথা-যা সর্বস্তরের মুসলমানদের জানা জরুরি ছিল, তা তাদের কাছে পৌঁছান নি। একজনকে গোপনে বলে গেছেন আর অন্যদেরকে বলে গেছেন তার বিপরীত কথা। রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে ব্যক্তির এরূপ ধারণা থাকবে, তার যে রাসূলের প্রতি ঈমান নেই, তাতো বলাই বাহুল্য।

তৃতীয়ত রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে দীনের বিশেষ বিশেষ এমন অনেক কথা পৌঁছিয়েছেন, যা অন্যদেরকে পৌঁছান নি-এ আকীদা মূলত সাবাঈ চক্রের ছিল (যাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে উম্মত একমত) সাবাঈ চক্র এ আকীদা হযরত আলী রাযি.-এর যুগেই রটিয়েছিল। আর হযরত আলী রাযি. সুস্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে একাধিক সহীহ রেওয়ায়াত রয়েছে। দেখুন ঃ

عن عامر بن واثلة قال : سأل رجل عليا رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسر إليك بشيء دون الناس؟ فغضب علي رضي الله عنه حتى احمر وجهه، و قال : ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات، و

أنا و هو في البيت، فقال : لعن الله من لعن والده، و لعن الله من ذبح لغير الله، و لعن الله من آوى محدثا، و لعن الله من غير منار الأرض.

رواه النسائي، و إسناده صحيح، و أصل الحديث في صحيح مسلم.

"আমের ইবনে ওয়াসেলা বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী রাযি.-কে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী লোকের অগোচরে আপনাকে গোপনে কিছু বলে গেছেন? এ কথা শুনে ক্রোধে হযরত আলী রাযি.-এর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকের অগোচরে আমাকে কিছু বলে যান নি; তবে আমাকে তিনি চারটি কথা বলে গেছেন, তখন আমরা ছিলাম ঘরের ভেতর। তিনি ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি তার পিতাকে লানত করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে লানত করেন; যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর লানত করেন; যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর লানত করেন; যে ব্যক্তি জমির চিহ্ন (সীমানা) এদিক-সেদিক করে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর লানত করেন।" –সুনানে নাসায়ী ২/১৮৩-১৮৪. হাদীস ৪৪২২

সুতরাং এ ধরনের উক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ রজনীতেই নব্বই হাজার কালাম লাভ করেছিলেন ... সেগুলো একমাত্র হযরত আলী রাযি.-কে গোপনে বলে গেছেন...) ভিত্তিহীন ও কুফরী কালাম, যা উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। তাই এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস বর্জন করা অপরিহার্য।

জুলাই-২০০৫

ভুল বিশ্বাস

রাতের বেলায় ঝুটা পানি বাইরে ফেলা কি অলুক্ষণে?

রাতের বেলায় ঝুটা পানি বা খাবার পানি জাতীয় কিছু বাইরে ফেলা যাবে না। এ ধরনের একটি ভুল বিশ্বাস আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। মনে করা হয়, এতে সৌভাগ্য দূর হয়ে যায় এবং এটা মারাত্মক ধরনের অলক্ষুণে ব্যাপার। মৃত মুরব্বীদের রূহ রাতের বেলায় ঘোরাফেরা করে থাকে, তাই ঝুটা পানি ইত্যাদি ফেললে তারা অসন্তুষ্ট হন।

এটি একটি ভুল বিশ্বাস। ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই। এমনকি বাস্তবের সাথেও এ বিশ্বাসের কোন মিল নেই। বাসী-পচাঁ পানি, ঝুটা ইত্যাদি সারা রাত ঘরে জমিয়ে রাখার কোনই যৌক্তিকতা নেই। এটি এমন একটি মারাত্মক ভুল বিশ্বাস, যার আকলী-নকলী কোন ভিত্তিই নেই। রূহ ঘোরাফেরার আকীদাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অসত্য ঘটনা

'ফাতেমার জারি'

'ফাতেমার জারি' নামে একটি মিথ্যা ঘটনা আমাদের সমাজে বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে খুব আলোচিত। ঘটনার বিবরণ—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে উম্মে কুলসূম রাযিয়াল্লাহু আনহা যিনি হযরত ওসমান গণি রাযি. এর স্ত্রী ছিলেন। ওসমান গণি রাযি. এর স্ত্রী হওয়ার কারণে উম্মে কুলসূম রাযি. ছিলেন অনেক সম্পদের অধিকারী। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর কন্যা তাঁর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা রাযি. ছিলেন অত্যন্ত গরীব। তাঁর স্বামী হযরত আলী রাযি. ছিলেন সহায়-সম্বলহীন।

উম্মে কুলসূম রাযি. মদীনার মহিলাদের দাওয়াত করেছিলেন, কিন্তু আপন বোন ফাতেমাকে দাওয়াত করেন নি। কারণ ফাতেমা রাযি. গরীব হওয়ায় তাঁর উপযুক্ত এমন কোন পোশাক ছিল না, যা পরে এত বড় দাওয়াতের মজলিসে তিনি হাজির হতে পারেন। ফাতেমাকে দাওয়াত করলে, সে পুরানো ছেঁড়া-তালি দেওয়া পোশাক পরে আসলে, উম্মে কুলসূমের মান-ইজ্জত চলে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ) এজন্য তিনি তাকে দাওয়াত করেন নি।

ফাতেমা রাযি. যখন জানতে পারলেন তাঁর আপন বোন মদীনার সব মহিলাকে দাওয়াত করেছেন, কিন্তু তাঁকে দাওয়াত করেন নি। তখন তাঁর মনে খুব ব্যথা লাগলো। তিনি মনের দুঃখে কেঁদে ফেললেন। অপরদিকে দাওয়াতী মেহমানরা যখন উম্মে কুলসূমের বাড়িতে খেতে বসেছে তখন তারা দেখে পাকানো সব ভাত চাল হয়ে গেছে। আর সব গোশত পাথর হয়ে গেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘটনাটি সম্পূর্ণই কাল্পনিক। ইতিহাস বা সীরাতগ্রন্থের কোথাও এর কোন অস্তিত্ব নেই। উপরন্তু এ বানানো ঘটনার দ্বারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কন্যা বিশিষ্ট সাহাবীয়া হযরত উম্মে কুলসুমের উপর একটি মিথ্যা অপবাদ ও কালিমা লেপন করা হয়, যা নিঃসন্দেহে গোনাহে কবীরা। যারা এগুলো প্রচার করে, শুনে ও বিশ্বাস করে তারা সবাই এ কবীরা গোনাহে লিপ্ত।

ভুল কথা

তোমাকে শনির দশায় পেয়েছে!

কারো কোনো খারাপ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য অনেকে বলে থাকে-

'তোমাকে শনির দশায় পেয়েছে' অথবা বলে থাকে, 'তোমাকে শনিতে পেয়েছে।'

শরীয়ত গর্হিত একটা বিশ্বাস থেকে এ কথাটির উৎপত্তি। শনি সৌরজগতের একটি গ্রহের নাম; যা আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে চলে। কারো কোন ক্ষতি করার মত শক্তি এর নেই। কিন্তু এসব জ্যোতিষ্ক বা নক্ষত্রপূজারীরা একেক নক্ষত্রকে একেক বিষয়ে শক্তিধর মনে করে। এর মধ্যে কারো ক্ষতি সাধনের জন্য শনিগ্রহকে শক্তিধর মনে করে থাকে। সে হিসেবেই খারাপ অবস্থা বা ক্ষতিকর পরিস্থিতির ক্ষেত্রে তারা বলে থাকে, 'তোমাকে শনির দশায় পেয়েছে'। একজন মুসলমান হিসেবে এ কথাটি আমাদের মুখে উচ্চারিত হওয়া অন্যায়। এ ভুল কথাটি পরিহার করা জরুরি।

ভুল আমল

ইমামকে রুকুতে পেলে কি তাকবীর বলে হাত বেঁধে দাঁড়াতে হয়?

ইমামকে রুকুতে পেলে নিয়ম হল প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। তারপর দুহাত তুলে তাকবীর বলবে এবং হাত ছেড়ে দেবে। হাত বাঁধবে না। এরপর দাঁড়ানো থেকে তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনেকেই যে ভুলটা করে থাকে তা হচ্ছে প্রথম তাকবীর বলে হাত বেঁধে দাঁড়ায়। এরপর তাকবীর বলে রুকুতে যায়। এখানে হাত বাঁধার কোন প্রয়োজন নেই। আবার অনেকে প্রথম তাকবীর বলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। রুকুতে যেতে যেতে তাকবীর বলে। এটা ভুল। কেননা তাকবীরে তাহরীমার জন্য দাঁড়ানো জরুরি।

সুন্নত

সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করা!

কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে সুন্নত হলো পরস্পরে সালাম বিনিময় করা। ছোট হোক, বড় হোক, শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, রাজা হোক, প্রজা হোক সবার বেলায় এটিই প্রযোজ্য।

বিদআত

সাক্ষাতে কদমবুসি করা বা সালামের ইশারা করা!

সালাম না দিয়ে কদমবুসি করা অথবা হাতে সালামের ইশারা করেই পায়ের উপর লুটিয়ে পড়া অথবা সম্মান প্রদর্শনার্থে মাথা নুয়ে অভিবাদন জানানো। এসবই বেদআত। তাই এগুলো পরিহারযোগ্য।

হাদীস নয়

প্রতি ৪০ জনে একজন ওলী

مَا مِنْ جَمَاعَةٍ اِجْتَمَعَتْ إِلاَّ وَ فِيْهِمْ وَلِيٌّ اللهِ، لاَ هُمْ يَدْرُوْنَ بِهِ، وَ لاَ هُوَ يَدْرِيْ بِنَفْسِهِ.

'সমবেত প্রতিটি জামাআতেই আল্লাহ্ তাআলার একজন ওলী থাকেন। তারাও জানে না সে কে, এমনকি সে নিজেও জানে না।'

এ কথাটি নিম্নোক্ত শব্দে অধিক প্রসিদ্ধ-

'প্রতি চল্লিশ জনে একজন আল্লাহ্র ওলী থাকেন'

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস ইবনে আবিল ইয্ রহ. এ সম্পর্কে বলেন–

لا أصل له، و هو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا، و قد يكونون فساقا يموتون على الفسق.

অর্থাৎ এটির কোন ভিত্তি নেই। আর কথাটিও বাতিল। কেননা কখনো গোটা জামাআতই হয় বে-দ্বীন, ফাসেক।"

মোল্লা আলী কারী রহ.-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন এবং বলেন–

لا أصل له, و هو كلام باطل

'এটি একটি বাতিল কথা এবং এর কোন ভিত্তিই নেই।' – **শরহুল আকীদাতিত তহাবিয়া ৩৪৭-৩৪৮; আলমাসনূ ১৬১; আলমাওযূআতুল কুবরা ১০৬; কাশফুল খাফা ২/১৯৪**

আগষ্ট-২০০৫

ভুল ঘটনা

আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর রূহ ফিরিয়ে দেওয়া!

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. সম্পর্কে একটি ঈমান বিধ্বংসী মিথ্যা ঘটনা মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে। ঘটনাটি এ রকম–*একবার এক বৃদ্ধার*

ছেলে মারা যাওয়ার পর সে আব্দুল কাদের জিলানী রহ.-এর দরবারে এসে হাজির হল। হায়-হুতাশ করতে করতে সে এসে শায়খের কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল; মৃত্যুর ফেরেশতা যেন তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেয়।

মহিলার অবস্থা দেখে তাঁর দয়া হল। তিনি আশ্বাস দিলেন, তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করবেন। সেদিন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মালাকুল মউতের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। মালাকুল মউত সেদিন যতগুলো রূহ কবজ করেছিলেন তা একটি থলে ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত জিলানী রহ. তাঁকে ডেকে বললেন, অমুক অসহায় মহিলার ছেলের যে রূহ আজ তুমি কবজ করেছ তা ফিরিয়ে দাও। মালাকুল মউত বিনয়ের সাথে বললেন, হুজুর! এ কি সম্ভব? মানুষের একবার মৃত্যু হলে সে কি আর জীবিত হতে পারে?

আব্দুল কাদের জিলানী রহ. বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি ছেলেটির রূহ ফিরিয়ে দিলেন না, তখন তিনি তাঁর কাছ থেকে রূহভর্তি থলেটি কেড়ে নিলেন এবং থলের মুখ খুলে দিয়ে মালাকুল মউত সেদিন যত রূহ কবজ করেছিলেন সবগুলো রূহ ছেড়ে দিলেন। ফলে সেদিন যত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল তারা সবাই জীবিত হয়ে গেল।

এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘটনা। সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করার জন্য ইসলাম-বিদ্বেষীরা এসব ঘটনা তৈরী করেছে। এ ধরনের ঘটনাকে সত্য বলে ধারণা করলে ঈমানের ক্ষতি হবে।

ভুল আমল

ইমামকে সিজদায় পেলে নিজে নিজে রুকু-সিজদা করা!

কিছু লোককে দেখা যায় জামাত ধরার জন্য যখন তারা মসজিদে গিয়ে দেখেন ইমাম সিজদা অবস্থায় আছেন, তখন তারা তাকবীর বলে হাত বেঁধে প্রথমত নিজে নিজে রুকু করে। তারপর ইমামের সাথে সিজদায় শরীক হয়। তেমনিভাবে এক সিজদা ছুটে গেলে সে সিজদাও নিজে নিজে আদায় করে দ্বিতীয় সিজদায় ইমামের সাথে শরীক হয়।

এটা ভুল আমল। নিয়ম হল ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সরাসরি সে অবস্থাতেই শরীক হয়ে যাবে। এর আগে শুধু তাকবীরে তাহরীমা বলে উভয় হাত উঠিয়ে হাত ছেড়ে দিবে। এরপর আরেক তাকবীর বলে ইমাম যে অবস্থায় আছে সেখানেই ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে। হাতও বাঁধবে

না; ছুটে যাওয়া অন্য কোন আমলও করবে না। রুকুতে পেলে রাকাত পেল, রুকুতে না পেলে রাকাত পেল না। বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি।

একটি অবহেলা

জুমার নামাযের পর চার রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় না করা!

জুমার নামাযের পর মুনাজাত করার জন্যে ক্ষেত্র বিশেষে দশ-পনের মিনিট অপেক্ষা করতে কারো কোন অসুবিধা বোধ হয় না। কিন্তু মুনাজাতের পর চার রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় করতে অনেকেরই ধৈর্যে কুলায় না। অথচ এ সময়ে মুনাজাত এমন কোন জরুরি বিষয় নয় যা করতেই হবে। আর চার রাকাত সুন্নত হচ্ছে অবশ্যকরণীয় একটি সুন্নত। এ বিষয়টির ব্যাপারে আমাদের অবহেলা অমার্জনীয়।

সুন্নত

সন্তান জন্মের সাতদিন পর আকীকা করা!

সন্তান জন্মের সাতদিন পর আকীকা করা সুন্নত; মাথার চুল কামিয়ে সে পরিমাণ রূপার মূল্য সদকা করা সুন্নত। আকীকার ক্ষেত্রে ছেলের জন্যে দুটো ছাগল আর মেয়ের জন্যে একটি ছাগল জবাই করা সুন্নত এবং নববী পদ্ধতি।

বিদআত

জন্ম-অনুষ্ঠান পালন করা!

সুন্নত পদ্ধতিতে আকীকা না করে নিজের মনমত কোন দিন জন্ম-অনুষ্ঠান পালন করা। সে অনুষ্ঠানে সুন্নত পরিপন্থী অনেক কাজ করা যেমন–১. সাত দিনের হিসেবের প্রতি খেয়াল না করা, ২. নির্ধারিত দিনে বাচ্চার চুল না কাটা, ৩. সদকা না করা, ৪. বকরি বা ভেড়া জবাই না করা এবং ৫. যশ ও খ্যাতির জন্যে যত ধরনের গর্হিত কাজ করতে হয় সব কিছু করা। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন।

একটি অমার্জিত আচরণ

কেউ বাথরুমে বা টয়লেটে গেলে তাকে তাড়াতাড়ি বের হওয়ার জন্য তাগাদা দেওয়া বা বারবার দরজায় নক করা বড় অন্যায় ও অভদ্র আচরণ।

বাইরের ব্যক্তি যে পরিমাণ প্রয়োজনে তাগাদা দিচ্ছে, ঠিক সে পরিমাণ প্রয়োজনেই ভেতরের ব্যক্তি ভেতরে আছে। তাই এ আচরণের কোন মানে হয় না। যে কোন আচরণের আগে এর পূর্বাপর ভেবে দেখা জরুরি। এতে সম্মিলিত জীবনে সবাই শান্তি পাবে।

হাদীস নয়

আলেমের চেহারার দিকে তাকানোর সাওয়াব

نَظْرَةٌ إِلٰى وَجْهِ الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً صِيَامًا وَ قِيَامًا.

'আলেমের চেহারার দিকে একবার তাকানো আল্লাহ্ তাআলার নিকট ষাট বছরের রোযা-নামাযের চেয়ে উত্তম।'

লোকমুখে প্রসিদ্ধ উপরোক্ত কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। কোন এক মিথ্যাবাদী কর্তৃক সামআন ইবনে মাহদী-এর নামে জালকৃত পুস্তকে ছাড়া অন্য কোথাও বর্ণনাটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লামা সাখাবী রহ. ও মোল্লা আলী কারী রহ.সহ অনেক হাদীস বিশারদ উলামায়ে কেরাম এটিকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কিন্তু উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। এ সম্পর্কে একাধিক আয়াত ও সহীহ হাদীস রয়েছে। তাছাড়া দ্বীনদার হক্কানী উলামায়ে কেরামের সংশ্রব অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শরীয়তে অপরিসীম।

–আলমাকাসিদুল হাসানা ৫২২; আলমাওযূআতুল কুবরা ১৩২; কাশফুল খাফা ২/৩১৮; আললুউলুউল মারসূ ৯৬

সামআনের নামে এ জালকৃত পুস্তিকাটির জন্যে আরো দ্রষ্টব্য–মীযানুল ইতিদাল ২/২৩৪; লিসানুল মীযান ৩/১১৪; আলমাসনূ ২৪৭

সেপ্টেম্বর-২০০৫

ভুল বিশ্বাস

পরকালে লাইলি-মজনুর বিয়েতে শরীক হওয়া!

সেদিন মনির মিয়ার সাথে চা খেতে খেতে রাশেদ চাচা বললেন, 'যে ব্যক্তি জীবনে কখনো দাড়ি কাটবে না সে ব্যক্তি পরকালে লাইলি-মজনুর বিয়েতে শরীক হতে পারবে।'

এটি একটি ভুল বিশ্বাস। আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষের অনেকেই এ ভুল ধারণাটি পোষণ করে থাকে, যা একেবারেই ভিত্তিহীন।

প্রথমত পরকালে লাইলি-মজনুর বিয়ের কথাটিই একটি ভিত্তিহীন কথা। এরপর দাড়ি কাটা না কাটার সাথে এর সম্পৃক্ততা একেবারেই কল্পনাপ্রসূত। দাড়ি রাখা ও না কাটার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেক সহীহ স্পষ্ট হাদীস রয়েছে। এছাড়া এটি সকল নবী আলাইহিমুস সালামের সুন্নত ছিল। একে মুসলমানের ফিতরাত বা স্বভাব বলা হয়েছে। একথাগুলো বলেই দাড়ি রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা উচিত।

দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং এক মুষ্ঠির কম করা না জায়েয এ বিধান সবারই জানা।

ভুল ঘটনা

রাবেয়া বসরীর জাহান্নামের আগুন নিভানো!

কোন কোন বক্তার মুখে একটি ঘটনা শোনা যায় যার কোন ঐহিতাসিক ভিত্তি নেই। ঘটনার বিবরণে বলা হয়ে থাকে –*একদিন রাবেয়া বসরী নাম্নী এক মহিয়সী নারী এক গ্লাস পানি নিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়াচ্ছিলেন। তাঁর অস্বাভাবিক দৌড়ের গতির দিকে লক্ষ্য করে পথচারিরা অবাক হয়ে গেল। একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি ওই পানিটুকু নিয়ে এভাবে পেরেশান হয়ে কোথায় দৌড়ে যাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন, 'শুনতে পেলাম মানুষ নাকি জাহান্নামের আগুনের ভয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করছে, তারা আল্লাহ্‌র মহব্বতে ইবাদত করছে না। তাই আমি এ পানি নিয়ে যাচ্ছি জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দেওয়ার জন্য। যেন মানুষ জাহান্নামের আগুনের ভয়ে ইবাদত না করে, একমাত্র আল্লাহ্‌র মহব্বতেই ইবাদত করে।'*

এ ঘটনাটি ভিত্তিহীন। নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস গ্রন্থ বা রাবেয়া বসরী রহ.-এর উপর রচিত কোন নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। উপরন্তু এমন ঘটনার কোন যৌক্তিকতাও নেই। কারণ দোযখের ভয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার মাঝে অপছন্দনীয় কিছু নেই। তাই কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে জান্নাত-জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে মানুষদেরকে দীনের দিকে ডাকা হয়েছে।

দোযখ আল্লাহ্‌ তাআলার শাস্তির স্থান। সুতরাং দোযখকে ভয় করা পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌কেই ভয় করা। তেমনি বেহেশত আল্লাহ্‌ তাআলার রহমত ও পুরস্কারের স্থান। তাই বেহেশতের আশা করার অর্থই হল আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করা।

ভুল কথা

আল্লাহ্‌র সহ্য হবে না!

কারো অত্যাচারের ভয়াবহতা বা বে-ইনসাফির সীমাতিরিক্ততা প্রকাশ করার জন্য অনেকে বলে থাকে, 'তার এত জুলুম আল্লাহ্‌রও সহ্য হবে না।'

এ ভাবে বলা ভুল। কারণ সহ্য না হওয়া একটি দুর্বলতা যা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এমন কোন ব্যাপার ঘটতে পারে না যা আল্লাহ্ সহ্য করতে পারবেন না। আল্লাহ্ অন্যায়ের শাস্তি দিবেন। জুলুমের বদলা নেবেন এবং বে-ইনসাফির উপযুক্ত সাজা দিবেন। আল্লাহ্ তাআলা সে ক্ষমতা রাখেন। তাই 'আল্লাহ্‌র সহ্য হবে না' বা 'সহ্য করবেন না' এ জাতীয় কোন বাক্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা জরুরি।

সুন্নত

বিয়ের পর ওলীমা করা!

বিয়ের পর সব ধরনের শরীয়ত বিরোধী রসম-রেওয়াজ পরিহার করে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে ওলীমা করা, সুন্নত।

বিদআত

মেয়ের অভিভাবককে নির্দিষ্ট সংখ্যক মেহমানদারীতে বাধ্য করা!

নিজের শত শত পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে মেয়ের বাড়িতে যাওয়া এবং মেয়ের অভিভাবককে নির্দিষ্ট সংখ্যক মেহমানের মেহমানদারি করাতে বাধ্য করা। এটা একটা বিদআত এবং বাধ্যতামূলকভাবে আদায়কৃত খানার বৈধতাও প্রশ্নবিদ্ধ। এসব অবৈধ পদ্ধতি পরিহার করা জরুরি।

হাদীস নয়

اَلْحَدِيْثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

মসজিদে (দুনিয়াবী) কথাবার্তা নেকিকে এমনভাবে খতম করে, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে!

এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। আল্লামা সাফ্‌ফারীনী রহ. বলেন, 'এটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা।' -গিযাউল আলবাব শরহু মানযূমাতিল আদাব ২/২৫৭-আলমাসনূ ৯৩ (টীকা)

হাফেয ইরাকী রহ. বলেছেন যে, তিনি এর কোন ভিত্তি খুঁজে পান নি। আল্লামা যাবীদী রহ. হাদীসটির ব্যাপারে হাফেয ইরাকী রহ. এর উক্ত অভিমতকে সমর্থন করেছেন।-ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৩/৩১-আলমাসনূ ৯৩ (টীকা)

আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ হল পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। মসজিদের ভিত্তিই হল নামাযের জন্য এবং যিকির, তালীম ও অন্যান্য দ্বীনী আমলের জন্যে। একে দুনিয়াবী কথাবার্তা ও কাজ-কর্মের স্থান বানানো অথবা এ উদ্দেশ্যে মসজিদে জমায়েত হওয়া হারাম। তবে কোন দ্বীনী কাজের উদ্দেশ্যে অথবা ওজরবশত আরামের জন্যে মসজিদে যাওয়ার পর প্রসঙ্গক্রমে দুনিয়াবী কোন বৈধ কথাবার্তা বলা জায়েয। এর বৈধতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। দ্রষ্টব্য সহীহ বুখারী ১/৬৩, ৬৪ ও ৬৫; মূসাফফা-রাদ্দুল মুহতার (শামী) ১/৬৬২; আললুউলুউল মারসূ ৭৮।

অক্টোবর-নভেম্বর-২০০৫

ভুল বিশ্বাস

পৃথিবী ষাড়ের শিংয়ের উপর বিদ্যমান!

পৃথিবীর অবস্থান সম্পর্কে এখনও কারো মাঝে এ ভুল বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে যে, পৃথিবী একটা ষাড়ের শিংয়ের উপর বিদ্যমান। সে ষাড়টি একটি মাছের পিঠের উপর দণ্ডায়মান। ষাড়ের ১টি শিং ব্যথা হয়ে গেলে যখন সে পৃথিবীকে অন্য শিংয়ে স্থানান্তর করে তখন ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়।

এ বিশ্বাসটি একেবারেই অবাস্তব। বরং পৃথিবী তো হল নিজ গতিতে ঘুর্ণায়মান, যার মাঝে ষাড়ের শিংয়ের কোন অস্তিত্ব নেই। আর ভূকম্পন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সতর্কীকরণমূলক নিদর্শনাবলির একটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সংঘটিত হয়। উপরোক্ত ভুল বিশ্বাস হিসেবে পুরো পৃথিবীতে একসাথে ভূমিকম্প হওয়ার কথা ছিল। অথচ এমনটি হয় না।

আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে বাহ্যিক যেসব কারণ দর্শানো হয় ষাড়ের শিংয়ের সাথে তার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। বলাবাহুল্য, কুরআন হাদীস এবং ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে কোন ধরনের ভ্রান্ত ও অলীক কল্পকাহিনীর স্থান নেই। ভিত্তিহীন এসব উদ্ভট বিশ্বাস থেকে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন।

ভুল প্রচলন

কবরের প্রথম কোপের মাটিকে কবরের নিশানা হিসেবে ব্যবহার করা।

কোন কোন এলাকায় দেখা যায়, কবর খোঁড়ার সময় প্রথম কোপে যে মাটির চাকাটি তোলা হয় তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রথম কোপের মাটি বিশেষ হেফাযতে রেখে, লাশ দাফন শেষ হলে সে চাকাটি মুরদারের মাথা বরাবর রেখে দেওয়া হয়।

প্রথম কোপের মাটির প্রতি এধরনের বিশেষ গুরুত্বের কোন ভিত্তি নেই। এক্ষেত্রে যদি কবরের নিশানা রাখার প্রয়োজন হয়, তাহলে যে কোন পাথর, ইট বা মাটির চাকা দিয়েই চিহ্ন রাখা যায়।

নামের উচ্চারণের ভুল

হেল্লাল/বেল্লাল

এ উচ্চারণ দুটো ভুল। শব্দ দুটোর উচ্চারণ যথাক্রমে হেলাল ও বেলাল। শব্দ দুটোর বিকৃত উচ্চারণের কারণে অর্থগত ভুলের পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনের নামের সাথেও এক ধরনের বেয়াদবী। সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গণের অনেকের এ নাম রয়েছে।

হাদীস নয়

اَلْأَذَانُ جَزْمٌ، وَالْإِقَامَةُ جَزْمٌ، وَ التَّكْبِيْرُ جَزْمٌ

আযান, ইকামত ও তাকবীরে জযম হবে!

মাসআলা হল আযান ও ইকামতের শব্দগুলোর শেষ অক্ষর সাকিন হবে। আর ইকামতের পদ্ধতি হল, প্রথম চার তাকবীর এক সাথে বলবে। এর পরের বাক্যগুলো শেষ তাকবীরের আগ পর্যন্ত দুটো বাক্য একসাথে বলবে। যেমন 'আশহাদু আললা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুইবার একসাথে বলবে। আর শেষ তাকবীর দুটো ও কালেমা তায়্যিবা একসাথে পড়বে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক বাক্যের শেষ হরফে সাকিন করবে। এ সব কিছুই ঠিক। কিন্তু কেউ কেউ এই মাসআলাটির পক্ষে উপরোক্ত উক্তিটিকে দলীল হিসাবে পেশ করে। আবার কেউ মনে করে, এটি নবীজীর হাদীস।

বাস্তবে এটি হাদীস নয়; বরং প্রসিদ্ধ তাবেঈ ইমাম ইবরাহীম নাখায়ী রহ. (ইন্তেকাল ৯৫ হি.)-এর উক্তি। আল্লাম সাখাবী রহ.-এ সম্পর্কে বলেন-

لا أصل له في المرفوع ... إنما هو من قول إبراهيم النخعي.

"মারফূ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে এর কোন ভিত্তি নেই।...; বরং এটি ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর উক্তি।"

–আলমাকাসিদুল হাসানা ১৯৩

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী এবং আল্লামা লাখনোভী রহ. প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম একই মত পোষণ করেছেন।

মোটকথা, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয় এবং বাক্যটির যে অর্থ করা হয় তাও ঠিক নয়। কেননা, সাধারণত মনে করা হয় যে, এখানে জযম শব্দটি সাকিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উক্তিটির এরূপ অর্থ করা হয় যে, "আযান, ইকামত ও তাকবীরের শেষ অক্ষর সাকিন করে পড়তে হবে।"

অথচ জযম শব্দটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী ও তাবেঈদের যুগে এই অর্থে ব্যবহৃত হত না; বরং এ স্থলে জযম দ্বারা উদ্দেশ্য হল অস্থানে মদ না করা। অর্থাৎ আযান, ইকামত ও তাকবীরের শব্দগুলোতে যেখানে মদ বা টান নেই সেখানে টেনে না পড়া এবং যেখানে টান আছে সেখানে মদ করতে অতিরঞ্জন না করা। অবশ্য একথা ঠিক যে, আযান-ইকামত ও তাকবীরের শব্দগুলোর শেষ বর্ণ সাকিন হবে। তবে এ মাসআলাটির দলীল ইবরাহীম নাখায়ীর রহ. উক্ত কথাটি নয়; বরং মাসআলাটির ভিন্ন দলীল রয়েছে, যা মাআরিফুস সুনানসহ অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। দ্রবষ্ট্য ঃ আততালখীসুল হাবীর ১/২২৫; আলহাভী লিলফাতাভী ২/৭১; তাযকিরাতুল মাওযূআত ৩৮; আদ্দুরারুল মুনতাসিরা ১০৪; আলমাসনূ ৮৩; মাওযূআতে কুবরা ৫৬; ফাতাওয়া শামী ১/৩৮৬, ৪১৮

ডিসেম্বর-২০০৫

ভুল আমল

গোসল শেষে ওযু করা!

দেখা যায় অনেকে গোসল শেষ করে আবার পুরা ওযু করে। ওযু কেন করেছে জিজ্ঞাসা করলে বলে থাকে, নামায পড়ব তাই। এর মানে হল তারা মনে করে নামায পড়ার জন্য গোসল করাটা যথেষ্ট হয় নি। তাই নামাযের জন্য আবার ওযু করে থাকে। এটা একটা ভুল আমল। গোসলের পর ওযু করার কোন বিধান নেই। ফরয গোসল হলে কুলি করা ও নাকে পানি

দেওয়া ফরয এবং পূর্ণ ওযু করে নেওয়া সুন্নত যা গোসলেরই একটি অংশ। তাই যথাযথভাবে গোসল করার পর নতুন করে আবার ওযু করা ঠিক নয়।

ভুল প্রথা

স্বামী মারা গেলে স্বামীর গোসলের সাথে স্ত্রীকে গোসল করানো!

স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বর্ণ-অলঙ্কার ও সাজসজ্জা ত্যাগ করে ইদ্দত পালন শুরু করবে এ বিধান শরীয়তের আছে; কিন্তু কোন কোন এলাকায় দেখা যায়, স্বামীর লাশ গোসল করানোর সাথে সাথে স্ত্রীকেও গোসল করানোকে জরুরি মনে করা হয় এবং যেভাবে পুরুষরা স্বামীর লাশকে গোসল দেয়, অনুরূপ মহিলারা স্ত্রীকে গোসল দিয়ে থাকে। শরীয়তে এ প্রথাটার কোন ভিত্তি নেই।

এক্ষেত্রে আরেকটু অতিরিক্ত সংযোজনও রয়েছে। তা হচ্ছে, স্ত্রীকে গোসল করানোর পর যে সাদা শাড়িটা পরতে দেওয়া হবে তা স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকেরা নিয়ে আসতে হবে। এ প্রথাটারও শরীয়তের কোন ভিত্তি নেই। এ ধরনের ভিত্তিহীন বিষয়গুলোর পেছনে সময় ব্যয় না করে শরীয়তে যে কাজগুলো করতে বলা হয়েছে সেগুলোর প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া জরুরি।

একটি অমার্জনীয় আচরণ

বিনা ওযরে দাঁড়িয়ে পেশাব করা!

বিনা ওযরে দাঁড়িয়ে পেশাব করা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি ঘৃণিত কাজ। তাই এমনটি করা কখনো উচিত নয়। কিন্তু এ অপছন্দনীয় কাজটা মারাত্মক অপরাধে পরিণত হয় যখন কোন ব্যক্তি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে পেশাব করে যেখানে বসে পেশাব করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একটি পেশাবখানা সাধারণত বেশি বড় হয় না। কাপড় গুটিয়ে কোন রকমে বসলেও দেয়ালে কাপড় বা হাঁটু লেগে যায়। এমন জায়গায় কেউ দাঁড়িয়ে পেশাব করলে পেশাবের ছিটায় দেয়াল নষ্ট হবে। একজন মানুষ নিশ্চিন্তে সেখানে বসে পেশাব করতে পারে না। সাধারণত জনগণের ব্যবহারের জন্য যেসব শৌচাগার তৈরি করা হয়ে থাকে সেসব জায়গায় এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অনেক বেশি সতর্ক থাকা জরুরি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এসব ক্ষেত্রেই আমাদের অবহেলা বেশি, যা মার্জনা করা যায় না।

সুন্নত

মৃত ব্যক্তির গোনাহমাফি, কবরে শান্তি ইত্যাদির জন্য দুআ করা।

যে কেউ মারা গেলে যেহেতু তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় তাই জীবিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব হল তেলাওয়াত, তাসবীহ, নামায, দুআ ইত্যাদির মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব করা, মৃত ব্যক্তির গোনাহমাফি, কবরে শান্তি ইত্যাদির জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে দুআ করা। এক্ষেত্রে যেসব ব্যক্তির উপর মৃত ব্যক্তির কোন অবদান আছে তার উপর এ দায়িত্ব বেশি। তাই পরিবারের লোকদের উচিত, সবসময় তার জন্য দুআ করা।

বিদআত

কবরের পাশে লোক দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করানো।

কেউ মারা যাওয়ার পর তার কবরের পাশে লোক দিয়ে পর্যায়ক্রমে কবরের পাশে কুরআন তেলাওয়াত করানো।

ভুল কথা

সব ধরনের দ্বীনী শিক্ষাকে হাফেজী পড়া বলা।

সাধারণ মানুষ তো বটেই অনেক বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মুখে শোনা যায়, তারা কোন বড় আলেমের সাথে কথা বলতে গেলে জিজ্ঞেস করে থাকেন, 'আপনি কী হাফেজী লাইনে পড়াশোনা করেছেন?' 'আপনি কি হাফেজী লাইনে ডিগ্রি নিয়েছেন?' কথাবার্তার সময় বলে থাকেন, 'ফতোয়া দিতে হলে হাফেজী লাইনে পড়াশোনা করতে হয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।

একথাগুলো সবই ভুল। দ্বীনী শিক্ষার যে কোন পর্যায়ের নামই হাফেজী পড়া নয়। বরং দ্বীনী শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে থেকে এটি প্রাথমিক পর্যায়ের একটি শিক্ষা। একটি শিশু মক্তবের পড়াশোনা শেষ করে দু'তিন বছরে ত্রিশ পারা কুরআন সম্পূর্ণ মুখস্থ করার যে কোর্সটি সম্পন্ন করে থাকে তার নাম হল হাফেজী পড়া।

হাদীস নয়

আযানের সময় কথা বললে ঈমান যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَ الْأَذَانِ خِيْفَ عَلَيْهِ زَوَالُ الْإِيْمَانِ

"যে ব্যক্তি আযানের সময় কথা বলবে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।"

আযানের সময় নিয়ম হল আযানের জবাব দেওয়া। মুআযযিন যে শব্দগুলো বলবে, শ্রোতারাও সে শব্দগুলোই বলবে। তবে حي على الصلاة (হায়্যা আলাসসালাহ) এবং حي على الفلاح (হায়্যা আলাল ফালাহ) বলার পর শ্রোতারা لا حول ولا قوة إلا بالله (লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) পড়বে। তারপর আযান শেষে যে কোন দরূদ পাঠ করবে। অবশেষে আযানের এ দুআ পাঠ করবে ঃ

اللهم رب هذه الدعوة التامة، و الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة و الفضيلة،

و ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

এগুলো সবই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে 'আযানের সময় কথা বললে ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে' এ কথাটি কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লামা সাগানী রহ. একে জাল বলেছেন। -রিসালাতুল মাওযূআত ১২; কাশফুল খাফা ২/২২৬, ২৪০

জানুয়ারি-২০০৬

ভুল প্রচলন

উকিল বাবা!

কোন কোন এলাকায় বিয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়ের কাছ থেকে বিয়ের অনুমতি (ইযন) আনার জন্য একজন লোক ঠিক করা হয়, যে মেয়ের বাপ ভাই ব্যতীত অন্য কেউ হয়। এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় গায়রে মাহরাম ব্যক্তিকেই ঠিক করা হয়। এ ব্যক্তিকে বলা হয় উকিল বাবা। এ ব্যক্তি মেয়ে থেকে বিয়ের অনুমতি এনে বিবাহের মজলিসে মেয়ের পক্ষে ওকালতি করে। এ ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে বাপের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের হাদিয়া-তোহফায় অংশীদার হওয়ার পাশাপাশি মেয়ের মাহরামদের মত গণ্য হয় এবং তার সাথে কোন ধরনের পর্দার প্রয়োজন নেই বলে মনে করা হয়।

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, উকিল বাবার সাথে বর-কনে দুপক্ষেরই দুজন করে সাক্ষী যায় এবং মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি আনার সময় সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকে। এ সাক্ষী থাকাকেও জরুরি মনে করা হয়।

এটা একটা ভুল প্রথা। এ প্রথার মাঝে অনেক ভুল ও গর্হিত কাজের সমাহার ঘটে। প্রথমত ইসলামী বিবাহে বিনা প্রয়োজনে মেয়ের মাহরাম থাকা সত্ত্বেও কোন গায়রে মাহরাম ব্যক্তিকে উকিল হিসেবে মেয়ের কাছ থেকে বিবাহের অনুমতি আনার জন্য নির্ধারণ করার কোন বিধান নেই।
দ্বিতীয়ত ধারণাভিত্তিক একটি প্রচলনের উপর ভিত্তি করে একজন গায়রে মাহরাম ব্যক্তিকে মাহরামের স্থলাভিষিক্ত করা এবং তাকে বাপের মত মনে করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। এসব পরিহার করা জরুরি।
তৃতীয়ত মেয়ের কাছ থেকে বিয়ের অনুমতি আনার সময় দুজন সাক্ষী উপস্থিত থাকা জরুরি এ কথাও ঠিক নয়। শুধু একজন তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিলেই হয়। সাক্ষী উপস্থিত থাকার বিষয়টি আকদের ক্ষেত্রে জরুরি, অনুমতি আনার ক্ষেত্রে নয়।
ইযন আনার উক্ত পদ্ধতি ভিত্তিহীন; তাছাড়া এটি এমন একটি কুপ্রথা, যার কারণে পর্দার মত শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হয়। তাই এসব ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত।

জুমার নামাযের নিয়ত

আমাদের দেশের কোন কোন এলাকায় জুমার নামাযের জন্য নিম্নোক্ত নিয়তটি পড়তে হবে বলে মনে করা হয়–

نَوَيْتُ أَنْ أُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِيْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِأَدَاءِ رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَرْضَ اللهِ تَعَالٰى، اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللهُ أَكْبَرُ.

"আমি জুমার দুই রাকাত নামাযের মাধ্যমে যোহরের ফরয নামাযের জিম্মা আদায় করার নিয়ত করছি এবং আমি এ ইমামের পেছনে ইকতেদা করছি, কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে।"
মূলত হাদীস ও শরীয়তের অন্য কোন দলীলে এ ধরনের নিয়তের কোন অস্তিত্ব নেই এবং এ ধরনের কিছু পড়তে হবে এমন বিধানও নেই।
উল্লিখিত কথিত নিয়তে রয়েছে 'আমি জুমার মাধ্যমে যোহরের ফরয নামাযের জিম্মা আদায় করার নিয়ত করছি।' এ কথাটি সঠিক নয়। কারণ যাদের উপর জুমা ফরয, জুমা আদায় করাই তাদের দায়িত্ব। এমন নয় যে তাদের উপর যোহর ফরয ছিল আর জুমার মাধ্যমে সে ফরয আদায় করছে। তাই কথিত নিয়তের এ কথাগুলো স্পষ্ট ভুল।

বস্তুত প্রত্যেক নামাযের মত জুমার নামাযেও নিয়তের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, মনে মনে সংকল্পবদ্ধ হবে যে আমি জুমার নামায পড়ছি।

ভুল মাসআলা

নামাযে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়লে কি নামায ভেঙ্গে যায়?

অনেকের মুখে বলতে শোনা যায়, নামাযের যে কোন অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি আপন জায়গা থেকে নড়ে গেলে নামায ভেঙ্গে যায়। নামাযের জন্য এটি খুঁটি স্বরূপ। এ ধারণাটি ভুল। বিষয়টি মূলত এমন নয়। বরং বিনা প্রয়োজনে নামাযে শরীরের যে কোন অঙ্গ নাড়াচাড়া করাই মাকরূহ। এ ব্যাপারে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তবে পূর্ণ একটি সিজদা অবস্থায় যদি উভয় পা একসাথে উঠে থাকে তাহলে নামায ভেঙ্গে যাবে।

ভুল বিশ্বাস

কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তির মুরগী/হাঁস কুরবানী দেওয়া!

গরু বা ছাগল কুরবানী দিতে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। মনে করা হয় যারা কুরবানী দিতে অক্ষম তারা কমপক্ষে একটি মুরগি বা হাঁস কুরবানী দেবে। এতে সে কুরবানীর সাওয়াব পাবে। তাই এমনটি করা উচিত।

এ ধারণাটি ভুল। শরীয়তে কুরবানীর জন্য যেসব পশু নির্ধারণ করা হয়েছে শুধু সেগুলো দ্বারাই কুরবানী দেওয়া যাবে, অন্য কিছু দিয়ে কুরবানীর সাদৃশ্য অবলম্বন করা হলে কুরবানীর সাওয়াব হবে–এ ধারণা ভিত্তিহীন। এ ধরনের বিশ্বাস ও প্রচলন পরিহারযোগ্য।

ভুল ধারণা

পশু জবাইয়ের সময় কুরবানীদাতাদের নাম পড়া কি জরুরি?

সাধারণ মহলে দেখা যায় কুরবানীর পশু জবাই করার সময় কুরবানীদাতাদের নাম পড়াকে জরুরি মনে করা হয়। ফলে বিষয়টির প্রতি খুব গুরুত্বও দেওয়া হয়। অথচ জবাই করার সময় এভাবে নাম পড়া জরুরি নয়। তবে পশুটি কার কার কুরবানী হিসাবে জবাই করা হচ্ছে তা সুনির্দিষ্ট থাকা জরুরি।

হাদীস নয়
প্রতি বছর ৬ লাখ হাজীর হজ্ব পালন!

"আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কা'বাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, প্রতি বছর ছয় লক্ষ হাজী হজ্ব পালন করবে। হাজীর সংখ্যা কম হলে আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তা পূর্ণ করে দেবেন। কা'বা শরীফকে হাশরের ময়দানে নববধুর মত সজ্জিত করে উপস্থিত করা হবে। আর যারা হজ্ব পালন করেছে তারা কা'বার আঁচল ধরে চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে; আর তারাও কা'বার সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

কা'বা শরীফের বহু মার্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই এবং তা হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে হাফেয ইরাকী রহ. বলেন– لم أجد له أصلا "আমি এর কোন ভিত্তিই পাই নি।"

–তাখরীজে ইহইয়া-ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/৩৫২

মোল্লা আলী কারী, আল্লামা কাউকজী, মুরতাজা যাবীদী এবং আল্লামা শাওকানী রহ. প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম ইরাকী রহ. এর কথা সমর্থন করেছেন। –আলমাসনূ ৬৩, আললুউলুউল মারসূ ২৭, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ৪/২৭৬; আলফাওয়ায়েদুল মাজমূআ ১/১৪২

ফেব্রুয়ারি-২০০৬

ধর্মের বাপ/ভাই

আমাদের দেশের প্রায় জায়গায়ই দেখা যায় ধর্মের বাপ বা ধর্মের ভাই বানানোর একটা প্রচলন রয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কারো বাপ না থাকলে বা ভাই না থাকলে গায়রে মাহরাম কোন ব্যক্তিকে বাপ হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হয় বা ভাই বানিয়ে নেওয়া হয়। আবার কখনো দেখা যায় বাপের সমবয়সী কারো কোন বিশেষ অনুগ্রহ কারো উপর থাকলে তাকে ধর্মের বাপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এমনিভাবে ভাইয়ের সমপর্যায়ের কারো কোন বড় ধরনের অনুগ্রহ নিজের উপর থাকলে তাকে বড় ভাই হিসেবে মনে করা হয়। এ উভয় ক্ষেত্রে যাকে ধর্মের বাপ বা ভাই বানানো হয়েছে তার সাথে নিজের বাপ বা ভাইয়ের মত আচরণ করা হয়। পুরুষ-মহিলার ক্ষেত্রে পর্দার কোন তোয়াক্কা করা হয় না। এমনিভাবে একজন গায়রে মাহরাম ব্যক্তির সাথে যেসব আচার-আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো এক্ষেত্রে মানতে হবে না বলে মনে করা হয়।

এ প্রচলনটি সম্পূর্ণই ভুল। শরীয়তের বাতানো গণ্ডির বাইরে নিজের মতে কাউকে বাপ বা ভাই বানিয়ে নিলেই সে বাপ বা ভাই হয়ে যায় না। কোন কারণবশত কাউকে মুরব্বী হিসেবে গ্রহণ করাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এর দ্বারা শরীয়তের স্বীকৃত বিধি-বিধান লঙ্ঘন করার অধিকার কারো নেই। এ ভিত্তিতে অনেকে ধর্মের ভাই বা বাপকে উত্তরাধিকারের বেলায়ও অংশীদার মনে করে থাকে। এরও কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

সুন্নত

মুসলমানের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় সালাম দেওয়া।

যে কোন মুসলমানের কবর বা মাজারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সুন্নত আমল হল কবরবাসীদের লক্ষ করে এভাবে সালাম দেওয়া–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالْأَثَرِ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ

যদি সম্ভব হয় সূরা ফাতিহা, দরূদ ইত্যাদি পড়ে কবরবাসীর জন্য ঈসালে সাওয়াব করা এবং সবার জন্য মাগফেরাতের দুআ করা।

বিদআত

কবর অতিক্রম করার সময় হাতে চুমু খাওয়া ইত্যাদি।

কোন কবর বা মাজার অতিক্রম করার সময় হাতে চুমু খাওয়া, মাথা ঝুকিয়ে দেওয়া, মাজারের দিকে হাত জোড় করে বাড়িয়ে দেওয়া এবং মাজারকে পেছনে না ফেলার কসরত করা এবং সামনে রেখে ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করা ইত্যাদি আমল বিদআত। ইসলামে এসব আমল ও ধারণার কোন ভিত্তি নেই।

হাদীস নয়

আহারের শুরু ও শেষ লবন দিয়ে করা। কারণ লবন সত্তরটি রোগের ওষুধ। যথা পাগলামি, কুষ্ঠ, শ্বেত....।

হাদীস হিসেবে এর যথেষ্ট জনশ্রুতি আছে। কিন্তু বাস্তবে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নয়। এটি একটি জাল বর্ণনা।

ইমাম বায়হাকী, ইবনুল জাওযী, ইবনুল কায়্যিম, হাফেয সুয়ূতী এবং আল্লামা ইবনে আররাক রহ. প্রমুখ মুহাদ্দেসীনে কেরাম একে জাল বলেছেন। -দালায়েলুন নুবুওওয়া ৭/২২৯: আলমানারুল মুনীফ ৫৫; আললাআলিল মাসনূআ ২/৩৭৪-৩৭৫; তানযীহুশ শরীয়া ২/৪৩, ৩৩৯

কেউ কেউ বর্ণনাটাকে এভাবেও বলে থাকে, 'যে ব্যক্তি খাবারের আগে ও পরে লবণ খায় সে তিনশ ষাটটি রোগ হতে নিরাপদ থাকে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন হল কুষ্ঠ ও ধবল।'

এটাও হাদীস নয়। সম্পূর্ণ জাল ও ভিত্তিহীন কথা। হাফেয সুয়ূতী রহ. এবং আল্লামা ইবনে আরারাক রহ. একে জাল বলেছেন। -যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ১৪২, আলমাসনূ ৭৪ (টীকা) তানযীহুশ শরীয়া ২/২২৬

উল্লেখ্য, লবণ খাওয়ার কোন উপকারিতা যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানে বা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হয় তবে তা আপন জায়গায় ঠিক আছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেহেতু উক্ত কথাগুলো প্রমাণিত নেই তাই এগুলোকে হাদীস বলার কোন অবকাশ নেই।

মার্চ-২০০৬

ভুল ধারণা

ইসলামের ফরয কি সর্বমোট ১৩০টি?

'মকসূদুল মুমিনীন'-এর মত কিছু অনির্ভরযোগ্য বইপত্রের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধারণাটা বেশ প্রচলিত যে, ইসলামের ফরয সর্বমোট ১৩০টি। যথা ত্রিশ রোযা ৩০ ফরয, ত্রিশ রোযার ত্রিশ নিয়ত ৩০ ফরয; চার মাযহাব ৪ ফরয, চার বংশ (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম) ৪ ফরয ইত্যাদি।

এই ধারণা ঠিক নয়। ইসলামে 'ফরযের' সংখ্যা ১৩০ থেকে অনেক বেশি। তারপর যে বিষয়গুলোকে এখানে ফরয বলা হয়েছে সেগুলোর সবকটিকে ফরয বলাও ঠিক নয়। যেমন চার মাযহাবকে চার ফরয বলা হয়েছে। এখানে সঠিক কথা হল, ফিকহের প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাবই হক এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের পথ ও মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দায়িত্ব হল কর্মক্ষেত্রে কোন একটি ফিকহী মাযহাব অনুসারে কুরআন হাদীস মোতাবেক আমল করা। তাই কোন ফিকহী মাযহাবের তাকলীদতো জরুরি; কিন্তু এজন্য 'চার মাযহাব' কে চার 'ফরয' সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

অনুরূপ ঈমানের বিশুদ্ধতার জন্য খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানা এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনা ফরয। কিন্তু 'হাশেম' পর্যন্ত তাঁর বংশলতিকা জানা বা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা ফরয গণ্য করা ভুল। তবে মনে রাখতে হবে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক বড় সওয়াবের কাজ।

ভুল মাসআলা

হাঁটুর কাপড় সরে গেলে ওযু ভেঙ্গে যাবে!

এই ভুল মাসআলাটিও কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে।

এটা ঠিক যে, হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং তা ঢেকে রাখা জরুরি। এদিকেও খেয়াল রাখা উচিত যে, পা ধোয়ার সময় বা অন্য কোন সময় যেন হাঁটু থেকে কাপড় সরে না যায়। কিন্তু কোন সময় কাপড় সরে গেলে ওযু ভেঙ্গে যাবে একথা ঠিক নয়। কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব যেমন বেহেশতী জেওর ইত্যাদি থেকে ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ ভালভাবে মুখস্থ করে নেওয়া উচিত।

ভুল প্রচলন

দস্তরখানা 'লাল রঙ' হওয়া কি সুন্নত?

কোন কোন মানুষ দস্তরখানা লাল রঙের হওয়াকে সুন্নত মনে করেন এবং এটা খুব সওয়াবের কাজ মনে করেন। এই ধারণা অমূলক। এর কোন ভিত্তি নেই। এ প্রসঙ্গে কোন কোন মানুষের মুখে যে রেওয়ায়াত শোনা যায় তাও একদম ভিত্তিহীন।

সুন্নত

পড়ে যাওয়া খাবার উঠিয়ে খাওয়া!

অনেক জায়গায় দস্তরখানের খুব গুরুত্ব আছে। এটি প্রশংসনীয়; কিন্তু এরচেয়েও বড় একটি সুন্নতের ব্যাপারে অবহেলা করা হয়। সুন্নতটি হল, কোন লোকমা, তরকারি বা খাদ্যের অংশবিশেষ হাত থেকে পড়ে গেলে উঠিয়ে খাওয়া। ধুলোবালি লেগে গেলে তা পরিষ্কার করে খাওয়া। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। কিন্তু এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না। পড়ে যাওয়া খাবারের অংশ বিশেষকেও হাড্ডি, মাছের কাটা ইত্যাদির সাথে

ফেলে দেওয়া হয়। এটা গোনাহর কাজ। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

হাদীস নয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে 'হস্তলিপি' শেখাতে বারণ করেছেন!

কোন কোন মানুষের মুখে শোনা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে 'হস্তলিপি' শেখাতে বারণ করেছেন। এই রেওয়ায়াত সহীহ নয় এবং এটা হাদীস নয়। মহিলাদেরকে হস্তলিপি শেখানো নাজায়েয নয়; বরং তাদেরকে কুরআন ও ঈমান শেখানো, দীনের তালীম দেওয়া ফরয। দ্বীনদারি ও আল্লাহ্ভীতি থাকলে লেখালেখির যোগ্যতাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করবে না; নতুবা পুরুষরাও তো তাদের যোগ্যতা পাপের কাজে ব্যবহার করতে পারে। –আললাআলিল মাসনূআ ২/৯২-৯৩; লিসানুল মীযান ২/৪৮০; ইমদাদুল আহকাম ১/২১৪-২১৫

এপ্রিল-২০০৬

ভুল রীতি

সালাম বা মুসাফাহার পর বুকে হাত রাখা!

কোন কোন মানুষকে সালাম বা মুসাফাহার পর নিজ বুকে হাত রাখতে দেখা যায়। এ কাজটিকে যদি সালাম-মুসাফাহার সুন্নত নিয়মের অংশ মনে করা হয় তাহলে এটি বিদআত আর এমনি করা হলে এটা একটা অনর্থক কাজ। মহব্বতের প্রকাশ তো সালাম-মুসাফাহার মাধ্যমেই হয়ে গেল। বাড়তি কিছুর তো প্রয়োজন নেই। মোটকথা, এটা সংশোধনযোগ্য।

ভুল ধারণা

রাতের বেলা ঝাড়ু দেওয়া বা আয়না দেখা কি অশুভ?

কোন কোন মহিলার মনে এই বিশ্বাস রয়েছে যে, রাতের বেলা ঝাড়ু দেওয়া কিংবা আয়না দেখা অশুভ বা অকল্যাণকর। এই ধারণা ভিত্তিহীন। যখনই পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন দেখা দিবে-রাতে হোক বা দিনে–ঘর-দোর ঝাড়ু দেওয়া যাবে; তেমনি আয়না দেখার বিষয়টিও।

ভুল নিয়ম

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কাতার সোজা করা!

জামাআতের কাতার সোজা করার সময় কেউ কেউ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কাতার সোজা করে। এ নিয়মটি ভুল। কাতার সোজা করার নিয়ম হল কাঁধ, টাখনু বা পায়ের গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়ানো। এছাড়া কাতার সোজা হয় না।

অনেকে মনে করে নামাযে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়ানো মারাত্মক অপরাধ। আমাকে একবার এক নামাযী বলেছিলেন, 'জাহাজের নোঙ্গরের মত পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্থির রাখতে হবে।' আসলে এটি একটি বাড়াবাড়ি। নামাযে ধীরস্থির থাকা শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথেই সম্পৃক্ত। বৃদ্ধাঙ্গুলির কোন বিশেষত্ব এখানে নেই। বিনা প্রয়োজনে নামাযের মধ্যে শরীরের কোন অঙ্গই নাড়ানো ঠিক নয়।

একটি প্রচলিত মারাত্মক গোনাহ

মামি, চাচি এবং সৎ-শাশুড়ীর সাথে পর্দা না করা!

কোন কোন মানুষ মামি, চাচি এবং সৎ-শাশুড়ীর সাথে পর্দা করাকে জরুরি মনে করে না। তারা বলে, এদের সাথে পর্দা নেই। এটা সম্পূর্ণ ভুল। এরা গাইরে মাহরাম এবং এদের সাথে পর্দা করা জরুরি।

তেমনি খালু, ভগ্নিপতি, দেবর, স্বামীর বড় ভাই, চাচাশ্বশুর, মামাশ্বশুর, খালুশ্বশুর সবাই গাইরে মাহরাম। এদের সবার সাথেই পর্দা করা জরুরি। এটা মনে করা যে এদের সাথে পর্দা নেই, বুঝে-শুনে বললে কাফির হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে আর যদি সঠিক মাসআলা জানা থাকে এবং তা স্বীকারও করে তবে উপরোক্ত ব্যক্তিদের সাথে পর্দার ব্যাপারে শিথিলতা করা হয় তবে তা অনেক বড় গোনাহ।

হাদীস নয়

উম্মতের হিসাব-নিকাশ আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন...!

কিছু লোককে বলতে শোনা যায় যে, "*শবে মিরাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার কাছে দরখাস্ত করেছিলেন, আমার উম্মতের হিসাব-নিকাশ আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন, যাতে তারা অন্য উম্মতদের সামনে লজ্জিত না হয়। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, জি না,*

এরা আমার বিশিষ্ট বান্দা। তাদের ভুলত্রুটি আপনাকেও জানাতে চাই না। এবার নবীজী আরজ করেন, আমার গোনাহগার উম্মতের কী হবে? আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, যখন আমি রহীম-মেহেরবান এবং আপনিই সুপারিশকারী তাহলে আর ভয়ের কী আছে?"

এ ধরনের কথাবার্তা কোন কোন মানুষ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করে। মনে রাখতে হবে, এগুলো হাদীস তো নয়ই; ঐতিহাসিক বর্ণনাও নয়। এগুলো হল মনগড়া কাহিনী, মিথ্যুকরা এগুলো তৈরি করে হাদীস নামে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে। -যাইলুল লাআলিল মাসনূআ ফিল আহাদীসিল মাওযূআ, জালালুদ্দীন সুয়ূতী ১৭৯

সহীহ হাদীস

সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "হে কুরাইশ, তোমরা নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা কর। আল্লাহ্ তাআলার কাছে আমি তোমাদের কোন কাজে আসব না। হে বনু আব্দে মানাফ, (শুনে রেখো) আল্লাহ্র কাছে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে সাফিয়্যা, (নবীজীর ফুফু) আল্লাহ্ তাআলার নিকট আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, সম্পদ চাইলে বল, কিন্তু আল্লাহ্র ব্যাপারে আমি তোমার কোন উপকারে আসব না।" -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭৭১, সহীহ মুসলিম ২/১১৪

অন্য হাদীসে এসেছে, "হে ফাতেমা, তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আমি কোন লাভ-ক্ষতির মালিক নই।" -সহীহ মুসলিম ২/১১৪

সারকথা হল নিজের ঈমান আমল ঠিক করা, আখলাক দুরস্ত করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা, ফরয-ওয়াজিবসমূহের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য। শুধু এ কথার উপর বসে থাকার কোন সুযোগ নেই যে, আমরা তো খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। কারণ শরীয়তের ব্যাপারে এ রকম বেপরোয়া হলে অনেক সময় মৃত্যুকালে ঈমান নসীব হয় না। আল্লাহ্ না করুন যদি এমন হয়ে যায় তবে তো নবীজীর সুপারিশও পাওয়া যাবে না। এছাড়া প্রত্যেক মুমিন প্রথম সুযোগেই নবীজীর সুপারিশে জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং অনেকে দোযখের শাস্তি ভোগ করার পর তাঁর সুপারিশে জান্নাতে যাবে। আল্লাহ্ না করুন যদি আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই।

তাই আমাদেরকে প্রথম সুযোগেই সুপারিশ পাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার জন্য ঈমান দুরস্ত করার এবং বেশি বেশি আমল করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তবে নাজাত আমল দ্বারা হবে না; নাজাত পাওয়া যাবে আল্লাহ্‌র রহমত দ্বারা। আর এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, নিজের আমল সংশোধনের ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়া বান্দাকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত করে।

মে-জুন-২০০৬

ভুল ধারণা

এক সাথে মুনাজাত শুরু এবং শেষ করা।

সম্মিলিত দুআ ও মুনাজাতের ব্যাপারে কিছু লোকের মধ্যে এই ভুল ধারণাটি প্রচলিত আছে যে, তারা একই সাথে মুনাজাত শুরু করা এবং শেষ করাকে জরুরি বা সুন্নত মনে করে। এমনকি এক জায়গায় এমনও ঘটেছে যে, এক ব্যক্তি তাসবীহ-তাহলীল পড়ছিল আর ওদিকে মুনাজাত শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু ওই ব্যক্তি তাসবীহ-তাহলীল পুরো করার মধ্যে মগ্ন ছিল। পাশের 'মাসবূক মুসল্লী' তার ছুটে যাওয়া নামায আদায় করছিল। সে নামাযে থেকেই ওই ব্যক্তিকে মুনাজাত শুরু হওয়া সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ইঙ্গিত করছিল! তবে বাঁচা গেছে যে, সে নিজে নামায ছেড়ে মুনাজাতে শরীক হয় নি এবং এ কথা বলে নি যে, আগে মুনাজাত করে নিই, অবশিষ্ট নামায পরে পড়ে নিব।

এমন অনেক সময়ই হয় যে, কারো মুনাজাতে মন নিমগ্ন হয়েছে, সম্মিলিত মুনাজাত শেষ হওয়ার পরও সে নিজের মুনাজাতে রত রয়েছে। আর আশ-পাশের লোকেরা পরস্পরে ইঙ্গিত করে হাসছে। তারা ভাবছে যে, এই বেচারা মুনাজাত শেষ হওয়ার কথা জানতেই পারে নি।

সম্মিলিত মুনাজাত অবশ্যই একটি ভাল আমল। (যদি তাতে কোন গলত রসম-রেওয়াজ বা গর্হিত কাজের মিশ্রণ না ঘটে।) হাদীস শরীফে এসেছে–

لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُوا بَعْضُهُمْ وَ يُؤَمِّنُ الْبَعْضُ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللهُ

"যখন কিছু লোক সমবেত হয় এবং তাদের কেউ দুআ করে আর অন্যরা আমীন বলে তখন আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাদের দুআ কবুল করেন।"
–মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/৪১৭

বোঝা গেল, সম্মিলিত দুআ আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু এটা কোথাও নেই যে, সম্মিলিত দুআয় সবার শামিল

হওয়া জরুরি। আর এটাও কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় যে, যে তাতে শামিল হবে তাকে অন্যদের সাথে একই সঙ্গে শুরু করতে হবে এবং একই সাথে শেষও করতে হবে। বরং সে যে কোন তাসবীহ-তাহলীল বা অন্য কোন আমলে মগ্ন থাকতে পারে। দেরিতে শামিল হতে পারে আবার মুনাজাতে নিমগ্ন হয়ে গেলে বা আল্লাহ্ তাআলার কাছে কামনার আরো কিছু থেকে থাকলে সে দেরিতে শেষ করতে পারে। এতে কোন ধরনের কোন অসুবিধা নেই এবং এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই যে, এ ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে বা তাকে মুনাজাত শেষ করার জন্য ইঙ্গিত করতে হবে।

এই ভুল ধারণা দূর করার জন্যে আমাদের কোন এক বুযুর্গ বলে থাকেন, 'দুআয় ইমামতি নেই' অর্থাৎ দুআয় অংশ-গ্রহণকারীদের মুক্তাদীদের মত এক ব্যক্তিকে অনুসরণে বাধ্য থাকতে হয় না।

ভুল প্রথা

অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়া!

হাদীস শরীফের শিক্ষা হল অধিক পরিমাণে সালাম আদান-প্রদান করা। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের মাঝে পরিচয় থাকুক বা না থাকুক পরস্পরে সালাম দাও।' কিন্তু আজকাল নিয়ম উল্টো হয়ে গেছে। যার সাথে পরিচয় নেই তাকে সালাম দেওয়া হয় না। কখনো এমন হয় যে, সালাম অপরিচিত ব্যক্তি দিলে তার উত্তরও দেওয়া হয় না। আর যার সাথে পরিচয় আছে সে যে-ই হোক তাকে আগে আগে সালাম দেওয়া হয়। এরূপ ভেদাভেদ না করে ব্যাপক হারে সালামের প্রচলন করা উচিত।

সালামে 'ভিআইপি নিয়ম' চালু না হওয়া উচিত!

আগে আগে সালাম দেওয়া তো দূরের কথা কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেওয়ার মাঝেও সেই 'ভিআইপি নিয়ম' অবলম্বন করা হয় এবং কখনো শুধু মাথা হেলানো পর্যন্তই শেষ; অথচ প্রত্যেক মুসলমানের সালামের জবাব দিতে হয় এবং স্পষ্ট আওয়াজে জবাব দিতে হয়। কমপক্ষে এতটুকু তো অবশ্যই বলা উচিত–

'ওয়া আলাইকুমুস সালাম, ওয়ারাহমাতুল্লাহ।'

ভুল পদ্ধতি

সালাম দেওয়ার সময় মাথা ও সিনা ঝুঁকিয়ে দেয়া।

কোন কোন লোককে দেখা যায় তারা বড় কোন ব্যক্তিকে সালাম দেওয়ার সময় মাথা নয় বরং সিনাও ঝুঁকিয়ে দেয়। এটা ভুল নিয়ম। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তাই এ থেকে বিরত থাকা জরুরি।

হাদীস নয়

মদীনা মক্কা থেকে উত্তম।

কতক লোককে বলতে শোনা যায় এবং কেউ কেউ একে হাদীসও মনে করে থাকে যে, মদীনা মক্কা থেকে উত্তম। অথচ এটা কোন হাদীস নয় এবং কোন দলীল দ্বারাও এটা প্রমাণিত নয়; বরং দলীল-প্রমাণ দ্বারা মক্কার শ্রেষ্ঠত্বই সু-প্রমাণিত।

ليس هو بصحيح و قد صح في مكة حلافه

–মীযানুল ইতিদাল ৩/৫৯৬; লিসানুল মীযান ৭/২৮৬

জুলাই-২০০৬

ছাতায় অমঙ্গলের বিশ্বাস একটি ভিত্তিহীন কল্পনা।

১ মে' ০৬ ঈ. তারিখে দৈনিক প্রথম আলো নিম্নের খবরটি ছেপেছে : "ছাতায় অমঙ্গল! বৈশাখ মাসে ছাতা নিয়ে বিলে গেলে ধানের অমঙ্গল হয়। কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টিতে পাকা ধান নষ্ট হয়ে যায়–পুর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া এ বিশ্বাস এখনো লালন করছে টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। উপজেলার মাকড়াই গ্রামের কৃষক জহুর আলী (৪৫) বলেছেন, বাবা চাচাদের কাছে শুনেছি, বিলে ছাতা ব্যবহার করা নিষেধ। ছাতা নিলে ধান নষ্ট হয়ে যায়। আমরা সে নিষেধাজ্ঞা পালন করছি। কেউ যাতে ছাতা নিয়ে না যায় সেজন্য বিলে পাহারা বসিয়েছি।"-ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি।"

ইসলামে অমঙ্গলের আকীদা-বিশ্বাসই বাতিল। অমঙ্গল কেবল কুফর, শিরক, বিদআত ও বদআমলসমূহের মধ্যেই নিহিত; কোন বস্তু, কোন সময়, কোন রঙ বা কোন সৃষ্টির ব্যাপারে অমঙ্গলের বিশ্বাস রাখা সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা; যা ধীরে ধীরে শিরকী কর্ম ও বিশ্বাসের পথ সুগম করে। উল্লিখিত মিথ্যা খেয়াল এবং অনুরূপ অন্যান্য ভিত্তিহীন ধারণার সংশোধন

করা যেমন ঈমান-আমলের হেফাজতের জন্যে জরুরি তেমনি দুনিয়ার নিয়ম-নেজাম বহাল রাখার জন্যেও জরুরি। খেয়াল ও কল্পনার পেছনে পড়া বড়ই খারাপ রোগ, যা মানুষকে দ্বীন-দুনিয়ার প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে এবং বহু অকল্যাণে নিমগ্ন করে।

একটি শিরকী আমল

ভারী বস্তু উঠাতে ইয়া আলী বলা!

কোন কোন দিনমজুর ও শ্রমিককে দেখা যায়, যখন তারা কোন ভারী বস্তু উপরে উঠায় বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয় তখন তারা বলে ইয়া আলী; ও আলী বা ইয়া আলী আলী! এর কারণ হয়ত এই হবে যে, হযরত আলী রাযি. যেহেতু বড় বাহাদুর এবং অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন তাই এরা মনে করে তাঁকে ডাকলে বা তাঁর নাম উচ্চারণ করলে তাদের মাঝে শক্তি সৃষ্টি হবে বা সেই বস্তু উঠানোতে সাহায্য পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, এটি একটি শিরকী খেয়াল। লাভ-ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। ফরিয়াদ পূরণকারীও শুধু তিনিই। কোন মৃতের কাছে, কোন রূহ বা ব্যক্তির কাছে সাহায্য কামনা করা শিরক। জীবিত ও বর্তমান ব্যক্তিদের কাছে কেবল সেসব বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করা যায় যেগুলো উপায়-উপকরণের অধীন। মাধ্যম ও উপায়-উপকরণের উর্ধ্বের কোন বিষয়ে কারোও থেকে সাহায্য কামনা করা শিরক। আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কারো নামের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করা যে, তার নাম নেওয়া হলে বা তাকে ডাকা হলে সমস্যার সমাধান হবে-এটা শুধুই শিরকী ধারণা। সুতরাং উল্লিখিত অবস্থায় হযরত আলী রাযি.-কে ডাকার পরিবর্তে তাঁর সৃষ্টিকর্তা এবং আমাদের সবার সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনকে ডাকা উচিত এবং তাঁর নামই উচ্চারণ করা উচিত। তিনিই সকল মুশকিল আসানকারী এবং সকল মুসীবত থেকে নাজাত দানকারী।

আরেকটি শিরকী আমল

ইয়া গাউসুল আজম!

একবার জুমার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। একটি সিএনজি পেয়ে তাতে চড়লাম। হঠাৎ দেখি, ড্রাইভার বলছে, ইয়া গাউসুল আজম! আমি বললাম, লাভ-ক্ষতি, হায়াত-মউতের মালিক একমাত্র রাব্বুল আলামীন। তাঁর নামেই শুরু

করা উচিত। এটাই তাওহীদ ও একত্ববাদের দাবি এবং শরীয়ত ও সুন্নতের শিক্ষা। কুরআন কারীম স্থলযানে আরোহন করে-

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

পড়ার শিক্ষা দিয়েছে। এই দুআর অর্থে সামান্য চিন্তা করে দেখুন। এতে বলা হয়েছে—'পবিত্র তিনি যিনি এই বাহনকে আমাদের অধীন করেছেন। তাকে অধীন করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আর অবশ্যই আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছেই ফিরে যাব।'

আর জলযানে আরোহন করার জন্যে কুরাআনেই দুআ শিখানো হয়েছে—

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَ مُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"আল্লাহ্‌র নামেই এর চলা ও স্থির হওয়া। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, মেহেরবান।" এই দুআসমূহে তাওহীদের কত স্বচ্ছ শিক্ষা রয়েছে। এরপরও কি আল্লাহ্ তাআলার নাম ব্যতীত অন্য কারো নামে ড্রাইভ শুরু হতে পারে? শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. যাঁকে সাধারণ মানুষ 'গাউসুল আজম' নামে ডাকে (অথচ এ নামটি সংশোধনযোগ্য। কেননা শায়খ রহ. গাউস তথা ফরিয়াদপূরণকারী নন; বরং তিনি নিজেই আল্লাহ্ তাআলার দরবারে ফরিয়াদকারী ছিলেন।) তিনি বড় পাক্কা তাওহীদবাদী ছিলেন। তিনি লোকদেরকে শরীয়ত ও সুন্নতের তালীমই দিতেন। তাওহীদ ও সুন্নত প্রতিষ্ঠা করা এবং শিরক-বিদআতের মুলোৎপাটনের জিহাদই ছিল তাঁর মিশন। তিনি বলতেন- "আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করা অপরিহার্য। আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করো না এবং তাঁকে ছাড়া কারো কাছে আশা পোষণ করো না। সকল প্রয়োজন তাঁরই নিকট পেশ কর এবং তাঁরই কাছে প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপর ভরসা রেখো না। তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি সকল ত্রুটিমুক্ত; তাঁরই উপর আস্থা রেখো। খবরদার, তাওহীদ! তাওহীদ!! তাওহীদ। (অর্থাৎ একমাত্র সে একক সত্তাকে মেনে চল। একক সত্তার উপর ভরসা কর এবং সে একক সত্তার সাথেই সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর।) –মালফূযাত; ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩/৫

সুতরাং সবার খালেক ও মালেকের নামেই ড্রাইভ এবং অন্য সকল কাজ শুরু করা উচিত।

হাদীস নয়

সমস্যায় পড়লে কবরবাসীর সাহায্য প্রার্থনা কর।

কতক বুযুর্গ থেকে একটি উক্তি বর্ণিত আছে; যাতে বলা হয়েছে

إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا بِأَصْحَابِ الْقُبُوْرِ

উক্তিটির মর্ম হল–দ্বীনী ব্যাপারে মত-পার্থক্যের কারণে যদি জটিলতা সৃষ্টি হয় যে, কী করা হবে, কী করা হবে না তাহলে পূববর্তী বুযুর্গ যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন (সাহাবী, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন) তাঁদের কর্মপদ্ধতি জেনে নাও এবং সে মোতাবেক আমল কর। বিষয়টি অনুরূপ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. যেমন বলেছিলেন –

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ

কিন্তু কতক বিদআতীকে দেখা যায় এই উক্তিকে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করতে। এরপর তারা এটি দ্বারা কবর ও মাজারবাসীদের কাছে সাহায্য কামনার বৈধতার পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করে। নাউযুবিল্লাহ। মনে রাখতে হবে, এই উক্তিটি হাদীস নয়। কারো উক্তি মাত্র, যার সঠিক মর্মও আগেই বলা হয়েছে।

এই নীতিটি মনে রাখা উচিত যে, শরীয়ত কবরবাসীদের কাছে নয়, বরং কবরবাসীদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে মাগফিরাত ও রহমতের দুআ করার নির্দেশ দিয়েছে।

–ফাতাওয়া আযীযিয়া, শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. ১/১২১, ২/১০৫ (১৭৯ উর্দূ তরজমা)

আগষ্ট-২০০৬

উচ্চারণের একটি ভুল

মুনকার-নাকীর

কবরে মৃত ব্যক্তিকে সওয়াল করার জন্যে যে দুই ফেরেশতা আসেন তাদের একজনের উপাধি 'মুনকার' আর অপরজনের উপাধি 'নাকীর'। উভয় শব্দের একই অর্থ তথা অপরিচিত। আকার-আকৃতিতে উভয় ফেরেশতা এমন অপরিচিত হবেন যে, তাদের দেখলেই মানুষ ভয় পেয়ে যাবে। তাই তাঁদের নামও এমন নির্বাচন করা হয়েছে। কিন্তু অনেককে শোনা যায় তারা শব্দ দুটোর উচ্চারণ করেন 'মুনকির' ও নিকীর'–প্রথম শব্দে 'কাফ'-এ

‘যের’ দিয়ে এবং দ্বিতীয় শব্দে ‘নূন-এও ‘যের’ দিয়ে অথচ এই উচ্চারণ ভুল। শুদ্ধ হচ্ছে উভয় স্থানে ‘যবর’ হবে–মুনকার ও নাকীর।

ভুল ধারণা

কিরামান-কাতিবীন

প্রত্যেকের সাথে যে ফেরেশতা নেগাহবান হিসেবে নিয়োজিত এবং আমলনামা লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব যাঁদের উপর অর্পিত তাঁদের ব্যাপারে কারো কারো মাঝে এমন ধারণা রয়েছে যে, নেক আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের নাম ‘কিরামান’ আর বদ আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের নাম ‘কাতিবীন’। এমন ধারণা সঠিক নয়। কারণ ‘কিরামান’ শব্দের অর্থ সম্মানিতগণ এবং ‘কাতিবীন’ অর্থ লেখকগণ। তাই উভয় শব্দ নেক আমল ও বদ আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের বিশেষণ হিসেবে প্রযোজ্য।
কুরআনে কারীমেও উভয় প্রকার নেগাহবান ফেরেশতার বিশেষণ হিসেবে ‘কিরামান কাতিবীন’ শব্দ বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ، كِرَامًا كَاتِبِيْنَ، يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ

“অবশ্যই তোমাদের উপর নেগাহবান নিযুক্ত আছে। সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। তারা জানে যা তোমরা কর।”-সূরা ইনফিতার ১১

ভুল পন্থা

নামাযে যেখান থেকে ইচ্ছা কাতার করা!

নামাযে কাতার করার নিয়ম হচ্ছে ইমামের পেছন থেকে দাঁড়ান শুরু করবে। ধীরে ধীরে ডানে বামে কাতার বাড়তে থাকবে। কিন্তু বহু মসজিদে দেখা যায় এক দুই রাকাত হয়ে যাওয়ার পর যারা আসেন তারা কাতারের ডানদিকে দাঁড়ান। এরপর মুসল্লী আসতে আসতে কখনো ইমামের পেছন পর্যন্ত কাতার পূর্ণ হয়; কখনো অপূর্ণ থেকে যায়। এ পদ্ধতি ঠিক নয়। সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে কাতার শুরু হবে ইমামের পেছন থেকে। তারপর উভয় দিকে সমানভাবে কাতার বাড়তে থাকবে।

আরও একটি ভুল

সামনের কাতার খালি রেখে দাঁড়ানো!

কেউ কেউ ইমামকে রুকুতে পাওয়ার জন্যে অলসতা করে আগের কাতারে ডানে-বামে জায়গা থাকা সত্ত্বেও নতুন কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। এরপর

তাদের দেখা-দেখি অন্যরাও ওই কাতারে দাঁড়ায়। ফলে আগের কাতারে জায়গা খালি থেকে যায়। মনে রাখতে হবে এমন করা ঠিক নয়।
আগের কাতারে জায়গা খালি রেখে পেছনের কাতারে দাঁড়ানোর ব্যাপারে হাদীস শরীফে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং প্রথমে আগের কাতার পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টির প্রতি খেয়াল করা অতি জরুরি।

একটি বাহানা বা একটি ভুল ধারণা
নামাযে মিলেমিলে দাঁড়ানো!

অতি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা। একজন বুযুর্গ তাঁর সাথের মুসল্লীকে মিলেমিশে দাঁড়ানোর উৎসাহ দেন এবং নিজে পাশের মুসল্লীর সাথে মিশে দাঁড়ান। মসজিদটি ছিল মোজাইক করা এবং কাঁচের টুকরো দ্বারা রেখা খচিত জায়নামায আকৃতির বক্সে সুসজ্জিত। পাশের মুসল্লী বলে উঠল, আপনি এদিকে আসছেন কেন? আপনি আপনার বক্সের ভেতরে থাকুন। এটা যদি সে মিলেমিশে দাঁড়ানো সুন্নত একথা না জানার কারণে অথবা কোন ওজর ছাড়াই শুধু স্বভাবগত ভাল না লাগার কারণে (যা শরীয়তে ধর্তব্য নয়) মিলেমিশে দাঁড়ানো থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বলে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে মন্তব্য করা অনর্থক। আর বাস্তবে যদি সে এই মনে করে থাকে যে, ফ্লোর, কাপের্ট বা চাটাইয়ে যে বক্স বা পৃথক পৃথক জায়নামাযের আকৃতি করা থাকে তা মাসআলার দৃষ্টিতেও এক একজন মুসল্লীর জন্যে নির্ধারিত, তবে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কাতারে দাঁড়ানোর সুন্নত তরীকা হচ্ছে পরস্পরে মিলেমিলে দাঁড়ানো। কাতারের মাঝে জায়গা খালি রাখা সুন্নত পরিপন্থী কাজ এবং খুবই গর্হিত আচরণ।

হাদীস নয়

اَلسَّخِيُّ حَبِيْبُ اللهِ وَ لَوْ كَانَ كَافِرًا

দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয় যদিও সে কাফির হয়!

কেউ কেউ এই উক্তিকে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করে থাকে অথচ এটি হাদীস নয়; অতি উৎসাহী কোন ব্যক্তির উক্তি। খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (৬৩৬হি.-৭২৫হি.) রহ.-কে এই উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এটি হাদীস কি না। তিনি বলেছিলেন, এটি হাদীস নয়; কারো উক্তি।
–ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ ১০৩; তারীখে দাওয়াত ও আযীমত ৩/১২৭-১২৮

আর উক্তিটিও সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলার নিকট ওই দানই গ্রহণযোগ্য যা ঈমান ও ইখলাসের সাথে হয়ে থাকে। ঈমান ও ইখলাসশূন্য লোকদের দান-খয়রাত ও নেক আমলের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন– وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا

"আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব। এরপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দিব।"– সূরা ফুরকান ২৩

কারো কারো মুখে উক্তিটি এমনও শোনা যায়–

اَلسَّخِيُّ حَبِيْبُ اللهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا

'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয় যদিও সে পাপী হোক।' এটিও হাদীস নয় আর কথাটাও সঠিক নয়। কেননা পাপ আর আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়া একত্র হতে পারে না।

সেপ্টেম্বর-২০০৬

ভুল বিশ্বাস

মৃত বুযুর্গদের রূহ দুনিয়াতে ঘুরে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন মিটায়!

কিছু মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, পরলোকগত বুযুর্গদের রূহ দুনিয়ায় ঘুরতে থাকে এবং আপন লোকদের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে (নাউযুবিল্লাহ)। কেউ কেউ এমনও বলে থাকে যে, তাঁদের রূহ সর্বত্রই বিরাজমান (নাউযুবিল্লাহ)। তাই ওদের মতে তাঁদেরকে ডাকা এবং তাঁদের কাছে সাহায্য কামনা করা জায়েয।

কালেমা পাঠকারী প্রতিটি ব্যক্তিই যার তাওহীদে বিশ্বাস আছে এবং তাওহীদের অর্থ বুঝেন, তিনি জানেন যে, এসব ধারণা সম্পূর্ণই বাতিল ও ভিত্তিহীন এবং ওসব আমলও সুস্পষ্ট শিরক।

ফকীহগণ স্পষ্ট বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বলবে মাশায়েখদের রূহ (আত্মা) হাজির এবং তারা মানুষের অবস্থাদি জানতে পারে, সে কাফির হয়ে যাবে।'

– আলবাহরুর রায়েক ৫/১২৪

ভুল মাসআলা

মাসবুক মুসল্লীর ইমামের সাথে স্থিরতার স্থানে শরিক হওয়া।

কিছু লোকের দেমাগে এ ভুল মাসআলা স্থান করে আছে যে, মাসবুক মুসল্লীর ইমামের সাথে কোন একটি স্থিরতার স্থানে শরিক হওয়া উচিত

এবং এমনভাবে শরিক হওয়া উচিত যেন কোন আমল অতিরিক্ত হতে না পারে। যেমন সিজদায় শরিক না হওয়া। কেননা এতে সিজদার সংখ্যা বেড়ে যাবে।

এমন ধারণা ঠিক নয়। হাদীস শরীফে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হল, ইমামকে যেখানেই পাবে সেখানেই ইমামের সঙ্গে নামাযে শরিক হয়ে যাবে। এটিই মাসবুকের নামাযের নিয়ম। একাকী বা ইমামের পেছনে পূর্ণ নামায আদায়কারী ও ইমামের নামাযের সঙ্গে মাসবুকের নামাযের ধরনে পার্থক্য রয়েছে। কওম– উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, সিজদা, জলসা– দুই সিজদার মাঝে বসা ও শেষ বৈঠক ইত্যাদি সাধারণ অবস্থার চেয়ে মাসবুকের নামাযে অতিরিক্ত হতে পারে। কিন্তু তার জন্য এটা অতিরিক্ত নয়। সাধারণ অবস্থা থেকে মাসবুকের নামাযের বিন্যাস ও নিয়ম পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু বাহ্যিক এ অবিন্যাসটিই তার বেলায় নিয়ম ও ব্যতিক্রমের নির্দেশ প্রদান করেছে। সুতরাং মাসবুকের নামায সেভাবেই পড়া উচিত যেভাবে শরীয়ত শিখিয়েছে। এতে হ্রাস-বৃদ্ধির প্রশ্ন উঠানোই ভুল।

ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত এবং ভুল উদ্ধৃতি

অদ্যবধি আমার ধারণা ছিল যে, 'মকসুদুল মুমিনীন'এর উৎসসমূহ অনির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে বহু ভিত্তিহীন ও জাল রেওয়ায়াত তাতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু গতকাল যখন শবে বরাতের আলোচনা পড়তে লাগলাম তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। কতগুলো একেবারে ভিত্তিহীন ও বাতিল রেওয়ায়াত লিখে কোনটাতে মেশকাত, কোনটাতে তিরমিযী, কোনটাতে বুখারীর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে অথচ এসব কিতাবে ওসব রেওয়ায়াতের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই এবং এগুলো ভিত্তিহীন ও বাতিল।

যেহেতু বইটি সর্বসাধারণের মহলে বহুল প্রচলিত; তাই সাবধান করার জন্য ওসব রেওয়ায়েত বইটি থেকে উল্লেখ করা হচ্ছে।

শবে বরাতের বিশেষ পদ্ধতির নামায সম্পর্কে মকসুদুল মুমিনীন-এর ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতসমূহ

আমার সামনে মকসুদুল মুমিনীন-এর যে কপিটি আছে তাতে লেখা আছে যে, (৪৬তম সংস্করণ, ১৯৯৬ সনের ছাপা এবং এর রেজিস্ট্রি নং ৬৫৯। এ কপিটির ২৪১-২৪২ পৃষ্ঠায় নিচের রেওয়ায়াত ৩টি রয়েছে;)

"হাদীস শরীফে আছে, মাতৃগর্ভ হইতে লোক যেরূপ নিষ্পাপ হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, উল্লেখিত চার রাকাত নামায পড়িলেও সেইরূপ নিষ্পাপ হইয়া যাইবে। – মেশকাত"

রেওয়ায়াত ও উদ্ধৃতি উভয়টিই মিথ্যা। এরপর লেখা আছে–

"তারপর আবার দুই দুই রাকাত করিয়া ৪ রাকাত নামায উপরোল্লিখিত নিয়ত করিয়া পড়িবে। নিয়ত, ছুবাহানাকা, আউযুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ ও সূরা ফাতিহার পর প্রত্যেক রাকাতেই সূরা এখলাছ ৫০ বার করিয়া পাঠ করিবে ও এই নিয়তেই নামায শেষ করিবে। সালাম ফিরাইবার পর বসিয়া ১০০ বার দরূদ পাঠ করিয়া মোনাজাত করিবে। হাদীস শরীফে আছে, যাহারা এই নামায পাঠ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের পঞ্চাশ বৎসরের গোনাহ মার্জনা করিয়া দিবেন।-তিরমিযী"

রেওয়ায়াত ও উদ্ধৃতি উভয়টিই মিথ্যা। তিরমিযী শরীফে এরূপ কোন হাদীস নেই এবং কোন সহীহ হাদীসেও এই নিয়ম ও ফযীলতের কথা নেই।

এরপর লেখা আছে– "আরো হাদীসে আছে, যাহারা উক্ত রাত্রে বা দিনে ১০০ হইতে ৩০০ মরতবা দরূদ শরীফ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পাঠ করিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর দোযখ হারাম করিবেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সুপারিশ করিয়া তাহাদিগকে বেহেশতে লইবেন। –সহীহ্ বোখারী"

রেওয়ায়াত ও উদ্ধৃতি উভয়ই মিথ্যা। আগেই বলা হয়েছে যে, তিনটি রেওয়ায়াতেই বাতিল ও ভিত্তিহীন এগুলোতে মেশকাত, তিরমিযী ও বুখারীর উদ্ধৃতি দেওয়া সম্পূর্ণই মিথ্যা। এসব কিতাবে ওসব রেওয়ায়াতের নাম-নিশানাও নেই আর এমন জাল রেওয়ায়াত এসব কিতাবে থাকতেও পারে না।

হাদীস বিশেষজ্ঞগণ স্পষ্ট বলেছেন যে, শবে বরাতের ফযীলত এবং তাতে নফল ইবাদাতের গুরুত্ব আপন জায়গায় স্বীকৃত, কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক রাকাত এবং বিশেষ সূরা নির্দিষ্টকরণের সাথে শবে বরাতের নামায নামে যে নামায এবং এর বিশেষ ফযীলতের কথা জনসাধারণের মাঝে বা কতক সাধারণ বইপত্রে প্রসিদ্ধ আছে সেগুলো জাল ও ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারের হাদীস জাল ও ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে হাদীসের ইমামগণের বক্তব্য জানার জন্যে উলামায়ে কেরামের নিম্নোক্ত কিতাবগুলো দেখতে পারেন–

কিতাবুল মওযূআত, ইবনুল জাওযী ২/৪৯-৫২; আলমানারুল মুনীফ, ইবনুল কায়্যিম ৯৮-৯৯; তাখরীজে ইহইয়া-ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, যাইনুদ্দীন ইরাকী ১/২৯৬; আললাআলিল মাসনূআ, জালালুদ্দীন সুয়ূতী ২/৫৯-৬০; তানযীহুশ শরীয়া, ইবনে আররাক ২/৯২-৯৪; আলমাওযূআতুল কুবরা, মোল্লা আলী কারী ১৬৫; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, মুরতাজা যাবীদী ৩/৪২৫-২৪৭; আলফাওয়ায়েদুল মাজমুআ, শাওকানী ১/৭৫-৭৬; আলাআসারুল মারফুআ, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী ৮২-৮৫

অক্টোবর-নভেম্বর-২০০৬

ভুল ভাবনা
রোযা কি অনাহার যাপন?

রমাযানের রোযার ব্যাপারে কারো কারো মন্তব্য শুনে মনে হয় যেন তারা রোযাকে শুধুই একটি অনাহার যাপনের সাধনা মনে করে। ইসলামের রোযাটা যেন অন্যান্য ধর্মের সাধনার মত শুধুই একটি সাধনা। মনে রাখবেন, এ ভাবনা নিতান্তই ভুল। রোযা ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত; তাতে অনেক রহস্য ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

রোযার সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি, মাসায়েল ও পদ্ধতি ইসলামে নির্দেশিত রয়েছে; যা আমরা খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহ্‌র ওহীর মাধ্যমে পেয়েছি। রোযার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেকতম বা রহস্য হল তাকওয়া ও অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে অনৈসলামী সাধনা বা অনাহার যাপনের মূল উদ্দেশ্য হল শুধু রূহ বা আত্মার শক্তি অর্জন করা; অন্তরের পবিত্রতা বা তাকওয়া অর্জনের সঙ্গে যার সামান্যতম সম্পর্কও নেই। উপরন্তু তাদের সে সাধনা সম্পূর্ণ মনগড়া এবং ইবাদতের সাথে তার সামান্যতম সম্পর্কও নেই। সুতরাং ইসলামী রোযাকে বিজাতিদের মাঝে প্রচলিত সাধানার মত একটি সাধনা মনে করা চরম মূর্খতা; যা থেকে তাওবা করা ফরয।

আরেকটি ভুল ভাবনা
ঈদ বিজাতিদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মতই কী রেওয়াজী অনুষ্ঠান?

ঈদের ব্যাপারেও অনেক মানুষের ধারণা কিছুটা এরকম যে, এটা যেন অন্যান্য বিজাতিদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মতই একটি রেওয়াজী

প্রোগ্রাম মাত্র অথচ এটাও সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারণা। কারণ ইসলামের ঈদ তাৎপর্য, রহস্য, ভিত্তি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, বিধান ও পদ্ধতি সবদিক থেকেই বিজাতির ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামের ঈদ কোন রেওয়াজী অনুষ্ঠান নয়; বরং এটা অত্যন্ত অর্থবহ ও হেকমতপূর্ণ অনেক বড় নেক কাজ এবং ইসলামের একটি 'শেআর' বা নিদর্শন পর্যায়ের বিধান এবং অনেকগুলো নেক আমল ও ইবাদতের সমষ্টি। এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা জানার জন্যে মাসিক আলকাউসার অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৬ সংখ্যার 'পথের সন্ধানে' কলামের নিবন্ধটি দেখা যেতে পারে।

ভুল আমল

জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়া।

কোন কোন মানুষকে দেখা যায় নামাযের জন্যে যখন জায়নামাযে বা কাতারে দাঁড়ায় তখন তারা প্রথমে আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ে। তারপর নিয়ত করে তাকবীরে তাহরীমা বলে। এ আমলটি ভুল। নামায শুরু হয় তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা এবং শেষ হয় সালামের মাধ্যমে। তাকবীরে তাহরীমার আগে আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ বা অন্য কিছু পড়া শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়ার সময় হল তাকবীরে তাহরীমা ও ছানার পর, যা মূলত সূরায়ে ফাতিহা শুরু করার জন্যে পড়া হয়। এজন্যেই তো যাকে সূরা ফাতিহা পড়তে হয় না (যেমন মুক্তাদী) সে ব্যক্তি ছানার পরও আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়বে না।

ভুল ধারণা

তারাবীহ পড়তে না পারলে রোযাও হবে না।

জনৈক ব্যক্তির মুখে 'তারাবীহ পড়তে না পারলে রোযাও হবে না' শুনে আমি ভ্রুক্ষেপও করি নি। ভেবেছিলাম, এটা তার ব্যক্তিগত ভ্রান্তি। তাই একে 'প্রচলিত ভুল' বিভাগে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখন উপরোক্ত কথাটি একটি দৈনিক পত্রিকায় পড়লাম তখন আশ্চর্যের কোন সীমা-পরিসীমা থাকল না। এর চেয়েও আফসোসের ব্যাপার হল, এই ভুল বক্তব্যটি সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে কয়েকজন মুফতী সাহেবের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বলে অথচ কোন 'মুফতী' একথা বলবেন তা হতেই পারে না।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারাবীহ অতি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। মাহে রমাযানের হকসমূহের মধ্যে তারাবীহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হক। শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া তারাবীহ পরিত্যাগ করা গোনাহর কাজ। কিন্তু কারো যদি তারাবীহ পড়ার সুযোগ না হয় কিংবা দুর্ভাগ্যবশত যদি কেউ কোন ওজর ছাড়াই তারাবীহ না পড়ে তবে তার রোযাও হবে না-এ কথাটি একদম ভুল। রোযা মাহে রমাযানের স্বতন্ত্র আমল এবং ফরযে আইন। তারাবীহ পড়া না হলেও তা ফরয থাকে এবং তারাবীহ পড়া ছাড়াও তা আদায় হয়।

খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, তারাবীর ব্যাপারে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা একটি বড় বঞ্চনা। আর তারাবীহ না পড়াকে বাহানা বানিয়ে রোযাও না রাখা আরো বড় বঞ্চনা এবং মারাত্মক কবীরা গোনাহ।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে রমাযানের হকসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন।

হাদীস নয়
প্রতিদিনের তারাবীর ভিন্ন ভিন্ন ফযিলত!

১. কোন কোন এলাকায় রমযান উপলক্ষে একটি লিফলেট বিতরণ করা হয়; যাতে রমাযানের প্রতিদিনের তারাবীর জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সওয়াবের কথা রয়েছে এবং সেটাকে হাদীস বলেও দাবি করা হয়েছে অথচ বর্ণনাটির আদ্যপান্ত পুরোটাই মিথ্যা এবং এটাকে হাদীস বলাও অনেক বড় গোনাহ। তারাবীর ফযীলতের ব্যাপারে যেসব সহীহ হাদীস রয়েছে সেগুলোই বলা উচিত। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এ হাদীসটি তো খুবই প্রসিদ্ধ যে, 'যে ব্যক্তি ঈমানের দাবিতে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রমাযানের রাতের (তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ) নামায পড়বে তার আগে-পরের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'

শবে কদরের নামায পড়ার নিয়ম!

২. মকসূদুল মুমিনীন ২৪৮-২৫০ পৃষ্ঠায় 'শবে কদরের নামায পড়িবার নিয়ম' শিরোনামে যা লেখা হয়েছে তা সবই ভিত্তিহীন বর্ণনা। আফসোসের কথা হচ্ছে, ওই সব বর্ণনার কোনটার সাথে মেশকাতের বরাত দেওয়া আছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সেসব বর্ণনার কোনটাই মেশকাতে নেই। আর

শবে কদরের নামায নামেও শরীয়তে কোন নামায নেই। শবে কদর অনেক বড় ফযীলতের রাত। এ রাতে অধিক পরিমাণে নফল নামায পড়া উচিত; যা সাধারণ নফল নামাযের নিয়মেই পড়তে হয়। তাতে বিশেষ কোন রাকাত সংখ্যা, বিশেষ কোন পদ্ধতি বা বিশেষ কোন সূরা নির্দিষ্ট সংখ্যকবার পড়া -এর কোনটিই শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। অনির্ভরযোগ্য বাজারি বইয়ের ভুল কথায় ধোঁকা না খাওয়া উচিত। এমনিভাবে একথাও ভুল যে, শবে কদর বা শবে বরাতের রাতে গোসল করা সুন্নত বা এর বিশেষ কোন সাওয়াব বা ফযীলত রয়েছে। মকসূদুল মুমিনীন-এ এ বিষয়ে যত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলোই জাল ও ভিত্তিহীন।

ডিসেম্বর-২০০৬

কথা বলার একটি ভয়ানক ভুল যা আকীদা-বিশ্বাসেও প্রভাব ফেলে।

বিয়ের পরে কাউকে কাউকে এমন কথা বলতে শোনা যায়, 'এখন বাচ্চা নিব না' কয়েক বছর পর বাচ্চা নিব।'

'বাচ্চা নিব না' বলার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য থাকে তারা এমন কোন ওষুধ ব্যবহার করবে বা এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে যা সাধারণত গর্ভে বাচ্চা আসতে বাধা প্রদান করে থাকে। এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হল, শরীয়তসম্মত কোন ওজর ছাড়া এরূপ করাই ঠিক নয়। তাছাড়া এসব করলেও তা কারো কাছে বলার মত বিষয় নয়। কিন্তু এরচেয়েও জঘন্য ব্যাপার হল, তাদের একথা বলা যে, 'আমি বাচ্চা নিব' বা 'বাচ্চা নিব না' যেন বাচ্চা হওয়া বা না হওয়া তাদের নিজেদের কব্জায়; অথচ প্রত্যেক মুসলমানই একথা জানে যে, এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের অধীন। স্বামী-স্ত্রী যদি গর্ভ সঞ্চারে বাধাদানকারী কোন কিছু অবলম্বন নাও করে আর হাজারো চেষ্টা করে তবুও অনেক সময় দেখা যায় গর্ভসঞ্চার হয় না; হলেও স্থায়ী হয় না; স্থায়ী হলেও জীবিত ভূমিষ্ঠ হয় না। পক্ষান্তরে গর্ভ বাধাদানকারী কোন ওষুধ বা কোন পদ্ধতি অবলম্বনের পরও আল্লাহ্র হুকুমে বাচ্চা হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা যে ভাগ্যলিপি লিখে রেখেছেন তা রুখবার কেউ নেই এবং যা সেখানে মঞ্জুরিত নয় তা পাওয়ারও কোন পথ নেই। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; যাকে ইচ্ছা মেয়ে দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা ছেলে দান করেন। অথবা তাদেরকে ছেলে-মেয়ে উভয় দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।"– সূরা শুরা ৪৯-৫০
আল্লাহ্ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন–

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَ مَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"আল্লাহ্ মানুষের জন্যে যে রহমত খুলে দেন তা রুখবার কেউ নেই এবং তিনি যা রুখে দেন তা তিনি ব্যতীত কোন প্রেরণকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"– সূরা ফাতির ২
হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল' (সহবাসে বাইরে শুক্রক্ষরণ ঘটানো) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, "তা তোমরা কেন করতে যাবে? কেননা যত প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার তা তো আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করবেনই।"

– সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৩৮/১৩২

তিনি আরো ইরশাদ করেন, "যে পানি থেকে সন্তান হওয়ার তা যদি পাথরেও ফেল তা থেকেও আল্লাহ্ তাআলা সন্তান সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ্ তাআলা যত প্রাণী সৃষ্টি করার তা তিনি সৃষ্টি করবেনই।"

– মুসনাদে আহমদ ৩/১৪০

মোটকথা যে জিনিস বান্দার হাতে নেই; বরং তার সম্পর্ক তাকদীরের সঙ্গে এবং আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও রহমতের সঙ্গে, সে ব্যাপারে এরূপ শব্দাবলি ব্যবহার করা যা দ্বারা সন্দেহ হয়, যেন তা বান্দার কব্জায়– এরূপ আচরণ কোন মুমিনের জন্যে কখনো শোভনীয় নয়। তাই এধরনের কথা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

২৯ দিনে মাস হলে কি এক রোযা কম হয়?

যদি ২৯ রমযান চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় এবং পরের দিন ঈদ হয় তখন কতক লোককে বলতে শোনা যায় যে, 'আহ! রোযা একটা কম হয়ে গেল–এরূপ বলা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা আমাদের উপর রমযান মাসের রোযা ফরয করেছেন; যা চান্দ্র মাসসমূহের নবম মাস। আর চান্দ্র মাস কখনো ৩০ দিনে হয়, কখনো ২৯ দিনে। সুতরাং রমযান মাস যখন

২৯ দিনে হল তখন এটাই পূর্ণ মাস এবং ২৯ রোযাই ওই বছরের পূর্ণ ফরয রোযা। এক রোযা কম হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

প্রসিদ্ধ নামসমূহে প্রচলিত কিছু ভুল।

(ক) হোসাইন ইবনে মনসূর হাল্লাজ একজন প্রসিদ্ধ সূফী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। লোকেরা সাধারণত তাঁকে মনসূর হাল্লাজ বলে থাকে; যা ঠিক নয়। কেননা মনসূর তো তাঁর পিতার নাম।

(খ) মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী রহ. আরবের একজন প্রসিদ্ধ সংস্কারক বুযুর্গ ছিলেন। বহু লোকই তাঁকে আব্দুল ওয়াহহাব নামেই উল্লেখ করে থাকে; যা ঠিক নয়। আব্দুল ওয়াহহাব তাঁর পিতার নাম। আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী বলে লোকেরা যাকে বুঝিয়ে থাকে তিনি হলেন তার ছেলে মুহাম্মাদ।

(গ) 'দরসে নেযামী' যার দিকে সম্বন্ধযুক্ত বলে কেউ কেউ মনে করে তিনি উযীর নেযামূল মূলক; যিনি বাগদাদের মাদরাসা নেযামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই ধারণা ঠিক নয়। মূলত এই নেসাবের প্রবর্তক হলেন শাইখ নেযামুদ্দীন সুহালাভী (১১৬৫ হি.) যিনি বাহরুল উলূম আব্দুল আলী লাখনোভী রহ. (১২২৫ হি.) এর শ্রদ্ধেয় পিতা ছিলেন।

জানুয়ারি-২০০৭

ভুল বিশ্বাস

বাইবেল নামে যে গ্রন্থটি খৃস্টানদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ সেটি কি আসল তাওরাত ও ইঞ্জিল?

আধুনিক বিশ্বের খৃস্টান মিশনারিদের প্রোপাগান্ডা ও অপকৌশলের ফলে কতিপয় সাধারণ মুসলমান ভাইকে এই ভুল ধারণায় পতিত হতে দেখা যায় যে, বর্তমানে বাইবেল নামে যে গ্রন্থটি খৃস্টানদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ সেটি আসল তাওরাত ও ইঞ্জিল, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত মূসা ও ইসা আ.-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল।

স্মরণ রাখবেন, এটা খৃস্টানদের একটি মিথ্যা প্রোপাগান্ডা। যে তাওরাত হযরত মূসা আ.-এর উপর এবং যে ইঞ্জিল হযরত ঈসা আ.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মূল কপি তো দূরের কথা, সেগুলোর অনুবাদও কোন স্থানে সংরক্ষিত নেই। বর্তমানে যে

কিতাবগুলো বাইবেল নামে প্রসিদ্ধ এবং কতিপয় খৃস্টীয় প্রতিষ্ঠান যে গ্রন্থকে নতুন মুদ্রণে ইঞ্জিল নামে প্রকাশ করেছে সেটা মূলত হযরত ঈসা আ.-এর জীবন চরিত। যা বিভিন্নজন লিখেছে। কিন্তু যাদের সঙ্গে কিতাবগুলোকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় তাদের পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সূত্র বিদ্যমান নেই এবং এমন কোন কপি মওযুদ নেই যেটা স্বয়ং রচয়িতাদের হাতে লেখা। এমনকি রচয়িতাদের কপি থেকে নকলকৃত কোন কপি বিদ্যমান আছে একথার প্রামাণও পাওয়া যায় না। উপরন্তু কিতাবগুলোর কোন কপি ওই ভাষায় নেই যে ভাষায় বাইবেল রচয়িতারা লিখেছেন বলে দাবি করা হয়ে থাকে। বাইবেল নামে যা পাওয়া যায় তাতে ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত এত বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা এবং পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের স্তুপ রয়েছে যা বড় বড় পাদ্রীরা এবং খৃস্টান গবেষকরা পর্যন্ত প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন। এগুলোর উদাহরণ দেখতে চাইলে মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানভী রহ.-এর বিশ্বখ্যাত লা-জবাব আরবী কিতাব ইযহারুল হক অধ্যয়ন করা যেতে পারে। কিতাবটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এবং উর্দূ ভাষায় অনেক আগেই 'বাইবেল সে কুরআন তক' নামে তিন খণ্ডে কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে। এখন সব জায়গায় কিতাবটি পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির একথা ভালভাবে বুঝা উচিত যে, আমাদের ঈমান বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের উপর নয়; বরং ওই তাওরাত ও ওই ইঞ্জিলের উপর ঈমান থাকতে হবে যেটা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যথাক্রমে হযরত মূসা আ. ও হযরত ঈসা আ.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যেটার কপি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ওই আসল তাওরাত ও ইঞ্জিলের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস হল, সেটা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত হেদায়াতের গ্রন্থ ছিল। সম্পূর্ণরূপে হক ছিল এবং খাতামুন্নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের আগ পর্যন্ত অনুসরণীয় ছিল। ওই আসল তাওরাত ও ইঞ্জিলে আখেরী নবীর গুণাবলি এবং তাঁকে প্রেরণের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। যখন আখেরী নবীর আবির্ভাব ঘটবে তখন আসল তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারীদের উপর তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর অনুসরণ করা ফরয-একথাও সেখানে ছিল। কিন্তু ইহুদি খৃস্টান যাজক ও পণ্ডিতরা ওই আসল কিতাবগুলোকে সংরক্ষণ করে নি; বরং জেনে শুনে তাকে বিকৃত করেছে, তার শিক্ষা ও হেদায়াতসমূহকে গোপন করেছে, পরিশেষে ঐ কিতাবগুলোর

সুস্পষ্ট ও অকাট্য হেদায়াত- শেষ নবীর উপর ঈমান আনা অস্বীকার করে বস্তুত তাওরাত ও ইঞ্জিলের উপর ঈমান না রাখার কথা ঘোষণা করেছে। মুসলমান যেমন আসল তাওরাত ও ইঞ্জিলকে হক জানে তদ্রূপ এই আকীদাও পোষণ করে যে, আলকুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হওয়ার পর আমলযোগ্য হেদায়াতগ্রন্থ একমাত্র কুরআনে কারীম। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে (মূসা আ. ও ইসা আ.-এর) তাওরাত ও ইঞ্জিলের শরীয়ত মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। এখন তা থেকে শুধু ওই হুকুমগুলো আমলযোগ্য যেগুলো আলকুরআনুল কারীম এর শরীয়ত বহাল রেখেছে।

ভুল ধারণা

'আযান ও ইকামতে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' এর জবাবে কী বলবে?'

আযান ও ইকামাতের জবাব দেওয়া সুন্নত একথা সবাই জানে। মুয়াজ্জিন যে শব্দগুলো বলবে জবাবে সে শব্দগুলোই বলতে হয়। তবে 'হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ' এর জবাবে শ্রোতাগণ 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' বলবে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ - এর উত্তরে হুবহু আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহই বলতে হয়। কিন্তু কিছু মানুষকে দেখা যায়, মুয়াজ্জিন যখন এই কালেমা উচ্চারণ করেন তখন তারা 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলে থাকেন। তারা মনে করেন, এটিই এ বাক্যের জবাব, অথচ এটা এই বাক্যের জবাব নয়। আযানের জবাব হল বাক্যটিই পূনরায় বলা। এরপরে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে পারবে।

হাদীস নয়

আল্লাহ্র নিকট বেলালের সীন উচ্চারণ শীন ধর্তব্য হয়।

এক বক্তার ওয়াজে শোনা গেল, "*রাসূলের মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল রাযি. 'আশহাদু' ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারতেন না। তিনি ش (শীন) কে س (সীন) পড়তেন। তাঁর এই অশুদ্ধ উচ্চারণে লোকদের আপত্তির কারণে তাঁকে আযানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং তাঁর পরিবর্তে অন্য একজন সহীহ উচ্চারণকারীকে মুয়াজ্জিন বানানো হয়। এরপর একদিন অতিবাহিত হলে জিবরীল আ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের*

কাছে তাশরীফ এনে বললেন, আজ কি আপনার মসজিদে আযান হয়নি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ খুব সুন্দর আযান হয়েছে। আগের থেকে ভাল। জিবরীল আ. বললেন, আগের আযান তো আরশ পর্যন্ত পৌছত। কিন্তু আজকের আযান তো আরশ পর্যন্ত পৌছে নি। আল্লাহ্র নিকট বেলালের সীন উচ্চারণ শীন ধর্তব্য হয়।"

এটি একটি বানানো জাল ও মুখরোচক ভিত্তিহীন ঘটনা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সাথে এটির সামান্যতম সম্পর্ক নেই। সহীহ হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে জানা যায়, বেলাল রাযি. খুব স্পষ্টভাষী, উঁচু আওয়াজ এবং সুমিষ্ট স্বরের অধিকারী ছিলেন। এজন্যই তাঁকে আযান দেওয়ার জন্য মনোনিত করা হয়েছিল। হাদীস পর্যালোচকগণ দৃঢ়ভাবে বলেছেন, উল্লেখিত বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই। -আলমাসনু ফী মারিফাতিল মাওযূ ১১৩; আলমাকাসিদুল হাসানা ১৯৭; কাশফুল খাফা' ১/৪১১

ফেব্রুয়ারি-২০০৭

একটি ভয়াবহ ভুল

কুরবানীর ঈদ কি জবাইয়ের উৎসব?

দ্বীনী ইল্মের ব্যাপক চর্চা না থাকার কারণে কোনো কোনো বে-দ্বীন মানুষ অজ্ঞতাবশত কিংবা জেনে-শুনে এই মারাত্মক ভ্রান্ত কথা বলে থাকে যে, কুরবানীর ঈদ পশু জবাইয়ের উৎসবের নাম। এজন্য তাদের ধারণামতে সেই দিনের আনন্দ হল পশু জবাই করার আনন্দ এবং মুসলিমদের এই উৎসবও ভিন জাতির নানা উৎসবের মতই একটি উৎসব। যেমন- হিন্দুদের রয়েছে বলিদান উৎসব (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ 'কুরবানীর ঈদ' শব্দেই এই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন বিদ্যমান রয়েছে। কেননা কুরবানীর ঈদ শব্দটির অর্থ হল আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনের ঈদ। এটি এমন ঈদ, যে ঈদে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার আদেশে আল্লাহ্ তাআলার দেওয়া রিয্ক (গৃহপালিত পশু) আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহ্র দরবারে নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পেশ করে থাকে। তাহলে এই উৎসব পশু জবাইয়ের উৎসব নয়; বরং আল্লাহ্র দরবারে নৈকট্য অর্জনের উপকরণ পেশ করতে পারার সৌভাগ্য অর্জনের আনন্দ। এটি গোশত ভক্ষণের উৎসব নয়; বরং খালেস আল্লাহ্র ইবাদত।

কুরবানী পেশ করার পদ্ধতি আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকে এভাবে শিখিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তাআলার দানকৃত গৃহপালিত বিশেষ প্রকারের

বিশেষ বয়সের এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের হালাল পশু নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত পন্থায় শুধু তাঁর হুকুম পালন করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর নামে জবেহ করা। এরপর এই পশুর গোশত-চামড়া তাঁর নির্দেশিত পন্থায় ব্যবহার করা।

কুরবানীর এই হাকীকত সামনে থাকলে ইসলামী ঈদ এবং ভিন জাতির উৎসবের মধ্যে নিম্নোক্ত মৌলিক পার্থক্যগুলো একদম পরিষ্কার হয়ে যায়।

১. অন্যান্য জাতির উৎসব কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদযাপিত হয়, কিন্তু ইসলামী ঈদ সম্পৃক্ত হচ্ছে ইবাদতের সঙ্গে। যথা ঈদুল ফিতরের সম্পর্ক রমাযানের রোযার সঙ্গে এবং ঈদুল আযহার সম্পর্ক হজ্বের সঙ্গে। হজ্বের বরকতপূর্ণ সময়ে আল্লাহ্ তাআলা হাজীদের জন্য এবং তাদের অসিলায় অন্যদের জন্যও মাগফিরাতের দরজা উন্মুক্ত করেন। এই মাগফিরাতের মওসুমে নৈকট্য অর্জনের আমল হল কুরবানী।

২. অন্যান্য জাতির উৎসবগুলো তাদের নিজেদের বানানো, কিন্তু ইসলামী ঈদ ওহীর শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত।

৩. অন্যদের উৎসব কর্মসূচী ও কর্মপন্থার দিক থেকে শিরক ও বিদআতের সমষ্টি অথচ ইসলামী ঈদের ভিত্তিই হল নির্ভেজাল তাওহীদ ও ইত্তিবায়ে সুন্নত। কুরবানীর পশু জবেহ করার আগে কুরবানীদাতার অন্তর থেকে উৎসারিত হয়-

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ 'আমি সকল ভ্রান্তি থেকে বিমুখ হয়ে ওই সত্ত্বার অভিমুখী হলাম যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগৎসমূহের পালনকর্তা।' –সূরা আনআম ৭৯ ও সূরা আল-ইমরান ১৬২

এরপর বলে, اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ইয়া আল্লাহ্ আপনার দেওয়া নিয়ামত থেকে আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরবানী করছি। আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করছি এবং আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। এরপর জবেহ সমাপ্ত হওয়ার পর বলে, اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ 'ইয়া আল্লাহ্, আমার পক্ষ থেকে এই কুরবানী কবুল করুন।

৪. অন্যদের উৎসবগুলো রীতিসর্বস্ব; অথচ ইসলামী ঈদ হল অনেকগুলো নেক আমলের সমষ্টি। যেমন, ঈদুল আযহাতে কুরবানীর পশু জবেহ করা একটি ইবাদত, এটি কোনো ভিত্তিহীন রেওয়াজ নয়। আবার এর উদ্দেশ্য গোশত খাওয়াও নয়। গোশত তো মানুষ বারো মাসই খেয়ে থাকে। যে কোনো হালাল পশু আল্লাহ্‌র নামে জবেহ করা হয় তা আল্লাহ্ তাআলা তার বান্দাদের জন্য হালাল করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের আগে পশু জবেহ করে তা গোশত খাওয়ার কাজে আসতে পারে কিন্তু তা نسك কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে না। কুরবানী হওয়ার জন্য ঈদের নামাযের পর কুরবানীর নিয়তে জবাই করতে হবে। যদি কুরবানী একটি ইবাদত না হত; বরং গোশত ভক্ষণের উৎসব হত তবে এর জন্য এত মাসাইল এবং এত নিয়ম-কানুন যথা, নির্ধারিত সময়, বিশেষ ধরনের, বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পশু এবং অন্যান্য মাসাইল ইত্যাদির প্রয়োজন হত না এবং এর জন্য ইখলাসেরও কোনো প্রয়োজন হত না।

অতএব তাওহীদ ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শেখানো ঈদুল আযহা ও কুরবানীকে যারা হিন্দুদের বলিদান উৎসবের মতো একটি শিরক ও কুসংস্কারভিত্তিক উৎসব মনে করে সে প্রকৃতপক্ষেই একজন মুলহিদ ও যিন্দীক ব্যক্তি। এ ধরনের মানুষের খালেস তাওবা করে সহীহ ইল্‌ম অর্জন করা এবং ঈমান ও আকীদা ঠিক করা ফরয।

ভুল কাজ

দুআর মধ্যেও কি মুকাব্বিরের প্রয়োজন হয়?

পুরানো ঢাকার একাধিক মসজিদে বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। অন্যান্য আরও মসজিদেও এমন হয়ে থাকবে। অর্থাৎ নামাযে মুকাব্বির ছিল না আর বিনা প্রয়োজনে কারো মুকাব্বির হওয়া ঠিকও নয়-কিন্তু দুআর সময় মুয়াজ্জিন সাহেব হঠাৎ করে মুকাব্বির হয়ে যায়। ইমাম দুআর জন্য হাত উঠালে মুয়াজ্জিন উচ্চস্বরে বলে, اَللّٰهُمَّ آمِيْنَ দুআ শেষ করলে বলে, بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ এই প্রচলিত পদ্ধতিতে কয়েকটি বিষয় সংশোধন যোগ্য রয়েছে,

১. এই মুকাব্বির হওয়ার মূল কারণ হল নামাযের পরে সম্মিলিতভাবে দুআ করাকে জরুরি মনে করা হয়। অথচ এটি কোনো জরুরি ব্যাপার নয়।

২. এর এক কারণ এটাও যে, অনেক মানুষের সম্মিলিত দুআতে সবারই দুআর সূচনাকারীর সঙ্গে আরম্ভ করা এবং তার সঙ্গেই শেষ করাকে জরুরি মনে করা হয়। অথচ এটিও জরুরি নয়। কেউ ইচ্ছা করলে পরে দুআ আরম্ভ করেও আগে শেষ করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে একসঙ্গে শুরু করে অন্যদের দুআ শেষ হওয়ার পরও নিজের দুআ জারী রাখতে পারে। মোটকথা সবার একসঙ্গে দুআ শুরু করা কিংবা একসঙ্গে শেষ করা কোনোটিই জরুরি নয়। দুআতে নামাযের মত ইমামত ও ইক্তেদার বিধান প্রযোজ্য হয় না।

৩. নামাযে মুকাব্বির না হয়ে দুআতে মুকাব্বির হওয়া-এ থেকে এই ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, নামাযে জামাতবদ্ধ হওয়ার চেয়ে দুআতে জামাতবদ্ধ হওয়া অধিক জরুরি। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল। নামাযে প্রয়োজনের সময় মুকাব্বির হওয়া কাম্য কিন্তু দুআতে কোনো সময়ই মুকাব্বির রাখার আদেশ করা হয় নি।

৪. সাধারণত জামাতের নামাযে কিছু মানুষ মাসবূক থাকে। এ অবস্থায় ইমাম উচ্চ স্বরে দুআ করে কিংবা মুয়াজ্জিন উচ্চ আওয়াজে মুকাব্বির হয়ে তাদের নামাযে অসুবিধা সৃষ্টি করে। এটি জায়েয নয়। যদি একজন মানুষও নামাযে মাসবূক থাকে তাহলে ইমাম-মুয়াজ্জিন কারও জন্যই এভাবে দুআ করার অধিকার নেই, যাতে নামাযীর নামাযে বিঘ্ন ঘটে।

৫. দুআর সূচনা হামদ ও ছানা দ্বারা এবং সমাপ্তিও হামদ-ছানা ও আমীন দ্বারা করা মুস্তাহাব। উপরোক্ত রেওয়াজি পদ্ধতিতে এই বিষয়টিও অনুসৃত হয় না।

ভুল ধারণা

ইজতিমার দিনগুলোতে কি রোযা রাখা মুস্তাহাব?

কোনো কোনো অঞ্চলে টঙ্গীর বিশ্ব ইজতিমার দিনগুলোতে মহিলাদেরকে রোযা রাখতে দেখা যায়। তাদের কারো কারো কথা থেকে অনুমিত হয় যে, তারা এই রোযা রাখাকে সেই দিনগুলোর বিশেষ করণীয় আমল মনে করে থাকে। যদি বাস্তবিকই তারা এমন ধারণা পোষণ করে তবে তা একটি ভুল ধারণা এবং তা পরিহার করা উচিত।

নফল রোযা যে কোনো দিন রাখা যায়। বছরের যে পাঁচদিন রোযা রাখা নিষেধ সেই দিনগুলো ছাড়া অন্য যে কোনো দিন রোযা রাখা যায় এবং তা

অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। তবে মনে রাখতে হবে এটা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ব্যাপার। নফল রোযার মধ্যে কেবল ওই সব রোযারই বিশেষ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে যে রোযাগুলোর প্রতি বিশেষভাবে হাদীস শরীফে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যথা, ৯ই যিলহজ্বের রোযা, আশুরার রোযা, আইয়ামে বীজের (যিলহজ্ব বাদে প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের) রোযা, শাবান ও আশহুরে হুরুম-এর রোযা ইত্যাদি।

যেসব দিনের রোযার ব্যাপারে কুরআন হাদীসে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয় নি সে দিনগুলোর রোযা সব এক ধরনের। সেই দিনগুলোর মধ্যে যে কোনো দিন রোযা রাখা যায়। তবে সেই দিনগুলোর কোনোটির ব্যাপারে কোনো স্বাতন্ত্রের বিশ্বাস রাখা কিংবা বিনা দলীলে কোনো বিশেষ দিনের রোযাকে মুস্তাহাব বলা কোনোভাবেই ঠিক নয়।

টঙ্গীর বিশ্ব ইজতিমা সাধারণ দাওয়াত ও ঈমানী চেতনার নবায়ন প্রসঙ্গে একটি দ্বীনী আলোচনার ইজতিমা। প্রত্যেক দ্বীনী ইজতিমার মত এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতপূর্ণ ইজতিমা। এই ইজতিমার তারিখ, স্থান ও কর্মপদ্ধতি সবই ব্যবস্থাপনাগত উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে চিন্তা-ভাবনা ও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাহলে এ বিষয়টি খুবই স্পষ্ট যে, এই ইজতিমা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনগুলোতে এ উপলক্ষে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

মার্চ-২০০৭

ভুল ধারণা

মনগড়াভাবে কোনো মসজিদকে বিশেষ ফযীলতের মসজিদ মনে করা।

কোনো কোনো মানুষের মধ্যে বিশেষত মহিলাদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায় যে, কোনো মসজিদ অনেক পুরানো হলে, কিংবা কোনো মসজিদকে জাতীয় মসজিদ আখ্যা দেওয়া হলে অথবা কোনো মসজিদের সঙ্গে মাজার থাকলে অথবা অন্য কোনো দিক দিয়ে তাতে কোনো বিশেষত্ব থাকলে ওই মসজিদকে ফযীলতের মসজিদ মনে করা হয়। ধারণা করা হয় যে, এই মসজিদে নামায পড়ায় অন্য কোনো মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে বেশি সাওয়াব। কোনো কোনো মানুষ তো এই উদ্দেশ্যে সফর পর্যন্ত করে থাকে। মহিলাদেরকে দেখা যায়, তারা এ জাতীয় মসজিদের জন্য মান্নত করেন এবং বাচ্চাদেরকে বরকতের জন্য বা অসুস্থদেরকে সুস্থতার জন্য সেসব মসজিদে স্পর্শ করিয়ে নিয়ে আসেন।

মনে রাখতে হবে, এগুলো হল ভিত্তিহীন ধারণা ও অর্থহীন কাজ। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বা এ জাতীয় আরও কোনো বৈশিষ্ট্য কোনো মসজিদের শরয়ী মর্যাদা ফযীলত বৃদ্ধি করে না। সকল মসজিদই আল্লাহ্র ঘর এবং ফযীলতের দিক থেকে সবগুলোর মর্যাদা এক সমান। কোনো ঐতিহাসিক বিশেষত্বের কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে কোনো মসজিদ বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হতেই পারে, কিন্তু এতে করে আল্লাহ্র ঘর হওয়ার দিক থেকে এবং সাওয়াব ও ফযীলতের দিক থেকে কোনো ব্যবধান সৃষ্টি হয় না। সকল মসজিদ এক মর্যাদার। ফযীলত ও অধিক ছওয়াবের বিষয়টি শুধু তিন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত।

১. মসজিদে হারাম, দুই. মসজিদে নববী, তিন. মসজিদে আক্বসা। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ، اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ مَسْجِدِيْ هٰذَا، وَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى.

শুধু তিন মসজিদের উদ্দেশেই সফর করা যাবে। মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদে আক্বসা। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩৯৭

কোনো মসজিদকে জাতীয় মসজিদ আখ্যায়িত করা একটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এর কারণে ওই মসজিদে বিশেষ ফযীলত কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে? তদ্রূপ মসজিদের ভিতরে মাজার হওয়া তো জায়েযই নেই, মসজিদের আশে-পাশেও মাযার থাকা উচিত নয়। তাহলে মাযার থাকার কারণে মসজিদের ফযীলত বৃদ্ধি পায় কীভাবে?

উপরোক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মহল্লার মসজিদ ছেড়ে অন্য কোনো মসজিদে নামায পড়া যাবে না; বরং উদ্দেশ্য হল, উপরোক্ত ভুল ধারণাটি সংশোধন করা উচিত। একটি উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে মসজিদে কোনো বুযুর্গ আলেম ইমাম হিসেবে আছেন এবং সেখানে দ্বীনী তা'লীম ও মোযাকারার ব্যবস্থা রয়েছে সেই মসজিদ যদি অন্য কোনো মহল্লায়ও হয় তবুও সেখানে দ্বীনী ও ইল্মী উন্নতির স্বার্থে যাওয়া মোটেই নিষেধ নয়।

একটি ভুল কর্মপদ্ধতি

হিসনে হাসীন কী খতম বা অজীফা আকারে পড়ার কিতাব?

'হিসনে হাসীন' মুহাদ্দিস ইবনুল জাযারী (মৃত্যু ৮৩২ হিজরী)-এর একটি প্রসিদ্ধ কিতাব, যে কিতাবে তিনি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় পঠিতব্য মাসূর দুআগুলো হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে সংকলন করেছেন। এ কিতাবের পঞ্চম অধ্যায়ে তার ওই দুআগুলো সংকলন করেছেন যা কোনো বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ সময়ের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এটি কোনো অজীফার পুস্তকও নয় আর মুসীবত কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্যে খতম করার কিতাবও নয়। আফসোসের বিষয় হল, খুব কম সংখ্যক লোকই কিতাবটির মূল উপকার হাসিল করে। অর্থাৎ এই কিতাবে উল্লেখিত দুআগুলো মুখস্থ করে কিংবা দেখে দেখে যে সময়ে যে দুআ পড়া উচিত তা পড়ে। অধিকাংশ মানুষ এ কিতাবটিকে শুধু মুসীবতের সময় খতম করানোর কিতাব মনে করে। আর যারা একে গুরুত্বের সঙ্গে পড়ে থাকেন তাদের মধ্যেও অনেকে কিতাবটিকে অজীফা আকারে প্রতিদিন এক মনযিল করে পড়ে থাকেন। প্রত্যেক যিকির ও দুআ, যা বিশেষ সময়ে বা বিশেষ অবস্থায় পড়া কাম্য ছিল তার ব্যাপারে যত্নবান হতে সাধারণত দেখা যায় না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর তাওফীক দান করুন।

হিসনে হাসীনের উর্দূভাষায় অনূদিত একটি সংস্করণ আমাদের উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা ইদরীস রহ. (মৃত্যু ১৪০৯ হিজরী) কর্তৃক সংকলিত হয়েছে। এই সংকলনটি বাংলাভাষায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। সংকলনটির উপস্থাপনা থেকেই এই দুআগুলো হাদীসের শিক্ষা অনুসারে পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

ভুল নাম

'আলহাজ্জুল আকবর' কি জুমার দিনের হজ্বের নাম?

লোকমুখে প্রসিদ্ধ যে, আরাফার দিন যদি জুমাবার হয় তবে সেই হজ্বকে আকবরী হজ্ব বলা হয়। কারো কারো কথা থেকে অনুমিত হয় যে, কুরআন কারীমে সূরা তাওবায়, يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ বাক্যে এই আকবরী হজ্বের কথাই বলা হয়েছে। এই ধারণা ঠিক নয়। কুরআনে হাকীমে يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ শব্দে জুমআর দিন উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা শুধু হজ্বই উদ্দেশ্য, সে যে দিনই

হোক না কেন। হজ্বকে 'আকবর' বলার একটি কারণ হচ্ছে হজ্বের একটি প্রকার হল উমরা, যা সাধারণ হজ্বের তুলনায় ছোট। তাহলে হজ্ব হল বড় হজ্ব আর উমরা ছোট হজ্ব।

এটা ঠিক যে, জুমআর দিনে হজ্ব হলে সেখানে একদিকে আরাফার দিনের ফযীলত ও অন্যদিকে জুমআর দিনের ফযীলত একত্রিত হয় এবং এজন্য এর একটি বিশেষ গুরুত্বও রয়েছে তবে এর সঙ্গে উপরোক্ত কথার সম্পর্ক নেই, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ।

হাদীস নয়

কবরকে সম্বোধন ও কবরের উত্তর!

এক বক্তার মুখে শোনা গেল, *হযরত ফাতিমা রাযি.-কে দাফন করার সময় সাহাবায়ে কেরাম কবরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "হে কবর, সাবধান থেকো। তুমি কি জানো, তোমার উদরে কাকে রাখা হচ্ছে? ইনি হলেন সাইয়িদুল আলামীনের প্রিয়তম কন্যা।*

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কবর থেকে আওয়াজ আসল, আমার কাছে বংশ-বিচার নেই, এখানে প্রত্যেকের আমল অনুসারে আচরণ করা হবে।"

এটি একটি ভিত্তিহীন কেচ্ছা। বাস্তবতার সঙ্গে এর কোনো দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস বা ইতিহাসের কিতাবে এর কোনো সনদ উল্লেখ নেই। সাহাবায়ে কেরাম তো অনেক উর্দ্ধে, সাধারণ একজন মুসলমানও তো কাউকে দাফন করার সময় এধরনের কথা বলে না। আখেরাতে হিসাব কিতাবের বিষয়টি যে ঈমান ও আমলের ভিত্তিতেই হবে তা দীনের একটি সর্বজনবিদিত শিক্ষা, যা মুসলমান মাত্রেরই জানা আছে। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম কবরকে সম্বোধন করে উপরোক্ত কথা বলতে পারেন এই কল্পনাও জাহালত বা মূর্খতা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায়ই প্রিয়তম কন্যা ফাতিমা রাযি.-কে বলে গেছেন–

يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّيْ لَا أَمْلِكُ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا.

হে ফাতিমা, জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা আমি উপকার-অপকারের মালিক নই। –সহীহ মুসলিম ২/১১৪; জামে তিরমিযী হাদীস ৩১৮৫

এবং একথাও বলেছেন–

يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِيْنِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ، وَ لَا أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা তুমি চাইতে পার কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে আমি তোমার কোনোই উপকারে আসব না। –সহীহ বুখারী হাদীস ৪৭৭১; সহীহ মুসলিম ২/১১৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুস্পষ্ট শিক্ষার পর সাহাবীগণ কবরকে উপরোক্ত কথা কীভাবে বলতে পারেন? আর কবর থেকেই বা এ ধরনের জওয়াব কেন আসবে? আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হিদায়াত দান করুন।

এপ্রিল-২০০৭

ভুল ধারণা

মৃতের বাড়িতে কি আগুন জ্বালানো নিষেধ?

কোনো কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের মুখে শোনা যায়, যে বাড়িতে কেউ মারা যায় সে বাড়িতে তিনদিন পর্যন্ত আগুন জ্বালানো নিষেধ। এটা নাকি অশুভ!

মনে রাখতে হবে, ইসলামে কোনো কিছু থেকে কুলক্ষণ গ্রহণের কোনোই সুযোগ নেই। আর স্বাভাবিক গৃহ-কর্মে আগুন জ্বাললে তাতে কুলক্ষণের তো প্রশ্নই আসে না। এ জন্য এ ধারণা ঠিক নয় যে, যে বাড়িতে কেউ মারা যায় সে বাড়িতে মৃত্যুর দিন এবং পরবর্তী আরও দুদিন আগুন জ্বালানো যাবে না। প্রয়োজনে যে কোনো সময়ই আগুন জ্বালানো যাবে। তাছাড়া মৃতকে গোসল দেওয়ার জন্য সব অঞ্চলেই পানি গরম করার নিয়ম আছে। তখন এই কুলক্ষণের বিষয়টি কোথায় যাবে?

একথা ঠিক যে, মৃতের পরিবার স্বজন হারানোর বেদনায় শোকাহত থাকার কারণে রান্না-বান্নার দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। এ জন্য পাড়া-পড়শী ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনকে পরিবারটির একদিন একরাতের খাবার দাবারের আয়োজন করতে বলা হয়েছে। -রাদ্দুল মুহতার ২/২৪০, ৬৬৬৫

মদীনায় জা'ফর ইবনে আবু তালিব রাযি. এর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাবার রান্না কর। কেননা এ মুহূর্তে তারা এদিকে মনোযোগ দিতে পারবে না। -মুসনাদে আহমাদ ২/২০৫, ৬/৩৭০; জামে তিরমিযী হা. ১০০৩

মোটকথা, মৃতের পরিবারের জন্য খাবার পাঠানো সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। এখান থেকে এই ধারণা করা যে, মৃতের বাড়িতে আগুন জ্বালানো যাবে না, সম্পূর্ণ ভুল।

একটি শব্দের ভুল ব্যাখ্যা

হাজী ও আলহাজ্ব!

হজ্ব আদায়কারীকে উর্দু ও বাংলা ভাষায় হাজী বলা হয়। এখানে মূল আরবী শব্দটি হল حاج বা الحاج। সাধারণ আরবী কথাবার্তায় الحاج শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় মূল আরবী শব্দের জীমের তাশদীদ বাদ দিয়ে 'আলহাজ' বলা হয় এ শব্দের অর্থ হল 'হজ্ব আদায়কারী'। তিনি কয়বার হজ্ব করেছেন তা এই শব্দে নেই। কিন্তু কারো কারো নাকি এই ধারণা রয়েছে যে, যে একবার হজ্ব করেছে তাকে বলা হয় হাজী, আর যে একাধিক বার হজ্ব করেছে তার উপাধী আলহাজ্ব! এই ধারণা ঠিক নয়। একবার হজ্ব আদায়কারীর জন্যও উভয় শব্দ ব্যবহার করা যায়। হজ্বকারীকে হাজীও বলা যায়, আলহাজ্বও বলা যায়। যাহোক এটা একটা শব্দ কেন্দ্রিক আলোচনা হল। এখানে যে বিষয়ে সবারই সচেতন থাকা প্রয়োজন তা হল, হজ্ব ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রোকন এবং একটি ফযীলতপূর্ণ ইবাদত, যা শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই আদায় করতে হবে। হাজী বা আলহাজ্ব উপাধী পাওয়ার জন্য হজ্ব করা কিংবা হজ্ব আদায়ের পর এই উপাধীর আশায় থাকা দুটোই রিয়ার অন্তর্ভূক্ত যা ইবাদতের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সব বিনষ্ট করে দেয়।

ভুল মাসআলা

জুমার নামায কি খোলা ময়দানে সহীহ্ হয় না?

টঙ্গী-ইজতেমায় জুমার নামায ময়দানে পড়া হয়েছে। এতে একজন এই আপত্তি তুলেছেন যে, 'জুমার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওয়াকফকৃত মসজিদ জরুরি, ময়দানে জুমার নামায শুদ্ধ হয় না' এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জুমার নামায ও পাঞ্জেছানা নামায সবই জামাতের সঙ্গে শরয়ী মসজিদে আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। বিনা ওযরে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও পড়া উচিত নয়। আর জুমার নামাযের বিশেষত্ব হল, এ নামাযে জামাত

অপরিহার্য। বিনা জামাতে জুমা হয় না। তবে জুমার জন্য মসজিদ জরুরি, ময়দানে জুমা পড়লে জুমা হয় না একথা ঠিক নয়। আল্লাহ্ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য গোটা ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। -সহীহ বুখারী ৩৩৫, সহীহ মুসলিম ৫২২

এই বিধানে জুমা ও পাঞ্জেছানা সবই শামিল। হাঁ বিনা ওযরে মসজিদ ছেড়ে বাইরে জুমা পড়া বা জামাত করা ঠিক নয়। আর তা নিয়ম বানিয়ে নেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। (টঙ্গী-ইজতেমার ওজরটি তো স্পষ্ট, আশ-পাশের সকল মসজিদেও এতগুলো মানুষের সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে মাঠেই জামাত করতে হয়। -রাদ্দুল মুহতার ২/১৫২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৪৮; আলমুসান্নাফ, ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৮, হাদীস ৫১০৮, ৫১১১

হাদীস নয়

দ্বীন ও সিয়াসত দুই সহোদর।

সিয়াসত বা রাজ্য-চালনা সামাজিক জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন। ন্যায় বিচার ও ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনার আদেশ ইসলাম দিয়েছে। মুসলামানদের স্বতন্ত্র শরীয়া রাষ্ট্র হওয়া শুধু শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থেই নয়, দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রয়োজন এবং তা একটি দ্বীনী দায়িত্ব। এ বিষয়ে কুরআন হাদীসের অনেক দলীল রয়েছে। এই স্বীকৃত বিষয়টিকে কেউ কেউ এই ভাষায় প্রকাশ করেছেন-

اَلسُّلْطَانُ وَ اَلْمُلْكُ وَ السِّيَاسَةُ تَوْأَمَانِ বা اَلدِّيْنُ وَ السِّيَاسَةُ تَوْأَمَانِ কিংবা

اَلدِّيْنُ أَخَوَانِ

'দ্বীন ও শাসন জমজ-সহোদর ভাই। অর্থাৎ দ্বীনবিহীন শাসনব্যবস্থা ফলদায়ক হতে পারে না এবং এই শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিবিধান ইত্যাদি উদ্দেশ্যেও হাসিল হয় না। তদ্রুপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠা শাসন-ক্ষমতা ছাড়া সম্ভব নয়। সারকথা একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য। তবে এটা পরিষ্কার যে, এ ক্ষেত্রে দ্বীন হল উদ্দেশ্য আর শাসন ক্ষমতা তার ওসীলা বা উপায়। সূরা নূরে ইরশাদ হয়েছে–

وَ عَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِيْ الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِيْ ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا، وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোন অংশী স্থির করবে না।"...

তাহলে শাসন-ক্ষমতা দীনের জন্য, দ্বীন শাসন-ক্ষমতার জন্য নয়। যাহোক, এ মুহূর্তে আমি যে কথাটি বলতে চাই তা হল, কেউ কেউ উপরোক্ত বাক্যটিকে হাদীস মনে করে থাকে। এ ধারণা ভুল। এটি হাদীসের বাক্য নয়। কোনো মনীষীর উক্তি। –মাকতুবে শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী-সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী ১/৮০৫; তাহযীবুর রিয়াসাহ, আবু আব্দুল্লাহ আলক্বালয়ী ৯৫; উয়ূনুল আখবার; ইবনে কুতাইবা ১/৫৭

জুন ২০০৭

একটি ভয়াবহ চিন্তাগত ভুল

সংস্কৃতি সম্পর্কে কী ইসলামের কোনো নির্দেশনা নেই?

কিছু মানুষের মনে এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, ইসলাম সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু বলে নি। অথচ ইসলাম হল পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। ইসলামের রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি। তাই যারা ইসলামের কালেমা পড়েছে তাদের দ্বীন যেমন ইসলাম তেমনি ইসলামী সংস্কৃতিই হল তাদের সংস্কৃতি এ সংস্কৃতি ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় সংস্কৃতি তো দূরের কথা, কোনো অঞ্চল বা গোত্র-বংশ ভিত্তিক সংস্কৃতিও তাদের সংস্কৃতি হতে পারে না; তবে কোনো অঞ্চলের প্রচলিত কোনো মুবাহ বা উপকারী রীতি-নীতিকে ইসলাম কখনো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে না। এজন্য ইসলাম গ্রহণের পরও সেসব রীতি-নীতি অনুসরণ করতে বাধা নেই। আর এ জাতীয় বিষয়গুলো সংস্কৃতির প্রকৃত অনুষঙ্গও নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বাংলা ভাষায় কথা বলা, লুঙ্গি পড়া, ভাত-মাছ খাওয়া ইত্যাদিকে যদি বাঙালী সংস্কৃতির অংশ গণ্য করা হয় তবে যেহেতু এ জিনিসগুলো ইসলামী তাহযীবের পরিপন্থী কিছু নয় তাই ইসলাম গ্রহণের পর এগুলো পরিহার করতে হবে এমন কোনো কথা ইসলামে নেই। তবে বাৎসরিক উৎসবগুলো সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ সম্পর্কে ইসলামের একটি ভিন্ন দর্শন রয়েছে। এ বিষয়ক ইসলামী নির্দেশনাগুলো ইসলামের সেই দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَ هَذَا عِيْدُنَا

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেছিলেন তখন মদীনাবাসীর বাৎসরিক দুটো উৎসব ছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উৎসব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মদীনাবাসী উত্তরে বলল, এ দুটো উৎসব অনেক আগে থেকে আমাদের এ অঞ্চলে পালিত হয়ে আসছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ خَيْرًا مِّنْهَا، عِيْدَ الْفِطْرِ وَ عِيْدَ الْأَضْحٰى

আল্লাহ্ এ উৎসবের পরিবর্তে তোমাদেরকে উত্তম দুটো উৎসব দান করেছেন। তা হল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মদীনাবাসীকে একথা বলা হয় নি যে, ঠিক আছে ওই দুটো উৎসব হল তোমাদের দেশীয় বা গোত্রীয় উৎসব আর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা হল ইসলামী উৎসব। ওই দুটো হল মদীনার বা আউস-খাযরাজ গোত্রের সংস্কৃতি আর এই দুটো হল মদীনাবাসীর ইসলামী সংস্কৃতি। অতএব দুই বিবেচনায় দুই উৎসব পালিত হবে। এমন কথা রাসূলুল্লাহ বলেন নি; বরং স্পষ্ট করে বলেছেন যে, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে ওই দুটোর পরিবর্তে এই দুটো দান করেছেন।'

আজকাল একশ্রেণীর মানুষকে এই বিভ্রান্তি ছড়াতে দেখা যায় যে, অমুক উৎসব আমরা বাঙালী হিসেবে পালন করি আর অমুক উৎসব মুসলমান হিসেবে। বলাবাহুল্য, এটা একটা ভয়াবহ বিভ্রান্তি।

ইসলামের নীতি এই যে, মানুষ প্রথমে যে সংস্কৃতিরই থাকুক না কেন ইসলাম গ্রহণের পরে একমাত্র ইসলামী সংস্কৃতিই তার সংস্কৃতি। যারা মনে করে ইসলাম শুধু ধর্ম-কর্মের নাম আর সংস্কৃতি হল প্রত্যেক অঞ্চলভিত্তিক

নিজস্ব বিষয় ইসলামে এ বিষয় কোনো আদর্শ বা নির্দেশনা নেই তারা না ইসলামকে জানে আর না সংস্কৃতির অর্থ বুঝে।

একটি ভিত্তিহীন ধারণা

চাশতের নামায ছুটে গেলে কি মানুষ অন্ধ হয়ে যায়?

হাদীস শরীফে চাশতের নামায (সালাতুদ দুহা)-এর অনেক ফযীলত এসেছে। কেউ কেউ মনে করে থাকেন, চাশতের নামায হল আট রাকাত। তাই আট রাকাত পড়া ছাড়া চাশতের নামায হবে না। এ ধারণার কারণে তারা চাশতের নামায পড়ার হিম্মত করেন না। অথচ সঠিক কথা এই যে, নামাযের রাকাত-সংখ্যা নির্ধারিত নয়। কেউ যদি দুরাকাত পড়ে তাহলেও এই নফল নামাযটি আদায় হবে এবং এর সবচেয়ে বড় ফযীলতটি সে পেয়ে যাবে।

আরেকটি কথা মুহাদ্দিস যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. (মৃত্যু ৮০৬ হি.) লিখেছেন যে, সাধারণ মানুষের মাঝে একথাটি প্রচলিত রয়েছে যে, 'কেউ যদি চাশতের নামায পড়া আরম্ভ করে পরে তা ছেড়ে দেয় তাহলে সে অন্ধ হয়ে যাবে।' এ কথায় ভীত হয়ে অনেকে চাশতের নামায একেবারেই পড়ে না। অথচ সেই প্রচলিত কথাটি একটি ভিত্তিহীন কথা, শয়তানই মানুষের মনে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে যাতে মানুষ এই গুরুত্বপূর্ণ আমলের প্রভূত সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকে।

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. আরও লিখেছেন, উপরোক্ত ভিত্তিহীন কথাটির কারণে কোনো কোনো মহিলা এই ধারণা পোষণ করেন যে, চাশতের নামায শুধু বয়স্কা মহিলারাই পড়তে পারেন, যাদের মাসিক আসে না। কেননা যাদের মাসিক আসে তারা যেহেতু সেসময় কোনোরূপ নামাযই পড়তে পারে না তাই খোদা নাখাস্তা-তখন চাশতের নামায ছুটে যাওয়ার কারণে তারা অন্ধ হয়ে যেতে পারেন। -জমউল ওয়াসাইল ২/৯০

এ মূলনীতিটি ভালোভাবে মনে রাখা উচিত যে, নেক আমল যখন যতটুকু করা যায় ততটুকুই হল মহাসৌভাগ্য। তাই কোনো নফল নামায থেকে শুধু এই বাহানায় বিরত থাকা যে, আজ যদিও পড়তে পারি আগামীকাল তো পড়তে পারব না, একদিন পড়ে আর কী হবে? -এটা খুবই অন্যায় কাজ। বরং এটা এক ধরনের শয়তানী কুমন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নয়। এর দিকে ভ্রুক্ষেপ করার অর্থ হল নিজেকে বঞ্চিত করা।

ভুল মাসআলা

বিনা ওযুতে দরূদ পড়া কি জায়েয নয়?

কেউ কেউ মনে করেন, দরূদ শরীফ পড়তে হলে ওযু করা জরুরি। এই ধারণা ঠিক নয়। দরূদ শরীফ ওযু ছাড়াও পড়া যায়। তাই এ জাতীয় ভুল ধারণার ভিত্তিতে দরূদ পড়া থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। ওযু থাক বা না থাক সুযোগ হলেই দরূদ শরীফ পড়া উচিত। কুরআন মজীদ পড়ার জন্যও তো ওযু জরুরি নয় তবে তা স্পর্শ করার জন্য ওযু জরুরি। তবে গোসল ফরয অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা ও শোনাও জায়েয নয়। এজন্য কোনো ওজর ছাড়া এ অবস্থায় দীর্ঘ সময় থাকাও অনুচিত। খুব তাড়াতাড়ি গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা কাম্য।

জুলাই-২০০৭

চিন্তাগত ভুল

আদাব ও নফল বিষয়াদির জ্ঞানচর্চাও কি নফল?

শরীয়তের বিধানসমূহের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। কিছু বিষয় রয়েছে যা ফরজ ও ওয়াজিব, আর কিছু বিষয় রয়েছে যা নফল বা মুস্তাহাব পর্যায়ের। নফল বিষয়াদির মধ্যে কিছু রয়েছে যা স্বতন্ত্র আমল বা ইবাদত, যেমন নফল নামায, নফল রোযা ইত্যাদি। আবার কিছু রয়েছে যা ফরয বা ওয়াজিব আমলের অংশ যেমন ওযু, নামায ইত্যাদি আমলের আদব ও নফল পর্যায়ের কাজ সমূহ, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, আদব ও নফল শ্রেণীর বিষয়গুলো ব্যাপক অবহেলার শিকার। এর পিছনে যে মানসিকতা কার্যকর তা এই যে, এগুলো তো নফল কিংবা আদব। অর্থাৎ এগুলো ছেড়ে দিলে গোনাহ নেই। যখনই কোনো নফল আমলের ক্ষেত্র আসে কিংবা কোনো আদব পালন করার সুযোগ সৃষ্টি হয় তখন প্রথমে এই নেতিবাচক দিকটিই মনে আসে অথচ এখানে এভাবেও চিন্তা করা যেত যে, এ কাজে অনেক সাওয়াব ও অনেক উপকারিতা রয়েছে। নফল ও আদব পর্যায়ের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক চিন্তা পরিত্যাগ করে উপরোক্ত নেতিবাচক চিন্তা অবলম্বন করা মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়।

আমি এখানে যে ভুল চিন্তাটি সম্পর্কে বলতে চাই তা এই যে, অনেকে আদব ও নফল বিষয়ের প্রচার-প্রসার এবং নিজের অধীন লোকদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের কাজটিকেও একটি নফল কাজ মনে করেন। ফলে

কোনো মুরব্বী যদি এ বিষয়ে তাগিদ করেন তাহলে একে 'বাড়াবাড়ি' বলে গণ্য করেন। মনে রাখা উচিত যে, এই চিন্তা ভুল। সঠিক কথা এই যে, আদব ও নফল শ্রেণীর বিষয়াদির পঠন-পাঠন এবং ইসলাহ-তরিবয়ত, দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে এর চর্চা ও প্রচার-প্রসার করা ফরযে কিফায়া। দলীলের নিরিখে এ বিষয়টি স্পষ্ট। ফিকহে হানাফীর তৃতীয় ইমাম-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশাইবানী রহ. 'কিতাবুল কাস্ব'-এ বিষয়টি পরিষ্কার বলেছেন। মূল কিতাবে এবং শামসুল আইম্মা সারাখসী রাযি.-এর ভাষ্যগ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক দলীল উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন-কিতাবুল কাস্ব, তাহকীক শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ পৃ. ১৫৯-১৬০ আলমাবসূত, সারাখসী ৩০-২৬৩

ভুল আমল

জায়নামাযের দুআ!

মক্তবের 'কাওয়াদে বোগদাদী'তে জায়নামাযের দুআ শিরোনামে নিম্নোক্ত দুআটি লেখা রয়েছে,

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ...

এই দুআ সম্পর্কে অনেকের এই ধারণা রয়েছে যে, জায়নামাজে দাঁড়ানোর পর তাকবীরে তাহরীমা বলার আগে দুআটি পড়তে হয় এবং তা পড়া সুন্নত বা নফল।

এটি একটি প্রসিদ্ধ ভুল মাসআলা। হাদীস শরীফে জায়নামাজের দুআ নামে কোনো দুআ নেই। কোনো নির্ভরযোগ্য ফিকহ-ফতোয়ার কিতাবেও এই মাসআলা লেখা নেই যে, তাকবীরে তাহরীমার আগে এই দুআ পড়তে হবে; বরং ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব 'হিদায়া'তে লেখা আছে যে, তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে এই দুআ পড়বে না।

তাকবীরে তাহরীমার পরে প্রথম কাজ হল ছানা পড়া। হাদীস শরীফে বিভিন্ন ছানা এসেছে। এগুলোর মধ্যে "সুবহানাকাল্লাহুম্মা" ছানাটিই বেশ প্রসিদ্ধ এবং একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো তাহাজ্জুদ নামাযে ছানা হিসেবে

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ ...

দুআটি পড়তেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৭১) অন্যান্য রেওয়ায়াত থেকেও বিষয়টি জানা যায়। তাহলে বোঝা গেল, উপরোক্ত দুআ তাকবীরে তাহরীমার আগে নয়; বরং তাকবীরে তাহরীমার পরে পড়ার দুআ আর তাও মাঝে মধ্যে, তাহাজ্জুদ নামাযে।

ইতিহাসের ভুল

হাসান বসরী রহ. কি সাহাবী ছিলেন?

হাসান বসরী রহ.-এর সম্পর্কে কোনো কোনো আম মানুষ এই ধারণা পোষণ করেন যে, তিনি সাহাবী ছিলেন। 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' বইয়ে লেখা আছে যে, হাসান বসরী রহ. (যিনি ইল্‌মে ফিকহ, ইল্‌মে হাদীস, ইল্‌মে তাফসীর ছাড়াও ইসলাহ ও তরবিয়তের ক্ষেত্রেও অনেক বড় ইমাম ছিলেন। তাসাউফের শাজারার কারণে তিনি সাধারণ লোক সমাজেও বেশ প্রসিদ্ধ) তিনি নাকি সাহাবী ছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসের সামান্য ধারণা আছে এমন যে কোনো মানুষই জানেন যে, এটি একটি অলীক ধারণা। হাসান বসরী রহ. সাহাবী নন, তিনি একজন তাবেয়ী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নয়, উমর ফারুক রাযি.-এর খিলাফতের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তৃতীয় খলীফা উসমান রাযি.-এর শাহাদাতের সময় (৩৫হি.) তাঁর বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর। এই ঐতিহাসিক তথ্যাদির বিচারে উপরোক্ত ধারণার কোনো ভিত্তিই থাকে না। এজন্য তাযকিরাতুল আউলিয়া কিংবা এ জাতীয় বইপত্রে এ বিষয়ে যত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে সব মওযু ও ভিত্তিহীন।

–সিয়ারু আলামিন নুবালা; তাহযীবুল কামাল; তবাকাতে ইবনে সা'দ; আলী ইবনু আবী তালিব ইমামূল আরিফীন, আহমদ ইবনুস সিদ্দীক আলগুমারী; আল মুরসালুল খাফী ওয়া আলাকাতুহু বিত তাদলীস ড. শরীফ হাতিম আউনী ১/২৬৩-২৬৮; আল মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক খতীব বাগদাদী পৃষ্ঠা নং ৩৪৪

ভুল মাসআলা

মহিলারা নামাযে বিলম্ব করা।

কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, ফরয নামাযের সময় হয়ে যাওয়ার পরও মহিলারা নামায আদায় করতে দেরি করেন। কারণ, পুরুষরা এখনো মসজিদ থেকে নামায পড়ে ফিরে আসে নি বা মসজিদের জামাত শেষ

হয় নি। তাদের ধারণা, পুরুষের নামায শেষ হওয়ার পর মহিলাদের নামাযের সময় হয়। যেন এটি শরীয়তের একটি মাসআলা। এ বিষয়টি ঠিক নয়। পুরুষ যেমন নামাযের সময় হওয়া মাত্র নামায পড়তে পারে তেমনি মহিলারাও পড়তে পারবে। পুরুষরা মসজিদ থেকে ফিরে নি এই ওযুহাতে নামাযের মুস্তাহাব সময় শেষ হতে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়।
জুমার দিনের ব্যাপারেও একই কথা। অর্থাৎ সেদিন মহিলাদের জোহরের নামায পড়ার জন্য পুরুষদের জুমা পড়ে ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে না। সময় হওয়ার পর মহিলারা নামায আদায় করতে পারবেন।

আগস্ট ২০০৭

ভুল বিশ্বাস

মিরাজের উদ্দেশ্য কী ছিল?

মিরাজের আলোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ স্পষ্টভাবে কিংবা ইশারা ইঙ্গিতে এমন সব কথা বলে থাকেন যা থেকে বোঝা যায় যে, তাদের ধারণায় মিরাজের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্র ঘরে মেহমান হিসাবে দাওয়াত দেওয়া। অথচ আল্লাহ্ তাআলার ঘর-বাড়ি প্রয়োজন হয় না। স্থান ও কাল তাঁরই সৃষ্টি, তিনি স্থান ও কালের গণ্ডির উর্ধ্বে।
কুরআন কারীমে সূরা ইসরা ও সূরা নাজমে মিরাজের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। তা হল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উর্ধ্ব-জগতের সফর করানো এবং আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের বড় বড় অনেক নিদর্শন তাঁকে দেখানো।

কুসংস্কার

রাতে সুঁই বিক্রি করা কি অশুভ?

দু'তিন দিন আগের ঘটনা। ঢাকা শহরের কথা। আমাদের এক দোস্ত রাতে দোকানে গিয়েছিলেন সুঁই কিনতে। দোকানে একজন তরুণ ও একজন বৃদ্ধ ছিলেন। সুঁই আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হলে তরুণ ছেলেটি ইতস্তত করতে লাগল এবং বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, সুঁই চাচ্ছে, এখন কি সুঁই দেওয়া যাবে? আল্লাহ্র শোকর বৃদ্ধ মানুষটি বললেন, কেন, অসুবিধা কি? রাতে সুঁই বিক্রি করা যাবে না– এগুলো হল সব কুসংস্কার।

আল্লাহ্ তাআলাই ভালো জানেন, এসব ধারণা আমাদের সমাজে কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে! এগুলো মানুষের মনে এমনই বদ্ধমূল হয়েছে যে, তারা এগুলোকে এক ধরনের 'আকীদা' বানিয়ে নিয়েছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, ইসলামী বিশুদ্ধ আকীদাগুলোর উল্লেখযোগ্য প্রভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখা না গেলেও এই সব 'আকীদা'র বেশ গভীর প্রভাব তাদের কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়!

এ ধরনের অলীক ধারণার কোনো সীমা-সংখ্যা নেই। আমার ধারণা ছিল যে, শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ এ জাতীয় ধারণার বশবর্তী হন না, কিন্তু উপরোক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, শহরের অনেক শিক্ষিত মানুষও এ জাতীয় অলীক ধারণা পোষণ করে থাকেন।

তাই এ জাতীয় বিষয়গুলোও আলোচনায় আসা উচিত, যদিও এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই হল বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক কুসংস্কার, যা শুধু ওই অঞ্চলের লোকদের মধ্যেই পাওয়া যায়, অন্য অঞ্চলের লোকদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আবার কিছু কুসংস্কার আছে যা বিশেষ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পাওয়া যায়, অন্য শ্রেণীর মধ্যে পাওয়া যায় না।

একটি অবিশ্বাস্য ভুল মাসআলা

স্বামীর নাম মুখে নিলে কী স্ত্রী তালাক হয়ে যায়?

কোনো কোনো অঞ্চলের মহিলাদের সম্পর্কে এই আশ্চর্য কথা শোনা যায় যে তারা স্বামীর নাম মুখে নেওয়াকে এমন অপরাধ মনে করে যে, এতে স্ত্রী তালাক হয়ে যায়! কথাটা যতই আশ্চর্যজনক মনে হোক, কারও মনে এমন ধারণা থাকা- আমাদের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে, মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। দ্বীনী ইল্মের চর্চা ব্যাপকভাবে না থাকলে স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের মাঝে এ ধরনের ধারণা সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়।

স্বামীর সম্মান করা স্ত্রীর জন্য জরুরি। স্বামীকে নাম ধরে ডাকাও বেআদবী। তবে স্বামীকে নাম ধরে ডাকলে কিংবা স্বামীর নাম মুখে নিলে স্ত্রী তালাক হয়ে যায়- এ কথা একেবারেই ভিত্তিহীন।

হাদীস নয়

ওযুতে কি প্রত্যেক অঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুআ রয়েছে?

ওযুর সময়ের ও ওযুর পরে বিভিন্ন দুআ সহীহ হাদীসে এসেছে, যা প্রসিদ্ধ ও সকলেরই জানা রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো অযীফার বইয়ে প্রত্যেক

অঙ্গ ধোয়ার যে ভিন্ন ভিন্ন দুআ বিদ্যমান রয়েছে তা কোনো নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এজন্য এই দুআগুলোকে 'মাছুর' ও 'মাসনূন' দুআ মনে করা ভুল। তবে দুআগুলোর অর্থ যেহেতু ভালো তাই কেউ যদি শুধু দুআ হিসেবে ওযুর সময় কিংবা অন্য কোনো সময় অর্থের দিকে খেয়াল করে পড়ে তবে তা নাজায়েযও হবে না।

তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এগুলোকে হাদীসের দুআ মনে করা কিংবা ওযুর মাসনূন দুআ মনে করা ভুল। -আলআযকার, নববী, আল ফুতূহাতুর রাব্বানিয়্যাহ শরহুল আযকারিন নাবাবিয়্যাহ, ইবনে আল্লান ২/২৭-৩০, আততালখীসুল হাবীর ১/১০০; আসিয়ায়াহ ফী কাশফি মা ফী শরহিল বিকায়াহ ১/১৮১-১৮৩

ভুল ধারণা

সন্তান মারা গেলে মা আছরের পর খেতে পারেন না!

কিছুদিন আগে শুনলাম, কোনো কোনো অঞ্চলে নাকি একথাও প্রচলিত আছে যে, কোনো মহিলার সন্তান মারা গেলে তিনি চল্লিশ দিন আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কোনো খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করতে পারবেন না। চা-নাস্তা বা পান-সুপারীও খেতে পারবেন না। এটা নাকি গোনাহর কাজ এবং এরূপ করলে ভবিষ্যতে তার সন্তান হবে না।

বালাবাহুল্য, এটি একটি ভিত্তিহীন ধারণা। এর না কোনো দ্বীনী ভিত্তি আছে, না দুনিয়াবী। এটা একটা মূর্খতাপ্রসূত কুসংস্কার। তাছাড়া উপরোক্ত সময়ে পানাহার করলে ভবিষ্যতে সন্তান হয় না- এরকম অমূলক ধারণাও প্রচলিত আছে। এটা যে একটা অবাস্তব কথা তা একেবারেই পরিষ্কার। কেননা অনেক মা রয়েছেন যাদের সন্তান মারা গেছে এবং তারা ওই নিয়ম মেনে চলা তো দূরের কথা তার কল্পনাও কখনও করেন নি। বিকালে হালকা চা-নাস্তা খাওয়ার অভ্যাস বজায় রেখেছেন। অথচ আল্লাহ্ তাদেরকে সন্তান দিয়েছেন। এসব অমূলক ধারণা থেকে মুক্ত থাকা জরুরি।

নভেম্বর ২০০৭

ভুল মাসআলা

রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কি সাহরী খাওয়া অপরিহার্য?

এবার রামাযানের শেষ জুমা ছিল উনত্রিশে রমযান। জুমার জন্য যাচ্ছিলাম। সিএনজির চালক জিজ্ঞাসা করল, 'রাতে শোবার সময় রোযার নিয়ত ছিল, কিন্তু সাহরীর সময় ঘুম ভাঙ্গল না। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন সকাল হয়ে

গিয়েছে। সাহরী খেতে পারি নি। আমি ইস্তিগফার পড়েছি। এরপর রোযার নিয়ত করেছি। আমার রোযা কি হয়েছে?'

আরো মানুষকেও এমন সন্দেহ করতে দেখেছি। তারা যেন রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাহরী খাওয়া অপরিহার্য মনে করেন। অথচ মাসআলা এমন নয়। রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত করা জরুরি, সাহরী খাওয়া জরুরি নয়। অতএব, ঘুম বা অন্য কোনো কারণে কেউ যদি সাহরী খেতে না পারে কিংবা কোনো কারণ ছাড়াই সাহরী না খেয়ে থাকে, কিন্তু সে রাতে বা সকালে রোযার নিয়ত করেছে তবে তার রোযা শুদ্ধ হবে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, সাহরী খাওয়া সুন্নত এবং অত্যন্ত বরকতের বিষয়। হাদীস শরীফে সাহরী খাওয়ার জন্য এক রকম তাকীদই করা হয়েছে। এজন্য বিনা কারণে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। সামান্য পরিমাণে হলেও কিংবা স্বাভাবিক খাবারের বাইরে অন্য কোনো সংক্ষিপ্ত খাবার দ্বারা হলেও সাহরী খাওয়া উচিত।

ভুল ধারণা

২৭-এর রাত্রিই কি শবে কদর?

অনেকের মনে এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, সাতাশের রাতই হচ্ছে শবে কদর। এই ধারণা ঠিক নয়। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাইলাতুল কদর কোন রাত তা জানানো হয়েছিল। তিনি তা সাহাবীদেরকে জানানোর জন্য আসছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেখানে দুই ব্যক্তি ঝগড়া করছিল। তাদের ওই ঝগড়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে সে রাতের ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হয়। একথাগুলো সাহাবীদেরকে জানানোর পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হতে পারে, এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এখন তোমরা এ রাত (অর্থাৎ তার বরকত ও ফযীলত) রমাযানের শেষ দশকে অন্বেষণ কর।) –সহীহ বুখারী হাদীস নং ২০২০, সহীহ মুসলিম ১১৬৫/২০৯

অন্য হাদীসে বিশেষভাবে বেজোড় রাতগুলোতে তালাশ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। –মুসনাদে আহমদ

তাই সাতাশের রাতকেই সুনির্দিষ্টভাবে লাইলাতুল কদর বলা উচিত নয়। খুব বেশি হলে এটুকু বলা যায় যে, এ রাতে লাইলাতুল কদর হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, আজকাল আমাদের সমাজে এক আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তা এই যে, রমাযানের শুরুতে মানুষ আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে দলে দলে মসজিদে এসে থাকে। এটা অত্যন্ত ভালো দিক। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে মুসল্লী-সংখ্যা ততই হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি শেষ দশকের মুসল্লী সংখ্যা প্রায় অন্যান্য মাসের মতোই হয়ে যায়। এটা খুবই আফসোসের বিষয় রমাযানের প্রথম দিকে যে আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিল শেষ দিকে তা আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কেননা, রমাযানের শেষ দশকের ফযীলতই সবচেয়ে বেশি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস এই ছিল যে, শেষ দশকে তিনি পুরো রাত জাগতেন, পরিবারের লোকদেরকে জাগিয়ে দিতেন এবং ইবাদাতের জন্য কোমর বেঁধে নিতেন। -সহীহ মুসলিম

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَحْيَا لَيْلَهُ وَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ وَ شَدَّ مِئْزَرَهُ

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেছে যে, রমাযানের প্রথম দিকে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার যে উৎসাহ-উদ্দীপনা, তা অত্যন্ত মুবারক বিষয়, এটা মোটেই নিন্দার বিষয় নয়, নিন্দার বিষয় হলো ধীরে ধীরে তা হ্রাস পেতে থাকা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হিফাযত করুন।

আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা এটাও শুধু রমযান মাসের ফরজ নয়, তদ্রুপ জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করার বিধানও রমাযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা সারা বছরের বিধান। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইতিহাস বিষয়ক একটি ভুল

ফিরাউন কোথায় নিমজ্জিত হয়েছিল?

কারো কারো মুখে শোনা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা যে জলভাগ দিয়ে মুসা আ. ও তাঁর সাহাবীদেরকে কুদরতীভাবে পার করেছিলেন আর ফিরাউনকে ও তার দলবলকে নিমজ্জিত করেছিলেন তা হচ্ছে নীলনদ। এই ধারণা ঠিক নয়। যেহেতু নীলনদ মিসরের নদী আর ফিরাউন ছিল মিসরের অধিপতি, সম্ভবত এজন্যই এ কথা অনেকের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ফলে এই ভুল ধারণা ব্যাপকতা লাভ করেছে। সঠিক তথ্য হচ্ছে, ফেরাউন যে স্থানে নিমজ্জিত হয়েছে তা হচ্ছে লোহিত সাগরের উত্তরের অংশ। মিসরে পূর্বে যেখানে সুয়েজ খাল খনন করা হয়েছে তার সঙ্গে সংলগ্ন দক্ষিণে

সমুদ্রে দুইটি মাথা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের আলোচিত স্থান হচ্ছে পশ্চিমের মাথা। (এ স্থান বর্তমানে সুয়েজ উপসাগর নামে পরিচিত)
হযরত মুসা আ. যখন আল্লাহ্ তাআলার আদেশে মজলুম বনী ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে রাতের বেলা এখানে পৌঁছলেন এবং সঙ্গের লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করলেন তখন সমুদ্র যেন তার জন্য পথ করে দিল। পানি উঁচু টিলার মত দুই পাশে স্থির হয়ে গেল আর তিনি শুকনা রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হলেন। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মুসা আ. ও তাঁর সঙ্গীরা সীনা উপদ্বীপে উপনীত হয়েছিলেন। এদিকে ফিরাউন যখন তার বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সে রাস্তা অতিক্রম করতে চাইল তখন আল্লাহ্ তাআলা উভয় পার্শ্ব থেকে পানিকে মিলিত হওয়ার আদেশ দিলেন। ফলে তারা সবাই নিমজ্জিত হয়ে জাহান্নাম-রসীদ হল।
মুসা আ. সে সময় মিসর থেকে সীনা উপদ্বীপে পৌঁছেছিলেন তা একটি স্বীকৃত বিষয়। মিসর থেকে সীনা যাওয়ার পথে যে জলভাগ রয়েছে তা হচ্ছে লোহিত সাগর, নীলনদের প্রশ্ন এখানে অবান্তর।
(আরদুল কুরআন, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, পৃষ্ঠা নং ১৮-১৯, কাসাসুল কুরআন, মাওলানা হিফজুর রহমান এবং অন্যান্য সূত্র।)

জানুয়ারি ২০০৮

ভুল চিন্তা

হজ্ব কি একটি বৈশ্বিক সম্মেলন মাত্র?

হজ্বের বিভিন্ন উপকারিতা আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. লেখেন, 'হজ্বকে কেন্দ্র করে গোটা ইসলামী বিশ্বের মুসলিম জনতা মক্কা নগরীতে একত্র হয়ে থাকেন। এটি পরস্পর পরিচিত হওয়ার এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে মত বিনিময় করার ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। তবে এটা হজ্বের তাৎপর্য নয় এবং সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ও উপকারিতাও নয়, অথচ সমসাময়িক কিছু কিছু লেখকের আলোচনা থেকে তা-ই অনুমিত হয়। তদ্রূপ হজ্ব কোনো রাজনৈতিক কনফারেন্স নয়। অথচ হজ্ব সম্পর্কে এমন ধারণা দিতে দেখা যায় বর্তমান সময়ের অনেক চিন্তাবিদ, রাজনীতিক ও মুসলিম লিডারদের।
যদি হজ্বের তাৎপর্য এটাই হত তবে হজ্বের কাজকর্মগুলোর ধরনই ভিন্ন হত। তখন স্থিরতা ও এক জায়গায় দীর্ঘসময় অবস্থানকে গুরুত্ব দেওয়া

হত, যাতে চিন্তা-ভাবনা, পড়াশোনা, পরস্পর মতবিনিময় এবং আলোচনা-পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অথচ হজ্বের প্রকৃতিই হচ্ছে গতিময়তা এবং অবিরাম স্থানত্যাগ। বলাবাহুল্য, এটা উপরোক্ত উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। তাছাড়া তখন হজ্বের দাওয়াত সীমাবদ্ধ থাকত আলিম-উলামা, চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট লোকদের মধ্যেই। অথচ বিষয়টি এমন নয়। আলিম-জাহিল, বিশিষ্ট-সাধারণ সবার জন্যই হজ্ব ফরজ, যদি সে সামর্থ্যবান হয়ে থাকে। কুরআন মজীদে এসেছে–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا

'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ্ব করা তার অবশ্য কর্তব্য।' –সূরা আল ইমরান : ৯৭

তাই উপরোক্ত বিষয়গুলো হজ্বের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উপকারিতা বলে গণ্য হতে পারে, একমাত্র লক্ষ্য ও মূল তাৎপর্য হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না।
–আরকানে আরবাআ পৃষ্ঠা ৩২৭-৩২৮ টীকা

ভুল মাসআলা

খুতবার শুরুতে কি আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয়?

এক মসজিদে দেখা গেল, খুতবার শুরুতে খতীব সাহেব জোরে আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ পড়লেন। হয়ত তিনি ভেবেছেন, খুতবা যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল তাই তা বরকতপূর্ণ করার জন্য আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করা উচিত। এ ধারণা ঠিক নয়। এ বিষয়ে সঠিক কথা এই যে, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ্ তায়ালার কোনো না কোনো যিক্‌রের মাধ্যমে আরম্ভ করা উচিত। যে আমলের জন্য শরীয়ত যে যিক্‌র নির্দেশ করেছে সে আমল ঐ যিক্‌রের মাধ্যমেই শুরু করা উচিত। যেমন নামায শুরু হয় তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা, হজ্ব শুরু হয় তালবিয়া-লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক... দ্বারা, কুরআন তেলাওয়াত আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ দ্বারা, চিঠিপত্র শুধু বিসমিল্লাহ দ্বারা ইত্যাদি।

খুতবা 'আলহামদুলিল্লাহ' দ্বারা শুরু করা মাসনূন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আলহামদুলিল্লাহ্ দ্বারা খুতবা শুরু করতেন। সাহাবায়ে কেরামের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এভাবেই খুতবা দেওয়া হয়েছে। এজন্য খুতবার শুরুতে আউযুবিল্লাহ্ বিসমিল্লাহ্ পড়ার রেওয়াজ সঠিক নয়।

ভুল ধারণা

ইফতারের ওয়াক্ত কি আযান শুরু হওয়ার পর হয়?

কিছুদিন আগে একজন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে এক জায়গায় গিয়েছিলাম। তিনি শাওয়ালের রোযা রেখেছিলেন। সূর্যাস্তের র্নিধারিত সময়েরও কিছু পরে তিনি সংক্ষিপ্ত ইফতার করলেন। ইফতারের পর মাগরিবের আযান শোনা গেল। তখন উপস্থিত কেউ কেউ বলে উঠলেন, আপনি তো আযান হওয়ার আগেই ইফতার করলেন!

অনেক ামেয় বেখেয়ালীর কারণে মানুষ এ ধরনের ভুল ধারণায় পড়ে যায়। না হয় সবারই জানা আছে যে, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে যায়, সেই সাথে ইফতারেরও। সূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোযাদার ইফতার করবে এবং মুয়াজ্জিন আযান দিবে। ইফতারের ওয়াক্ত আযান শুরু হওয়ার পর হয় বিষয়টি এমন নয়।

আমাদের দেশে রেওয়াজ আছে যে, লোকেরা ইফতার সামনে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে এবং আযানের শব্দ শোনার আগ পর্যন্ত ইফতার করে না। এ থেকে কারো কারো মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, ইফতারের ওয়াক্তই শুরু হয় আযানের পর। এই ধারণা ঠিক নয়। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ইফতারের ওয়াক্ত হয়। আর বিনা কারণে ইফতার বিলম্ব করা খেলাফে সুন্নত। ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা উচিত।

হাদীস নয়

চল্লিশ বছরের আমল বিনষ্ট হবে

কিছুদিন আগে এক ভাই ফোন করে বললেন, একজন তাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে শুনিয়েছেন যে, পাঁচ কাজ এমন রয়েছে যেখানে দুনিয়াবী কথা বললে চল্লিশ বছরের ইবাদত নষ্ট হয়। আযান, ওযু ও যিয়ারতের সময় দুনিয়াবী কথা বললে এবং মসজিদে বসে দুনিয়াবী কথা বললে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পঞ্চম কাজ কী? তিনি বললেন, ভুলে গেছি!

সত্যি বলতে কি, এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা আগাগোড়াই ভুলে যাওয়া ভালো। মওযু বর্ণনা বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে এ পর্যন্ত শুধু মসজিদে কথা বলার বিষয়ে ওই কথা পাওয়া যেত। এখন দেখা গেল, এর সঙ্গে কেউ আরো চারটি বিষয় যুক্ত করেছে।

মনে রাখতে হবে, এ ধরনের বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই। একে হাদীস মনে করা অনেক বড় গোনাহ।

এটা ঠিক যে, ওযুর সময় বিনা প্রয়োজনে কথাবার্তা না বলাই ভালো। এ সময় দৈহিক পবিত্রতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক পবিত্রতার নিয়তে আল্লাহ্‌র দিকে মন নিবিষ্ট রাখা কর্তব্য। তদ্রূপ যিয়ারতের সময় আখেরাতের ধ্যান-খেয়াল মনে রাখা উচিত। অনর্থক কথাবার্তা যদি বলতেই হয় তাহলে আর এখানে আসা কেন?

আযানের সময়ও একাগ্রতার সঙ্গে আযানের জবাব দেওয়া উচিত। আর মসজিদে মশগুল থাকবে যিকর-ফিকিরে। এ মূল্যবান সময়গুলো অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবী কথাবার্তায় ব্যয় করা উচিত নয়। তবে কেউ যদি প্রয়োজনে কিংবা বিনা প্রয়োজনে কোনো দুনিয়াবী কথা বলে ফেলে তাহলে তার কৃত ইবাদত, এমনকি চল্লিশ বছরের ইবাদত বিনষ্ট হবে–এটা একেবারেই ভিত্তিহীন বানানো কথা।

ফেব্রুয়ারি-২০০৮

ভুল ধারণা

মিনার তিনটি 'জামরা' কি তিন শয়তান?

অনেক মানুষ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, তিন 'জামরা' হল তিন শয়তান। কিংবা প্রত্যেক জামরার সাথে একটি করে শয়তান বাধা আছে। বরং কিছু মানুষকে এমনও বলতে শোনা যায় যে, প্রথমটি হচ্ছে বড় শয়তান। তার পরেরটা মেঝ শয়তান। তার পরেরটা ছোট শয়তান।

জেনে রাখুন, এ জাতীয় ধারণা পোষণ বা নামকরণ কোনোটাই সহীহ নয়। আসলে 'জামারাত' আরবী 'জামরাতুন' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে ছোট ছোট কংকর বা নুড়ি পাথর। যেহেতু এই সকল স্থানে ছোট ছোট কংকর নিক্ষেপ করা হয় এজন্য এগুলোকে 'জামারাত'বলে।

এই নুড়ি বা কংকর নিক্ষেপের প্রেক্ষাপট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.–এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। হযরত ইব্রাহীম আ. যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালানার্থে হযরত ইসমাঈল আ.-কে কুরবানী করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শয়তান তিনবার তাকে ফিরানোর চেষ্টা করেছিল। আর তিনবারই ইব্রাহীম আ. তাকে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করে প্রতিহত করেছিলেন। অবশেষে তিনি এই মহা পরীক্ষায় কামিয়াব হয়েছেন। যে

তিনস্থানে ইবলিস তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সেই তিনস্থান নিশানার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে সেখানে একটি করে খুঁটি স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে যে খুঁটিটি মক্কার সিমানার একেবারেই নিকটবর্তী এবং মসজিদে খাইফ থেকে দুরে অবস্থিত সেটাকে 'আলজামরাতুল কুবরা' বা 'জামরাতুল আকাবা' বলে। এর পরেরটিকে 'আলজামরাতুল উসতা' এবং এর পরেরটিকে 'আলজামরাতুল উলা' বা 'আলজামরাতুদ দুনইয়া' (নিকটতম জামরা) বলে। হযরত ইব্রাহীম আ. সরাসরি শয়তানকেই কংকর মেরেছিলেন।

আজ তার অনুসরণে ওই সকল স্থানে কংকর নিক্ষেপ করা হয় যেখানে যেখানে শয়তান তাঁকে বাধা দিয়েছিল আর তিনি কংকর মেরে শয়তানকে প্রতিহত করেছিলেন। আমাদের কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হল মিল্লাতে হানীফ (মিল্লাতে তাওহীদ) এর ইমাম হযরত ইব্রাহীম আ.-এর অনুকরণ এবং তাঁর কাজের হুবহু অনুকরণ। এই জযবা ও অনুভূতি নিয়ে যে, আশেকীন ও মুহিব্বীনের অনুকরণের মাঝে এমন শক্তি ও প্রভাব রয়েছে যে, যারা তাঁদের অনুকরণ করবে তাদের মাঝেও আল্লাহ্র ভালোবাসা ও মুহাব্বত সৃষ্টি হবে এবং এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকেও জীবনের প্রতিটি ধাপে প্রতিটি বাকে শয়তানের মুকাবেলা করার এবং তাতে কামিয়াব হওয়ার তাওফীক দান করেন।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, ওই সকল স্থানে খুঁটির আকৃতিতে শয়তানও থাকে না বা ওই সকল খুঁটির সাথে শয়তানকে বেঁধেও রাখা হয় নি। কিন্তু যদি আল্লাহ্ তাআলার বড়ত্বের প্রতি বিশ্বাস রেখে চিরশত্রু শয়তানের বিরোধিতা করার সংকল্প নিয়ে জবানে আল্লাহ্ তাআলার তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহু আকবার বলে কংকর নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সেটা হবে শয়তানের মুখে কালি মেখে তাকে অপদস্থ করা। এর দ্বারা শয়তানের কোমর ভেঙ্গে যায় এবং সে হতাশ হয়। তবে শয়তানকে জুতা ছুড়ে মেরে বা তাকে গালি দেয়ার মাধ্যমে নয়, বরং আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার মাধ্যমে ও তাকে চিরশত্রু ভেবে তার বিরোধিতা করা ও সুন্নত অনুসারে ওই সকল স্থানে কংকর নিক্ষেপ করার দ্বারাই সে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়।

আর বিশেষ করে কংকর নিক্ষেপের কাজ যদি সুন্নত মোতাবেক করা হয় তাহলে সেটা হয় শয়তানের জন্য সবচেয়ে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার কারণ।

এই কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে যে যত বেশি আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ও আনুগত্যের প্রেরণা আর মুহাব্বত অন্তরে পোষণ করবে এবং যত বেশি শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জযবা ও ইচ্ছা রাখবে সেটা শয়তানের জন্য তত বেশি লাঞ্ছনা ও আক্ষেপের কারণ হবে।

মোটকথা, মিনার 'জামারাত' শয়তান নয় এবং শয়তান সেখানে খুঁটি আকৃতিতে উপস্থিতও নয় আর শয়তানকে সেখানে বেঁধেও রাখা হয় নি। বরং আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পালনার্থে সেখানে কংকর নিক্ষেপ করা হয়। আল্লাহ্ তায়ালার এই নির্দেশের মাঝে অনেক হিকমত নিহিত রয়েছে। একটি বড় হিকমত হল আল্লাহ্‌র স্মর তাজা করা। তাঁর জিকির জিন্দা করা ও শয়তানকে অপদস্থ করে তার বিরোধিতায় পূর্ণ উজ্জীবিত হওয়া। আর এর প্রেক্ষাপট হল হযরত ইব্রাহীম আ.-এর ওই ঘটনা যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। (শুআবুল ঈমান)

ভুল প্রচলন

তাওয়াফের সাত চক্করের জন্য কী আলাদা আলাদা দুআ রয়েছে?

হজ্বের সময় প্রতিবছর অনেক মানুষকে দেখা যায়; মাতাফে তাওয়াফ করার সময় হাতে পুস্তিকা নিয়ে তাতে লেখা তাওয়াফের প্রতি চক্করের নির্দিষ্ট দুআ জোরে জোরে পড়তে থাকে। অনেক মানুষ অশুদ্ধভাবেও পড়ে। আর অধিকাংশ মানুষ অর্থ ও মর্ম না বুঝে শুধু মৌখিকভাবে উচ্চারণ করতে থাকে। বহু মানুষ এমনও আছেন, যারা মুখস্ত বা পুস্তিকা দেখে কোনোভাবেই তা পড়তে পারেন না। তারা শুধু এই দুআগুলো পড়ার জন্য দলবেঁধে এমন কারো সঙ্গে তাওয়াফ করেন যিনি পুস্তিকা দেখে অশুদ্ধভাবে হলেও ওই দুআগুলো পড়তে পারেন। তিনি উচ্চস্বরে দুআগুলো পড়েন। আর অন্যরা যদ্দূর সম্ভব তার অনুকরণের চেষ্টা করেন।

এতখানি শ্রমস্বীকারের পিছনে তাদের এই ধারণা কাজ করে যে, তাওয়াফের প্রতি চক্করে শরীয়তের পক্ষ থেকে ভিন্ন দুআ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। যা পড়া জরুরি কিংবা গুরুত্বের সঙ্গে পড়া উচিত। আর এতে বিশেষ ছাওয়াব ও উপকারিতা রয়েছে।

এ ধারণা ঠিক নয়। বিভিন্ন লিফলেট বা পুস্তিকায় তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের সময় পড়ার জন্য বা যেসব দুআ লিখিত আছে সেগুলোর শব্দ ও অর্থ সঠিক হোক বা ভুল হোক, দুআগুলো কুরআন-হাদীসের দুআ হোক বা

অন্য কারো বানানো হোক, সেগুলো তাওয়াফের দুআ নয়। অর্থাৎ ওই বিশেষ দুআগুলো তাওয়াফের সময় পড়া সুন্নতও নয়, মুস্তাহাবও নয়। তাওয়াফের সময় পড়ার জন্য যে দু-একটি দুআ হাদীস শরীফে এসেছে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। যেমন

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

এই কুরআনী দুআ গোটা তওয়াফেই করা যায়। বিশেষ করে রুকনে ইয়ামানী ও হজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দুআ করা উচিত। এছাড়া যে দুআ মুখস্থ থাকে তা তাওয়াফের সময় পাঠ করা যায়। তদ্রূপ অন্তরে যে হাজত থাকে তা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা হয়। এটাই আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয়– বান্দা যে ভাষাতেই তা প্রার্থনা করুক না কেন।

কত ভালো হত, যদি আমাদের হাজী ছাহেবান এই মাসাইল ভালোভাবে অনুধাবন করতেন এবং সে মোতাবেক আমল করতেন! তাহলে তাওয়াফের সময় এই দলবদ্ধতার কারণে অন্য হাজীদেরও কষ্ট হত না আর তাদের উচ্চ আওয়াজে অন্যদের মনসংযোগে কোনো প্রকার ব্যাঘাত ঘটত না।

মার্চ-২০০৮

একটি ভিত্তিহীন রসম

আখেরী চাহার শোম্বা কী উদযাপনের দিবস?

সর্বপ্রথম একটি দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, বহু মানুষ সফর মাসের শেষ বুধবারকে একটি বিশেষ দিবস গণ্য করে এবং এতে বিশেষ আমল রয়েছে বলে মনে করে। পরে মনে হল, এ ধরনের ভিত্তিহীন রসম-রেওয়াজের উল্লেখ 'মকসুদুল মোমেনীন' জাতীয় পুস্তক-পুস্তিকায় থাকতে পারে। দেখলাম, 'মকসুদুল মোমিনীন' ও বার চাঁদের ফযীলত বিষয়ক যেসব অনির্ভরযোগ্য পুস্তক-পুস্তিকা এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত তাতে, এই বিষয়টি রয়েছে। যদি ওই দৈনিকে দিবসটি সম্পর্কে এভাবে মাহাত্ম্য ও করণীয়ের বয়ান না থাকত তবে সম্ভবত প্রচলিত ভুল শিরোনামেও তা উল্লেখ করার উপযুক্ত মনে করতাম না।

খাইরুল কুরূনের হাজার বছরেরও বহু পরে উদ্ভাবিত এই রসমের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকারীদের মতামতও এ ভিত্তিহীন বিষয়ের ভিত্তি অন্বেষণে বিভিন্নমুখী। উপরোক্ত দৈনিকটির ২৩ সফর ১৪২৮ হিজরী বুধবারের সংখ্যায় লেখা হয়েছে–

'আজ চান্দ্রমাস সফরের শেষ বুধবার অর্থাৎ আখেরী চাহার শোম্বা। দু'জাহানের সর্দার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগমুক্তির দিন। আর এ কারণেই এদিন মুসলমানদের জন্য আনন্দময় ও পবিত্র দিন। হাদীসে বর্ণিত আছে এক ইহুদী কবিরাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মোবারক নিয়ে জাদুটোনা করেছিল। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অসুস্থতার কারণে তিনি কিছুদিন মসজিদের নববীতে যেতে পারেন নি। সফর মাসের শেষ বুধবার তিনি সুস্থতাবোধ করে গোছল করেন এবং দু'জন সাহাবীর কাধে ভর করে মসজিদে নববীতে গিয়ে জামায়াত নামায আদায় করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগ মুক্তিতে খুশি হয়েছিল মুসলিম জাহান। খুশি হয়ে হযরত ওসমান রাযি. তাঁর নিজ খামারের ৭০টি উট জবাই করে গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। খুশিতে আত্মহারা সাহাবীগণ আনন্দ প্রকাশ ও শুকরিয়া আদায় করেছিলেন রোযা রেখে, নফল নামায পড়ে এবং হামদ-নাত গেয়ে। পবিত্র আখেরী চাহার শোম্বার দিনে অজিমপুর দায়রা শরীফ ঐতিহ্যগতভাবে রোগমুক্তি ও মছিবত দূরের জন্য এক বিশেষ আংটি তৈরি করে থাকে এছাড়াও এদিনে বিভিন্ন খানকা দরবারে রোগমুক্তির জন্য বিশেষ দোআ ও মোনাজাত করা হয়। অনেকে এদিনে রোগমুক্তির জন্য মানত করে গোছল করে থাকেন। অনেকে এদিনে গরিব-দুঃখীদের মাঝে তৈরি খাদ্য বিতরণ করে থাকেন। এ বিশেষ দিনটি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকে।

অন্যদিকে মকসুদুল মোমেনীনে বলা হয়েছে : *'এই মাসের শেষ বুধবারকে আখেরী চাহার শোম্বাহ বলা হয়। (আখেরী শব্দের অর্থ শেষ এবং চাহার শোম্বাহ শব্দের অর্থ বুধবার) হিজরী একাদশ সনের ছফর মাসের শেষভাগে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অসুস্থ এবং পীড়িত হইয়া পড়েন। তারপর এই মাসের শেষ বুধবার দিন তিনি শরীর একটু সুস্থ বোধ করায় গোছলাদি করতঃ কিছুটা শান্তি লাভ করেন। এই গোছলই হুযূরের জীবনের শেষ গোছল ছিল। ইহার পর তাঁহার জীবনে আর গোছল করার ভাগ্য হয় নাই। অতএব এইদিন মুসলমানদের বিশেষভাবে গোছলাদি করতঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহের উপর সাওয়াব বখশেষ করা উচিত।'*

এরপর এদিন সম্পর্কে বিভিন্ন করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো একবারেই ভিত্তিহীন। যেমনটি ভিত্তিহীন উপরোক্ত উভয় বিবরণ।

১. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এক ইয়াহুদী জাদু করেছিল। এটা ছিল হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে মহররম মাসের প্রথম দিকের ঘটনা। এ যাদুর প্রভাব কতদিন ছিল সে সম্পর্কে দুটো বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনায় ছয় মাসের কথা এসেছে, অন্য বর্ণনায় এসেছে চল্লিশ দিনের কথা। কিন্তু এ দুই বিবরণে কোনো সংঘর্ষ নেই। এক বর্ণনায় পুরো সময়ের কথা এসেছে আর অপর বর্ণনায় এসেছে শুধু ওই সময়টুকুর কথা যাতে জাদুর প্রতিক্রিয়া বেশি ছিল। তবে যাই হোক সুস্থতার তারিখ কোনো হিসাব অনুযায়ীই সফরের আখেরী চাহার শোম্বা হতে পারে না। (-ফাতহুল বারী ১০/২৩৭ . আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া ২/১৫৪; শরহুয যুরকানী ৯/৪৪৬-৪৪৭)

২. জাদুর ঘটনা হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে এসেছে। কিন্তু সেখানে না একথা আছে যে, সে সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে জামাতে শরীক হতে পারে নি। আর না আছে মুআওয়াযাতাইন (সূরা ফালাক, সূরা নাস) দ্বারা জাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাঁর গোসলের বয়ান।

৩. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্থতার কারণে খুশি হওয়া কিংবা তাঁর সুস্থতার সংবাদ পড়ে আনন্দিত হওয়া প্রত্যেক মুমিনের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এ কথা দাবি করা যে, সাহাবায়ে কেরাম কিংবা পরবর্তী যুগের মনীষীগণ সে খুশি প্রকাশের জন্য উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন কিংবা একে উদযাপনের দিবস ঘোষণা করেছেন, জাহালাত ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, এ দাবির সপক্ষে দূর্বলতম কোনো দলীলও বিদ্যমান নেই।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অনেক মুসিবত এসেছে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে নাজাত দিয়েছেন। তায়েফ ও অহুদে আহত হয়েছেন, আল্লাহ্ তাকে সুস্থ করেছেন। একবার ঘোড়া থেকে পড়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছেন, যার কারণে মসজিদে যেতে পারেন নি, আল্লাহ্ তাঁকে সুস্থ করেছেন। তাঁর সুস্থতা লাভের এই সব আনন্দের স্মৃতিগুলোতে দিবস উদ্‌যাপনের কোনো নিয়ম আছে? তাহলে আখেরী চাহার শোম্বা, যার কোনো ভিত্তি নেই, তা কীভাবে উদযাপনের বিষয় হতে পারে?

৪. কোনো দিনকে বিশেষ ফযীলতের দিবস মনে করা; কিংবা বিশেষ কোনো আমাল তাতে বিধিবদ্ধ রয়েছে এমন কথা বলা; কিংবা তাকে ধর্মীয় দিবস হিসেবে উদযাপন করা এই সবগুলো হচ্ছে মুসলমানদের জন্য শরীয়তের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এগুলো শরয়ী দলীল ছাড়া শুধু মনগড়া যুক্তি ভিত্তিতে সাব্যস্ত করা যায় না। এটা শরীয়তের একটি অবিসংবাদিত মূলনীতি। এজন্য উপরোক্ত তথ্য ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধ হলেও এ দিবসকে ঘিরে ওইসব রসম-রেওয়াজ জারী করার কোনো বৈধতা হয় না।

৫. মকসুদুল মোমেনীন পুস্তিকায় যা বলা হয়েছে তা-ও সঠিক নয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়েছে সোমবারে। এর চার পাঁচদিন পূর্বে তাঁর সুস্থতার জন্য যে সাত কুঁয়া থেকে সাত মশক পানি আনা হয়েছিল এবং সুস্থতার জন্য তাঁর দেহ মোবারককে ধৌত করা হয়েছিল তা কি বুধবারের ঘটনা না বৃহস্পতিবারের? ইবনে হাজার ও ইবনে কাছীর একে বৃহস্পতিবারের ঘটনা বলেছেন। -ফাতহুল বারী ৭/৭৪৮, কিতাবুল মাগাযী ৪৪৪২; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/১৯৩; সীরাতুন নবী, শিবলী নুমানী ২/১১৩

যদি বুধবারের ঘটনা হয়ে থাকে তবে সফর মাসের শেষ বুধবার কীভাবে হচ্ছে? রসমের পৃষ্ঠপোষকতাকারীগণ সকলে ইন্তেকালের তারিখ বারো রবীউল আওয়াল বলে থাকেন। সোমবার যদি বারো রবীউল আওয়াল হয়ে থাকে তাহলে এর পূর্বের বুধবার তো সফর নয়, রবীউল আওয়ালেই হচ্ছে। তাছাড়া এ তথ্যও সঠিক নয় যে, বুধবারের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করেন নি। কেননা, এরপর একরাতে ইশার নামাযের পূর্বে গোসল করার কথা সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। -সহীহ মুসলিম হাদীস ৪১৮; (সহীহ বুখারী হাদীস নং ৬৮১ এর সাথে মিলিয়ে পড়ুন- আররাহীকুল মাখতুম, সফীউদ্দীন মোবারকপুরী পৃ. ৫২৫)

আর একথাও ঠিক নয় যে, বুধবারের পর অসুস্থতায় কোনোরূপ উন্নতি হয়নি। বরং এরপর আরেকদিন সুস্থবোধ করেছিলেন এবং জোহরের নামাযে শরীক হয়েছিলেন- একথা সহীহ হাদীসে রয়েছে। -সহীহ বুখারী হাদীস ৬৬৪, ৬৮০ ও ৬৮১; সহীহ মুসলিম হাদীস ৪১৮, আরাহীকুল মাখুতম পৃষ্ঠা-৫২৬: রাহমাতুল্লিল আলামীন মানসুরপূরী।

সোমবার সকালেও সুস্থবোধ করেছিলেন, যার কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. অনুমতি নিয়ে নিজ ঘরে চলে গিয়েছিলেন। -সীরাতে ইবনে ইসহাক পৃ ৭১১-৭১২; আর রাওযুল উলুফ ৭/৫৪৭-৫৪৮।

৬. সারকথা এই যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য এবং তাঁর পবিত্র সীরাত ও সুন্নতের অনুসরণ, তাঁর জীবনাদর্শে আপনা জীবন গঠন, তাঁর শরীয়তের প্রচার-প্রসার ইত্যাদি হকসমূহ, যা উম্মতের জন্য অবশ্যপালনীয় এগুলো থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং গাফলতির এই প্রকৃত ব্যাধি সম্পর্কে অসচেতন রাখার জন্য এসব ভিত্তিহীন রসম-রেওয়াজের উৎপত্তি।
আল্লাহ্ তাআলা উম্মতকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং রসম ও মুনকারাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।
৭. ইসলামী শরীয়তে ছুটির যে নীতিমালা রয়েছে সে আলোকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ তারিখের ছুটি থাকা ঠিক নয়।

ভুল মাসআলা

ইহরাম অবস্থায় কি চাদর বা লেপ দ্বারা পা আবৃত করা যায় না?

মিনায় দেখা গেল, এক ব্যক্তি চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন, কিন্তু তার মাথা ও পা অনাবৃত। পা আবৃত করেছিলেন, কিন্তু কয়েকজন মানুষ তাকে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, ভাই, হালতে ইহরামে পায়ের উপর কাপড় লাগানো মোটেও দুরস্ত নয়।
মনে রাখতে হবে যে, এই ধারণা ঠিক নয়। ইহরামের হালতে পা ঢাকা যায় তবে মোজা বা সাধারণ জুতা পরিধান করা জায়েয নয়। চপ্পল বা এ জাতীয় কোনো জুতা পরিধান করা জায়েয।

এপ্রিল ২০০৮

ভুল ধারণা

মায়ের মীরাসে কন্যা কি পুত্রের সমান বা দ্বিগুণ পাবে?

এক জায়গায় শোনা গেল, একজন বলছেন, 'পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র দ্বিগুণ ও কন্যা এক গুণ পেয়ে থাকে এটা ঠিক, এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে মায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কন্যা পেয়ে থাকে পুত্রের সমান। আরেকজন কিছুটা সংশয়ের সুরে বললেন, 'না, বরং মায়ের পরিত্যক্ত সম্পদে কন্যার অংশ দ্বিগুণ আর পুত্রের অংশ হল এক গুণ।'
উপরোক্ত দু'টো ধারণাই সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক মাসআলা হচ্ছে, পিতা-মাতা যার মীরাছই হোক তা বণ্টনের পদ্ধতি অভিন্ন। এক্ষেত্রে পদ্ধতি সেটাই যা কুরআন মজীদে এসেছে-

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

অতএব মায়ের মীরাছেও ভাই পাবে বোনের দ্বিগুণ।

বলা প্রয়োজন যে, এখানে শুধু উল্লেখিত ভুলটি সংশোধন করে দেওয়া হল, যা দুজন মানুষের মুখে শোনা গেছে। এদের মতো আরও অনেকের মনেও এ ভুল ধারণা থাকতে পারে। তাই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হল। এখানে কুরআনের উপরোক্ত বিধানের উপযোগিতা ও তাৎপর্য আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে ছোট একটি দিক হচ্ছে, বিয়ের আগে ও বিয়ের পরে মেয়েদের সম্পূর্ণ ভরণপোষণের ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এরপরও তারা স্বামীর পক্ষ থেকে মোহর, এরপর সমুদয় সম্পদের এক চতুর্থাংশ কিংবা এক অষ্টমাংশের অধিকারী। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর যে প্রাপ্য রয়েছে সেগুলো যদি তারা পূর্ণরূপে পান তবেই তাদের ন্যায়সংগত অধিকার রক্ষিত হবে। নারীর ইসলামী অধিকারগুলো বাস্তবায়নে আন্তরিক হওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

একটি জাহেলী রসম

বোন তার অংশ গ্রহণ করলে পিত্রালয়ে আসা-যাওয়া বন্ধ!

পৃথিবীর কোনো কোনো ভূখণ্ডে যে জাহেলী রসম প্রচলিত রয়েছে আমাদের দেশেও কোনো কোনো অঞ্চলেও সেটা অনুসৃত হতে দেখা যায়। রসমটি হল, বোনদেরকে পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কোনো অংশ প্রদান করা হয় না। না ভাই নিজে বোনের অংশ বোনকে বুঝিয়ে দেয়, আর না বোন তা দাবি করার সাহস করে। ঈমানী কমযোরী ও সহীহ ইল্মের প্রচার প্রসার না থাকার কারণে মুসলিম সমাজেও এই জাহেলী রসম অনুপ্রবেশ করেছে এবং এতটাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে, ভালো ভালো 'দ্বীনদার' পরিবারেও এ বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি–আল্লাহ্র পানাহ–কেউ এটিকে একটি নীতি বানিয়ে নিয়েছেন যে, মীরাছ গ্রহণ করার পর তাদের আর আসা-যাওয়ার অধিকার থাকে না। আসা-যাওয়া যদি করতেই হয় তাহলে মীরাছ তারা পাবে না।

অথচ বোন-ফুফিদের ব্যাপারে আত্মীয়তার দায়িত্ব পালন করা একটি স্বতন্ত্র ফরয, মীরাছের অংশের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মীরাছে তাদের যে

অংশ নির্ধারিত রয়েছে সেটা তাদের প্রাপ্য। এর সঙ্গে আত্মীয়তার দায়িত্ব পালন করার বিষয়টিকে যুক্ত করা কীভাবে বৈধ হতে পারে?
তারা যদি মীরাছের অংশগ্রহণ করেন তবে উত্তম কাজ করেছেন। এজন্য তাদেরকে মোবারকবাদ দেওয়া উচিত এবং তাদের দেখা-শোনা, আদর-আপ্যায়ন আরো বেশি করে করা উচিত।
মনে রাখা উচিত যে, মীরাছের অংশ দাবি করা বা গ্রহণ করার কারণে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, এখন আর আত্মীয়তার কোনো দায়িত্ব নেই, আত্মীয়তার সকল দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি মিলেছে এটা শুধু একটি চরম ধরনের ভ্রান্তিই নয়, জঘন্য ধরনের জাহেলী রসম, যার সম্মুখে অন্য বহু রসম ম্লান হয়ে যায়।
আল্লাহ্ তাআলাই আমাদের অবস্থার উপর রহম করনেওয়ালা।

একটি ঘৃণ্য মানসিকতা

পুত্র হলে মিঠাই বিতরণ, কন্যা হলে ...!

সন্তান হলে আকীকা করা সুন্নত। তবে অনেককে দেখা যায়, তারা সন্তান লাভের আনন্দে মিষ্টিমুখ করান। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন। এ কাজটিকে স্বতন্ত্র কোনো মাসনূন আমল মনে করা না হলে কিংবা অপরিহার্য নিয়মে পরিণত করা না হলে এটা একটা মুবাহ কাজ। নিয়ত সহীহ হলে এতে ছওয়াবেরও আশা করা যেতে পারে। তবে যদি খ্যাতি ও সুনামের জন্য হয় কিংবা সাধ্যের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয় তাহলে এতে ছওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হবে। এ কথাগুলো বলা হল মূল বিষয়ের ভূমিকা হিসেবে। যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি তা হল, অনেক মানুষকে দেখা যায় সন্তান লাভের কারণে মিষ্টি বিতরণ করেন, তবে সে কেবল পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে, কন্যা সন্তানের বেলায় মিষ্টি তো দূরের কথা, মন ভার করে চোখ মুখ অন্ধকার করে বসে থাকে। এটা খুবই নিন্দনীয় বিষয়। এটা হচ্ছে মনের গভীরে প্রোথিত জাহেলী প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ।
সন্তান–সে পুত্র হোক বা কন্যা, আল্লাহ্র অনেক বড় দান ও অনুগ্রহ। কাউকে আল্লাহ্ কন্যা দিবেন, কাউকে পুত্র। আবার কাউকে দিবেন উভয়টা। কারো প্রথম সন্তান পুত্র হবে আবার কারো কন্যা। এ সবগুলো একান্তই আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এর পিছনে কী তাৎপর্য ও উপযোগিতা রয়েছে তা-ও একমাত্র তিনিই জানেন। এ বিষয়ে মন খারাপ

করা এবং কন্যা ও তার মার দিকে বিরক্তি প্রকাশ করা অত্যন্ত নীচু আচরণ। এটা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের অবমাননা।

আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে জাহিলিয়াত থেকে নাজাত দিন এবং তাদেরকে দীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আহা! পিতা-মাতা যদি তাদের জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকেই একটুখানি মূল্য দিতেন যার পরশ তারা সর্বদা লাভ করছেন। সাধারণত এটাই দেখা যায় যে, কন্যার হৃদয়ে পিতা-মাতার জন্য ভালোবাসা অনেক বেশি থাকে এবং তারা পিতা-মাতাকে অনেক কম কষ্ট দিয়ে থাকে।

এছাড়া মুসলমানদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বাণী, যেখানে তিনি কন্যা সন্তানের তরবিয়তের উপর অনেক বড় ছওয়াবের ঘোষণা দিয়েছেন। এমনকি এ কারণে জান্নাতেরও সুসংবাদ শুনিয়েছেন।

মে ২০০৮

ভুল চিন্তা

ইসলামে কি কোনো সংস্কৃতি নেই?

ইংরেজি শিক্ষিত অনেক ভাই, যারা আলাদাভাবে সঠিক পন্থায় দীনের বুনিয়াদী ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেন নি তাদেরকে এবং অনেক সাধারণ মানুষকেও এই চিন্তাগত ভ্রান্তিতে পড়ে থাকতে দেখা যায় যে, ইসলামে আকীদাগত ও বিধি-নিষেধগত কিছু নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতি বিষয়ক কোনো বিধান ও নির্দেশনা নেই। অর্থাৎ তারা ইসলামকে কেবলমাত্র কিছু আকীদা ও আমলের সমষ্টি মনে করে থাকেন। এ ধারণা একেবারেই ভুল। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন, যার মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ তাহযীব। ইসলাম দ্বীন থেকে তাহযীবকে বিচ্ছিন্ন করে না। অতএব এটা সম্ভবই নয় যে, ইসলামের কোনো বিশেষ তাহযীব থাকবে না এবং তাহযীব সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা থাকবে না।

ইসলামী বিধিবিধানের প্রথম দুই উৎস– কুরআন ও সুন্নাহয় ইসলামী তাহযীবের উসূল ও আহকাম, মূলনীতি ও বিধিবিধান অত্যন্ত ব্যাপকভাবে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ থেকে আহরণ করে অন্যান্য বিষয় যেভাবে স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হয়েছে তদ্রূপ তাহযীব সংক্রান্ত বিধিবিধান; বরং ইসলামী তাহযীবের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখাও স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হয়েছে।

ভাষা-বর্ণ-বংশ-গোত্র ও স্থান-কাল নির্বিশেষে সকল মুসলমানের তাহযীব তা-ই যা ইসলামী তাহযীব।

এ বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর কিতাব 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম মুখালাফাতা আসহাবিল জাহীম' এবং সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর 'তাহযীব ওয়া তামাদ্দুন' অধ্যয়ন করা ফলপ্রসূ হবে।

ভুল রসম

ফাতিহায়ে ইয়াযদহম-এর কোনো শরয়ী ভিত্তি আছে কি?

রসম ও রেওয়াজে অনুরক্ত লোকেরা দীর্ঘদিন থেকে ফাতিহায়ে ইয়াযদহম নামেও একটি রসম পালন করে থাকে। 'ইয়াযদহম' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'একাদশ'। অর্থাৎ রবীউস সানীর এগারো তারিখে কৃত ফাতিহা বা ইসালে সাওয়াব মাহফিল। বলা হয়ে থাকে, এ তারিখে ওলীয়ে কামেল শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর ইন্তেকাল হয়েছিল। এজন্য তাঁর ওফাতদিবস পালন করার উদ্দেশ্যে এই রসমের সূচনা করা হয়। ওই আল্লাহ্র বান্দারা এ বিষয়টি চিন্তা করে নি যে, ইসলামে না জন্মদিবস পালন করা হয়, না মৃত্যুদিবস। না শায়খ জিলানী রহ. তাঁর কোনো শায়খের জন্মদিবস বা মৃত্যুদিবস পালন করেছেন, না তার কোনো খলীফা বা শাগরিদ তা পালন করেছেন। বলাবাহুল্য যে, এই ভিত্তিহীন রসম পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের চিন্তা করা আর তাতে ঈসালে ছওয়াবের নিয়ত করা বাতুলতা মাত্র।

এদিকে মজার বিষয় এই যে, গিয়ারভীর এই রসম এ তারিখে এ জন্যই পালন করা হয় যে, এটা শায়খ জিলানীর ওফাত দিবস। আল্লাহ্র কী শান, এই ভিত্তিহীন রেওয়াজের উদযাপন দিবসের জন্যও একটি ভিত্তিহীন তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

যারা এটা পালন করে থাকে তাদের কর্তব্য ছিল ইল্মে তারীখ এবং আসমাউর রিজালের দু-চারটি কিতাব উল্টে-পাল্টে দেখা যে, সত্যি সত্যিই তাঁর ওফাত এগারো তারিখে হয়েছে কি না?

আমরা তারীখ ও রিজালের অনেক গ্রন্থে শায়খ জিলানীর জীবনালোচনা পড়েছি। কোথাও এগারো রবীউস সানীর কথা নেই। আট, নয় বা দশ রবীউস সানী ৫৬১ হিজরীর কথা উল্লেখিত হয়েছে।

–দেখুন : সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী ১৫/১৮৯; আলমুনাতাযাম ইবনুল জাওযী : ১৮/১৭৩; যায়লু তবাকাতিল হানাবিলা, ইবনে রজব ১/২৫১; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮/৩৯৫, শাজারাতুয যাহাব, ইবনুল ইমাদ ৪/২০২, তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৩৯/৬০

গত ১৮/০৪/০৮এ একটি দৈনিক পত্রিকায় দেখতে পেলাম, ফাতিহা ইয়াযদহমের প্রথাগত এক মাহফিলের জনৈক বক্তার কিছু কথা ছাপা হয়েছে। পীরে তরীকত ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মহাসচিব বলে বক্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, শায়খ জিলানী (রহ.) শরীয়ত ও তাসাউওফ বিষয়ের শিক্ষা পীর *আবু সাঈদ মাখজুমী* থেকে লাভ করেছেন। অথচ শায়খের উস্তাদের নাম *আবু সাদ মুখাররিমী*, আবু সাঈদ মাখজুমী নয়। যাক এটি তো শুধু নামের ভুল।

কিন্তু অবাক হলাম যখন তার বরাতেই একথাও উদ্ধৃত দেখা গেল, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তিনি মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।'

যদি কোন সাধারণ লোকের মুখেও এ কথা শোনা যেত তাহলেও অবাক হওয়ার মত ছিল। কারণ তাওহীদে বিশ্বাসী কোন মুসলমানের অজানা নয় যে, জীবন ও মরণ একমাত্র আল্লাহ্র হাতেই। এটি কোন মাখলুকের সাধ্যে নেই। থাকতেও পারে না। আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে মানুষ আল্লাহ্র ওলী হতে পারে, কিন্তু যে বিষয়গুলোর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই রাখেন সেগুলোর কেউ অধিকারী হতে পারে না।

যদি 'ফাতিহায়ে ইয়াযদহম'এর মাহফিলে এমন আলোচনা হয়ে থাকে তাহলে তো এটি শুধু রসম-রেওয়াজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং শিরক ও বিদআতের প্রচারকও বটে।

এটি কি হাদীস

সালাম দিলে নব্বই নেকী আর জওয়াব দিলে দশ নেকী!

উপরের কথাটা বেশ প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন যে, এটা হাদীস কি না? আমাদের জানামতে এ কথাটা হাদীসের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে নেই। বরং একটি সহীহ হাদীসে এসেছে যে, সালামে শুধু 'আস্সালামু আলাইকুম' বললে দশ নেকী, 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বৃদ্ধি করলে বিশ নেকী এবং 'ওয়া বারাকাতুহু' সহ পুরো সালাম বললে ত্রিশ নেকী পাওয়া যায়। দেখুন : সুনানে আবু দাউদ হাদীস : ৫১৫৩, জামে তিরমিযী হাদীস ২৬৮৯

এজন্য ওই প্রচলিত কথাটির পরিবর্তে উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখিত বিষয়টি প্রচার করা উচিত।

আগস্ট ২০০৮

একটি চরম ভ্রান্তি
সূফীবাদই কি প্রকৃত ইসলাম?

ইসলাম তাওহীদ ও রিসালাত এবং দ্বীন ও শরীয়তের নাম। আকাইদ ও ইবাদত যেমন ইসলামের অংশ তেমনি মুআমালা, মুআশারা ও আখলাক সংক্রান্ত বিধি-বিধানও ইসলামের অংশ। ইসলামে যেমন ইবাদত সংক্রান্ত বিধি-বিধান রয়েছে তেমনি লেন-দেন, জীবন-যাপন এবং চরিত্র ও প্রবণতা সংক্রান্ত বিধি-বিধানও রয়েছে। ওয়ায-নসীহতের বিষয় যেমন ইসলামে রয়েছে তেমনি আমর বিল মা'রুফ, নাহি আনিল মুনকার ও জিহাদের বিধানও রয়েছে। ব্যক্তি-সংশোধন ও পরিবার-সংশোধনের বিষয় যেমন আছে তেমনি সমাজ ও সভ্যতা, নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনা এবং আইন ও বিচারের বিষয়টিও রয়েছে।

আত্মশুদ্ধি তথা মানুষের ভিতরগত প্রেরণা এবং চরিত্র সংশোধনের বিষয়ে শরীয়তের বিধি-বিধান যে শাস্ত্রে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয় হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে তার নাম হয়ে যায় 'তাসাওউফ'। অতএব 'তাসাওউফ' নামের বিষয়টি শরীয়তের বাইরের কোনো বিষয় নয়, আবার তা পূর্ণ শরীয়তও নয়। এটা হল শরীয়তের বিধি-বিধানের একটি অংশ।

মানুষ কেবল তখনই মুসলিম হতে পারে যখন সে তাওহীদের সঙ্গে পূর্ণ শরীয়তের উপর ঈমান আনবে এবং শরীয়তকে সমর্পিত হৃদয়ে গ্রহণ করবে। শুধু তাওহীদ স্বীকার করে কিংবা শরীয়তের শুধু একটি অংশকে গ্রহণ করে মানুষ 'মুসলিম' হবে–এ চিন্তার কোনো স্থান নেই ইসলামে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

এটাই হল ইসলামের সঠিক পরিচয়, যা কুরআন-সুন্নাহয় উল্লেখিত হয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। আর এটা ইসলামের প্রথমদিন থেকে আজ পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা পরম্পরায় সর্বজন বিদিত। এর বিপরীতে মুলহিদ ও ধর্মদ্রোহী শ্রেণী নিজেরা ভিন্নতর 'তাসাওউফ' প্রণয়ন করেছে। তাদের দৃষ্টিতে সেটা এক আলাদা জীবনব্যবস্থা। এর মূল ভিত্তিটা হল প্রবৃত্তির অনুগামিতা এবং কর্ম ও চরিত্রগত ক্ষেত্রে বিধিবন্ধন-হীনতা।

অথচ প্রতারণামূলকভাবে এই উশৃংখলারই নাম তারা দিয়েছে 'তাসাওউফ'। যাতে হক্কানী ছূফীয়ায়ে কেরামের নিকটে স্বীকৃত বিষয়টির সঙ্গে শুধু নামগত সাদৃশ্য দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করা যায়। তবে মিথ্যা মিথ্যাই। যতই তার বেশ-ভূষা পরিবর্তন করা হোক তার প্রকৃত পরিচয় কখনো গোপন থাকে না। যেদিন থেকে এই বিষয়টির উদ্ভব, সেদিন থেকেই কুরআন-সুন্নাহর পারদর্শী মণীষীগণ তাসাওউফের আবরণ গ্রহণকারী এই প্রতারক গোষ্ঠীকে সর্বসম্মতভাবে বেদ্বীন ও যিন্দীক ঘোষণা করেছেন এবং পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এরা বাতেনী ও ইবাহী সম্প্রদায়েরই একটি শাখা।

এ যুগটা উন্নতির (?) যুগ। অতএব অতীতের বেদ্বীনী তাসাওউফও এখন উন্নতি করে পরিণত হয়েছে 'সুফীইজমে'।

প্রকৃত 'তাসাওউফ' যেহেতু শরীয়তের সবচেয়ে কঠিন অংশ– অন্তরের পরিশুদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এজন্য শরীয়তের উপরে ঈমান রাখেন এমন অনেকেও এ অঙ্গণ সম্পর্কে পলায়নপর মানসিকতা পোষণ করেন, কিন্তু আজকালের 'সূফীবাদ' এতই মজার বিষয় যে, সেক্যুলার মানসিকতার লোকেরাও এতে আগ্রহ বোধ করেন। এমনকি আগাচৌ সাহেবকেও এ বিষয়ের একজন রসিক সমঝদার হিসেবে দেখা গেল। তার দাবি হল দ্বীন ও শরীয়ত নয়, সূফীবাদই হল প্রকৃত ইসলাম। নাউযুবিল্লাহ।

এ যুগের ধর্মদ্রোহী সেক্যুলার মানসিকতার লোকেরাই যখন এ মতবাদের প্রচারক তখন এটা বোঝা কারো পক্ষেই কঠিন নয় যে, ইসলামী তাসাওউফের সঙ্গে এই সূফীবাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। বরং এটা হল ইসলামকে অস্বীকার করারই একটি পন্থা।

প্রকৃত তাসাওউফ শরীয়তে মুহাম্মাদীরও শাখা এবং এই তাসাওউফের ধারক-বাহকগণ আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার, জিহাদ, নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রপরিচালনা, আইন ও বিচারসহ সকল বিভাগকে স্বীকার করেন। তারা ইসলামকে দীনে তাওহীদ এবং পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের সমষ্টি মনে করেন, যার রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি।

সারকথা এই যে, আজকাল কিছু কিছু পাশ্চাত্যজীবী চিন্তাবিদ ও সেক্যুলার মানসিকতার লোকেরা সূফীবাদের যে রূপ-কাঠামো পেশ করে থাকে তার সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর ইল্‌মে তাসাওউফের কোনো সম্পর্ক নেই। এ প্রসঙ্গে গাযালী ও রূমীর নাম ব্যবহার করাও নির্জলা প্রতারণা ও মিথ্যাচার। এই

সূফীবাদকে প্রকৃত ইসলাম বলে উল্লেখ করা ইসলামকে অস্বীকার করার এক জঘন্য ও চাতুরীপূর্ণ পদ্ধতি।
আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের ঈমান ও আকীদার হিফাযত করুন।

এটি কি হাদীস?

আসসালাতু মিরাজুল মুমিনীন!

'নামায মুমিনের মিরাজ' কথাটা একটা প্রসিদ্ধ উক্তি। কেউ কেউ একে হাদীস মনে করে থাকেন। কিন্তু হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে এটা পাওয়া যায় না। তবে এ কথাটার মর্ম বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আহরণ করা যায়। এজন্য একথাটা একটি প্রসিদ্ধ উক্তি হিসেবেই বলা উচিত, হাদীস হিসেবে নয়। হাদীস বলতে হলে নিম্নোক্ত কোনো সহীহ হাদীস উল্লেখ করা যায়– 'মুমিন যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে।' –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪১৩
'তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহ্র সঙ্গে একান্তে কথা বলে, যতক্ষণ সে তার জায়নামাযে থাকে।' –সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪২৬

সেপ্টেম্বর ২০০৮

ওভাবে নয় এভাবে বলুন!

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। ইসলামের এই পরিচয় তার অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক কালেমা পাঠকারী মুসলমানের এ বিষয়টি জানা থাকা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে আলকাউসারে বেশ কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। আগস্ট '০৮ পৃ. ৪১ এবং জুমাদাল উখরা ১৪২৯ হি. সংখ্যায়ও পৃ. ৭-৮ এ বিষয়ে লেখা হয়েছে। এখন আমি যে কথাটা আরয করতে চাই তা হচ্ছে, উপরোক্ত বিষয়টা ব্যক্ত করার জন্য অনেকে নিম্নোক্ত বাক্য ব্যবহার করে থাকেন : 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা' বাক্যটি খুবই প্রচলিত। আমি সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী মরহুম (১৯০৩ ঈ.-১৯৭৯ ঈ.)-এর একজন অনুসারীকে শুনেছি, তিনি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে কাউকে লক্ষ্য করে বলছিলেন, 'এ বাক্যটি আজ সবাই ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু জানেন এর প্রথম ব্যবহার কে করেছিলেন?'

কথাটা সত্য। আমাদের জানামতে এ বাক্যটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের কোনো মনীষীর নয় এবং বাক্যটা আপত্তিকর। কেননা, এখান থেকে যে মর্ম নির্গত হয় তা হচ্ছে, ইসলাম শুধু একটি ব্যবস্থা ও বিপ্লবী মতবাদমাত্র কিংবা ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তা একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা এবং এ পর্যন্তই। বলাবাহুল্য, এই চিন্তাধারা কুরআন-সুন্নাহর বুনিয়াদী শিক্ষা এবং ইসলামের মৌলিক চেতনার পরিপন্থী। আমাদের মতে উপরোক্ত বাক্যটি সংশোধন করে এভাবে বলা উচিত যে, 'ইসলামে পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা রয়েছে।' অর্থাৎ ইসলাম শুধু জীবন-ব্যবস্থার নাম নয়; বরং ইসলামের অনন্যসাধারণ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের একটি এই যে, সে তার অনুসারী ও আস্থাশীলদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত ও পরিপূর্ণ সংস্কৃতি প্রদান করেছে, যার মধ্যে সকল প্রশ্নের উত্তর এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রের যথার্থ নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে এবং যা সকল শ্রেণীর ও সকল যুগের মানবতার জন্য অনুসরণযোগ্য এবং যাতে সকল শ্রেণীর কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

মোটকথা, নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা পেশ করা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তবে একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। এটি ইসলামের অনেক বড় অংশ তবে এটিই পূর্ণ ইসলাম নয়।

ভুল ধারণা

ঈদের জন্য কি সবকিছুই নতুন হওয়া মাসনূন?

সঠিক মাসআলা এই যে, ঈদের দিন বিদ্যমান কাপড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাপড় পরিধান করবে এবং তা যেন অবশ্যই পরিষ্কার হয়। কিন্তু সমাজের প্রচলন বিষয়টিকে এমন বিকৃত করেছে যে, যেন ঈদ উপলক্ষ্যে নতুন কাপড় পরা এবং ঘরের সবাইকে নতুন কাপড় পরানো একটি মাসনূন কাজ? এরপর শুধু কাপড়ই নয়; বরং জুতো-মোজা, টুপি-গেঞ্জি ইত্যাদি সবই নতুন চাই। এমনকি যথাসম্ভব ঘরের আসবাবপত্রও নতুন হওয়া চাই। মনে রাখা উচিত যে, এই ধারণা ঠিক নয়। মাসনূন শুধু এটুকু যে, ঈদের দিন গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করবে, যা বিদ্যমান কাপড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আলকাউসার সেপ্টেম্বর ২০০৮ সংখ্যায় ১৩-১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

এটি কি হাদীস?

দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার?

নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন হযরত আদম আ. এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাআলা নবুওয়ত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করেছেন। তাঁর পরে আর কোনো নতুন নবী বা নতুন রাসূল নেই। এই দুজন এবং এঁদের মধ্যে আরও যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন তাঁদের সবার প্রতি আমাদের ঈমান রয়েছে। বিশেষত যাদের নাম আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন তাঁদের উপর আমরা সুনির্দিষ্টভাবে ঈমান রাখি যে, তাঁরা আল্লাহ্র সত্য নবী এবং প্রিয় বান্দা। আর যাঁদের নাম ও ঘটনা কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত হয় নি আমরা তাঁদের সম্পর্কে নাম-পরিচয়ের সুনির্দিষ্টতা ছাড়াই ঈমান রাখি।

آمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلَائِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ

আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, হযরত আদম আ. থেকে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সর্বমোট কতজন নবী এসেছেন? আসলে এর সংখ্যা জানা অপরিহার্য নয়। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে রেওয়ায়েতও বিভিন্ন ধরনের। তবে একটি সংখ্যা এ প্রসঙ্গে অর্থাৎ দুই লক্ষ চব্বিশ হাজারও উল্লেখ করা হয়। এ সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, এ সংখ্যা কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে কি না? এসে থাকলে তা কোন কিতাবে আছে?

আমি এটা অনেক তালাশ করেছি, কিন্তু কোথাও পাই নি। শেষে মোল্লা আলী কারী রহ.-এর 'ইকদুল ফারাইদ ফী তাখরীজি আহাদীছি শরহিল আকাইদ'-গ্রন্থে (ক্রমিক নং ৩৭) এ উক্তি পেলাম যে, হাফেয জালালী রহ. বলেছেন–

لم أقف عليه

অর্থাৎ এ কথা আমি কোনো রেওয়ায়েতে পাই নি।

ভুল চিন্তা

ওযরের হালতে কি মাসআলা নেই?

কারো কারো চিন্তার ধারাই অতি অদ্ভূত। তারা যেন মনে করেন, ওযরের হালতে মানুষ শরঈ বিধি-বিধানের অধীন থাকে না। এজন্য তারা একটা নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে যে, 'ওযরের সময় কোনো মাসআলা নেই!' তাদের ধারণা যেন এই যে, ওযরের কারণে মানুষ সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে যায়, কোনো ধরনের নিয়মনীতির অধীন সে থাকে না।

এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং এই চিন্তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সঠিক বিষয় এই যে, ওযরের হালতেও মানুষ শরীয়তের অধীন থাকে। মাযুরের জন্যও শরীয়তে বিধান রয়েছে, যা ফিকহের কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। ওযরের মাসাইলের প্রসিদ্ধ শিরোনাম হল 'আররুখসা।' এই শিরোনামে স্বতন্ত্র কিতাবপত্রও রচিত হয়েছে।

এজন্য মুমিনের করণীয় এই যে, ওযরের বাহানায় শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে অবহেলা না করা; বরং প্রথমেই জেনে নেওয়া উচিত যে, যে বিষয়কে ওজর মনে করা হচ্ছে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা ওজর কি না। যদি শরীয়তের দৃষ্টিতেও তা গ্রহণযোগ্য ওজর হিসেবে গণ্য হয় তাহলে এ অবস্থায় শরীয়তের বিধান কী তা জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা কর্তব্য। ওজরকে বাহানা বানানো কিংবা সঠিক মাসআলা না জেনে অনুমানের উপর কাজ করা কোনোটাই উচিত নয়। ইনসানের কোনো অবস্থাই শরীয়তের বিধান থেকে মুক্ত নয়। এজন্য এ ধারণার কোনোই অর্থ নেই যে, 'ওযরের হালতে কোনো মাসআলা নেই।'

হাঁ, ওজর যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে সাধারণ অবস্থার বিধান থেকে এ অবস্থার বিধান ভিন্ন হয়ে থাকে। তাহলে বলা যায় যে, 'ওযরের মাসায়েল ভিন্ন'; এমন নয় যে, ওযরের কোনো মাসআলাই নেই, এই অবস্থায় যা ইচ্ছা তা-ই বলা যাবে, যা ইচ্ছা তা-ই করা যাবে! নাউযুবিল্লাহ!

ভুল মাসআলা

সফরের হালতে কি রোযা ভাঙ্গার অনুমতি আছে, না না-রাখার?

শরয়ী সফরে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তবে পরে এই রোযার কাযা আদায় করতে হবে। উত্তম এই যে, শরয়ী সফরেও এই রুখসত অনুযায়ী

আমল না করে রোযার হালতে থাকা। কেননা পরে কাযা আদায় করা হলেও তো রমাযানের বরকত পাওয়া যাবে না।
এই মাসআলা কেউ কেউ এভাবে বলে থাকেন : 'সফরের হালতে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে।' এভাবে বলা ঠিক নয়। কেননা, এতে ধারণা হয় যে, সফরের হালতে রোযা আরম্ভ করার পরও তা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয কিংবা রোযা শুরু করার পর সফরে রওয়ানা হলে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। অথচ এটা ঠিক নয়। রোযা শুরু করার পর তা ভঙ্গ করা জায়েয নয়।

ভুল ধারণা

খতমসমূহ কি ইমাম ছাহেবের মাধ্যমে বখশানো জরুরি?

গ্রামাঞ্চলের মসজিদগুলোতে এবং শহরেরও কোনো কোনো মসজিদে দেখা যায় যে, ইমাম ছাহেবের কাছে মৌখিকভাবে বা লিখিত আকারে এই আবেদন এসে থাকে যে, 'অমুক ব্যক্তি কুরআন মজীদ খতম করেছেন, তা বখশে দিবেন।' তাদের আবেদনের ভঙ্গি থেকে অনুমিত হয় যে, কুরআন মজীদ খতম করার পর ইমাম ছাহেবের মাধ্যমে বা কোনো বুযুর্গের মাধ্যমে তা বখশানোকে তারা জরুরি মনে করেন।
এই ধারণা ঠিক নয়। কুরআন মজীদ খতম করা অনেক বড় ইবাদত, যা মূলত একটি ইনফেরাদী ইবাদত। প্রয়োজন ছাড়া অন্যকে এ বিষয়ে অবগত করাও মুনাসিব নয়। আল্লাহ্‌র জন্য পড়া হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা দেখেছেন, এই যথেষ্ট। যদি এই খতমের সাওয়াব কবরবাসীকে পৌঁছাতে হয় তবে মুখে বলারও প্রয়োজন নেই, শুধু মনে মনে এটুকু বললেই হবে যে, ইয়া আল্লাহ্, এর সাওয়াব সকল মুসলিম কবরবাসীর আমলনামা বা অমুক অমুকের আমলনামায় পৌঁছে দিন। সাওয়াব বখশানোর জিনিস নয়, যা অন্যের মাধ্যমে বখশাতে হবে। শুধু সাওয়াব রেসানী অর্থাৎ সাওয়াব পৌঁছে দেওয়ার নিয়ত করাই যথেষ্ট।

হাদীস নয়

طَعَامُ الْمَيِّتِ يُمِيْتُ الْقُلُوْبَ

মৃতদেরকে কেন্দ্র করে যে খানা খাওয়ানো হয় তা অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয়! এটা একটা উক্তি, যার অর্থ হচ্ছে, মৃতদের ঈসালে সাওয়াবের

উদ্দেশ্যে খতমে কুরআন বা খতমে তাহলীল করা হয় এবং উপস্থিত লোকদের জন্য খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয়। যেহেতু ঈসালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে কোনো আমল করে তার বিনিময়ে খানা খাওয়া বা খাওয়ানো জায়েয নয় এজন্য এই খাবারের দিকে আগ্রহ লোভ-লালসার পরিচায়ক, যা অন্তরকে প্রাণহীন করে দিতে পারে। একই কথা কারো মৃত্যুর সময় জিয়াফতের খাবার প্রসঙ্গেও। জিয়াফত আনন্দের সময় করা হয়ে থাকে, দুঃখ-মুসীবতের সময় নয়। এই সময় জিয়াফতের কোনো বৈধতা শরীয়তে নেই। এজন্য এ ধরনের খানা নূরহীন ও বরকতহীন হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের খাবার অন্তরকে ক্লেদাক্ত করা খুবই স্বাভাবিক। এজন্য বুযুর্গরা বলেছেন, মৃতের খাবার অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয়। এটা বুযুর্গদের উক্তি, হাদীস নয়। কেউ কেউ একে হাদীস মনে করে থাকেন। তাদের ধারণা ঠিক নয়। (ফাতাওয়া আযীযিয়্যাহ, শাহ আবদুল আযীয দেহলভী পৃ. ২০২)

উল্লেখ্য, গরীব-মিসকীনকে আহার করানো অনেক বড় ছওয়াবের কাজ এবং তা ঈসালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যেও হতে পারে। তবে শর্ত এই যে, হালাল পয়সায় হতে হবে, নিজের সম্পদ দ্বারা হতে হবে, অবন্টিত মীরাছের সম্পদ থেকে না হতে হবে, প্রচলিত তারিখগুলোতে (তৃতীয়, দশম, চল্লিশতম দিনে, শবে বরাত ইত্যাদিতে) না হতে হবে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, কাউকে খানা খাওয়ালে ওই সময় খতম পড়াবে না, আর যদি খতম পড়ানো হয় তাহলে খানা খাওয়াবে না এবং কোনো হাদিয়াও দিবে না। এরপর অন্যের মাধ্যমেই ঈসালে সাওয়াব করাতে হবে– এরই বা কী অপরিহার্যতা? প্রত্যেকে নিজেই ঈসালে সাওয়াব করতে পারে। কিছু দান-সদকা করা হল, নফল নামায পড়া হল, সূরা ইখলাস তিনবার পড়া হল, আল্লাহ্র দরবারে তাদের ক্ষমার জন্য দুআ করা হল–এই সবগুলোই ঈসালে সাওয়াব হিসেবে গণ্য হতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা তাওফীক দান করুন।

নভেম্বর-২০০৮

মিনার জামারাগুলো কি স্মারক বা ভাস্কর্য?

আমার জানামতে উপরোক্ত ভ্রান্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত নয়। তবে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় একথাটা লেখা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এটা পড়ে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারেন। ওই সাময়িকীতে বলা হয়েছে যে,

'মিনার জামারাগুলো হচ্ছে ভাস্কর্য। তদ্রূপ আরাফার ময়দানে হযরত আদম আ. ও হযরত হাওয়া আ.-এর সাক্ষাতস্থলে যে স্তম্ভ রয়েছে তাতে ছবিও রয়েছে। এজন্য এটাও ভাস্কর্যের মধ্যে গণ্য।' যারা এই অসত্য কথাগুলো লিখেছেন তাদের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। তারা এভাবে তাদের ভাস্কর্যপ্রীতির পক্ষে সমর্থন পেশ করতে চান এবং ইসলামের নিদর্শনগুলো সম্পর্কে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদেরকে এই ধারণা দিতে চান যে, বিষয়টা ইসলাম ধর্মেও রয়েছে! কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা দীনের হেফাযতের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। এজন্য এই অপচেষ্টাগুলো কখনো সফল হবে না।
মিনার জামারাগুলো ভাস্কর্যও নয়, কোনো স্মারকস্তম্ভও নয়। এগুলো একটা বিশেষ স্থান নির্দেশ করার চিহ্নমাত্র। যেই তিন স্থানে হযরত ইবরাহীম আ. শয়তানকে নূড়ি নিক্ষেপ করেছিলেন ওই স্থানগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য তিনটি স্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে। স্থানগুলোতে কোনো প্রাণীর ছবি তো দূরের কথা কোনো জড়বস্তুরও ছবি নেই এবং এগুলো কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার স্মারক হিসেবেও স্থাপিত হয় নি। তাহলে এগুলোকে ভাস্কর্য বা স্মারক স্তম্ভ কীভাবে বলা যায়?
যদি এগুলো ভাস্কর্যই হত তবে কার স্মরণে? শয়তানের স্মরণে কি? অথচ যে শয়তানের অপদস্থতার জন্যই ওই স্থানগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে একে ভাস্কর্য বলা কি ভাস্কর্য শব্দেরই অপপ্রয়োগ নয়?
আরাফার ময়দানে আদম-হাওয়ার (আলাইহিমাস সালাম) সাক্ষাৎস্থল হিসেবে কোনো স্থান নির্ধারিত নেই এবং এমন কোনো বিষয় প্রমাণিতও নয়। আরাফাতে জাবালে রহমতের উপর সাদা রংয়ের ছোট একটা স্তম্ভ রয়েছে, যা প্রতিবছর হাজার হাজার হাজী সাহেবের দৃষ্টিগোচর হয়। এতে কোনো ধরনের ছবি নেই। মিথ্যাই যদি বলতে হয় তাহলে এমন মিথ্যা কেন যে, শোনামাত্রই লোকেরা বলবে, 'সুবহানাকা হাযা বুহতানুন আযীম।' 'এ যে এক নির্জলা মিথ্যা।'
ওই স্তম্ভ জাবালে রহমতকে চিহ্নিত করার জন্য স্থাপিত। আরাফাতে সবদিকেই পাহাড়। এর মধ্যে কোন পাহাড়টা জাবালে রহমত, যার পাদদেশে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের খুৎবা দিয়েছিলেন, তা যেন লোকেরা সহজেই চিনতে পারেন এজন্য এই চিহ্ন সেখানে স্থাপন করা হয়েছে। একে ভাস্কর্য বলে দাবি করা মিথ্যাচার ছাড়া আর কী হতে পারে?

ভুল মাসআলা

ইহরামের অবস্থায় কি মীকাতের সীমানা থেকে বের হওয়া ঠিক নয়?

কারো কারো এই ধারণা আছে যে, ইহরাম বাঁধার পর হজ্ব-ওমরা সম্পন্ন করার আগে মীকাতের সীমানা থেকে বের হওয়া ঠিক নয়। এই ধারণা ভুল। ইহরামের হালতেও মীকাত থেকে বের হওয়া যায়। এতে ইহরামের কোনো ক্ষতি হয় না। যেমন কেউ ইফরাদ বা কিরান হজ্বের ইহরাম বেঁধে মক্কা মুকাররমায় গিয়েছেন। তাওয়াফ ইত্যাদি করার পর যেহেতু হজ্বের এখনও দেরি আছে তাই হজ্বের আগেই মসজিদে নববীর যিয়ারত করার ইচ্ছা করলেন। তো এতে কোনো দোষ নেই। হাঁ, বিনা প্রয়োজনে মীকাতের বাইরে কেন যাবে? হরমের বাইরেই বা যাবে কেন?

হাদীস নয়

আমার জন্ম হয়েছে ন্যায়পরায়ণ শাসক নওশেরওঁয়ার যুগে।

কারো কারো মুখে শোনা যায় যে, তারা

وُلِدْتُ فِيْ زَمَانِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ نَوْشِيْرْوَان

এই বাক্যটাকে হাদীস মনে করেন এবং এই কথাটাকে সঠিক মনে করেন অথচ এটা একটা ভিত্তিহীন বর্ণনা এবং যেমন মুহাদ্দিস ছনআনী প্রমুখ বলেছেন, এটা একটা মওযূ রেওয়ায়েত। এ প্রসঙ্গে হালীমী রহ. সুন্দর কথা বলেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফির ও মুশরিককে কীভাবে 'আদিল' বলতে পারেন?'

ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়পরায়ণতা বা আদালত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক আদায় করা দুটোই এর জন্য অপরিহার্য। এজন্য আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা ছাড়া এবং শরীয়তের বিধান অনুসারে প্রজাসাধারণের হক আদায় করা ছাড়া ন্যায়পরায়ণ উপাধী লাভ করার সুযোগ নেই। –আলমাকাসিদুল হাসানা, সাখাবী পৃ. ৪৫৪; আলমাসনূ মোল্লা আলী ক্বারী পৃ. ২০৪; কাশফুল খাফা আজলূনী ২/৩০৮

জানুয়ারি ২০০৯

ভুল ধারণা

হজ্বে কি মহিলাদের পর্দা করতে হয় না?

মক্কায় এক ভাই বলছিলেন, তার এক আত্মীয়া বাড়িতে খুব গুরুত্বের সঙ্গে পর্দা করেন, শুধু নামের পর্দা নয়, শরয়ী পর্দা। কিন্তু হজ্ব করতে এসে পর্দা

বাদ দিয়েছেন। তার কথা এই যে, 'হজ্বের সময় মেয়েদের পর্দা করা লাগে না।' অনেক দ্বীনদার মহিলা এ ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। এটা একটা ভুল ধারণা। ইহরামের হালতেও গায়রে মাহরামের সঙ্গে মেয়েদের পর্দা করা অপরিহার্য। এটা ঠিক যে, ইহরামের হালতে মুখমণ্ডলে কাপড় লাগানো নিষেধ, কিন্তু মুখে কাপড় লাগানো এবং গায়রে মাহরামের সামনে ইচ্ছা করে মুখ খোলা রাখা এক বিষয় নয়।
হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, ইহরামের হালতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। লোকেরা যখন আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত তো আমরা আমাদের চাদর মাথার সামনে ঝুলিয়ে দিতাম। চলে যাওয়ার পর সরিয়ে ফেলতাম। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৮৩৩)
এরপর মুখে কাপড় না লাগানোর বিধান তো শুধু ইহরামের হালতে প্রযোজ্য। উমরায় খুব বেশি হলে এক-দুইদিন এবং হজ্বে তিন-চারদিন। (তবে যদি কেউ ইফরাদ বা কিরানের নিয়তে ইহরাম বাঁধে তার বিষয় ভিন্ন) এই দিনগুলো ছাড়া যারা বেপর্দা ঘুরাফেরা করে তাদের তো ইহরামেরও অজুহাত নেই।
তাছাড়া মদীনা মুনাওয়ারার সফরে তো ইহরামের প্রশ্ন নেই। এই সফরে এবং মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানের দিনগুলোতে মুখ খুলে রাখা এবং সকল গায়রে মাহরামকে মাহরাম মনে করা অবশ্যই অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং অযথা গোনাহগার হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মোবারক সফরের পূর্ণ বরকত লাভের জন্য সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। (কিতাবুল হজ্ব, মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী পৃ. ২৮-২৯)

ভুল কাজ

মাঝে অনেক ফাঁকা রেখে ইকতিদা করা!

হজ্বের সফরে একটি ভুল অনেক হাজীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা হারাম শরীফ থেকে বহু দূরে দাঁড়িয়ে হারাম শরীফের জামাতের সাথে ইকতিদা করে। অথচ মাসআলা এই যে, মসজিদের বাইরে ইকতিদা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল, কাতার মিলিত হতে হবে। কাতারের মাঝে কোনো রাস্তা, নদী অথবা খালি ময়দান থাকলে ইকতিদা সহীহ হবে না। কিন্তু সেখানকার অবস্থা এই যে, অনেক সময় কিছু লোক রাস্তার অন্য পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ইকতিদা করে, মাঝে রাস্তা।

কেউ কেউ মসজিদে হারাম থেকে অনেক দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইকতিদা করে, এমনকি তাকবীরের আওয়াজও ঠিকমতো শুনতে পায় না। অথচ পাশের মসজিদের তাকবীরের আওয়াজ তার কানে আসছে। মনে রাখবেন, এত বেশি ফাঁকা রেখে ইকতিদা করলে ইকতিদা সহীহ হয় না। এই কারণে নামাযও সহীহ হয় না। এজন্য কর্তব্য হল সামনে এগিয়ে গিয়ে কাতারের সঙ্গে মিলিত হয়ে দাঁড়ানো কিংবা নিকটবর্তী কোনো মসজিদের জামাতে শরিক হওয়া অথবা কয়েকজন মিলে নিজেরা জামাত করা। হারাম শরীফের এক নামাযে এক লাখ নামাযের ছওয়াবের আশায় ভুল পন্থায় ইকতিদা করা সহীহ হবে না। এইভাবে এক রাকাতেরও সাওয়াব পাওয়া যাবে না।

ভুল ধারণা

হারাম শরীফে একটি গোনাহও কি লক্ষ গোনাহর মতো?

হারাম শরীফে এক ব্যক্তি অন্য আরেকজনকে বলছিলেন যে, 'হারাম শরীফের একটি গোনাহ এক লক্ষ গোনাহর সমান। এদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার।'

মসজিদে হারামে এক রাকাত নামায এক লক্ষ রাকাতের সমান–এ কথা সহীহ হাদীসে আছে। তবে মসজিদের বাইরে ও পুরো হারাম শরীফে এই সাওয়াব পাওয়া যাবে এটা কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু ঐ লোকটি ছওয়াবের সঙ্গে তুলনা করে গোনাহকেও এক লক্ষ বানিয়ে দিয়েছে, সেও আবার পুরো হারাম শরীফে, অথচ আল্লাহ্ তাআলা রহমান ও রহীম, তিনি বান্দাদের সাওয়াব বাড়িয়ে দেন। একটি সাওয়াবের কাজে কমপক্ষে দশটি সাওয়াব দান করেন। এক রাকাতকে হাজার রাকাতের সমান করে দেন, লক্ষ রাকাতের সমান করে দেন। কিন্তু গুনাহের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি হল একটি গোনাহ একটিই গণ্য হয়। তবে একথা ভিন্ন যে, কেউ হারাম শরীফে গোনাহ করলে হারাম শরীফের সম্মান ক্ষুন্ন করার অপরাধও তার উপর বর্তায়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ওখানে এক গোনাহ করার দ্বারা এক লক্ষ গোনাহ লেখা হবে।

হাদীস নয়

আশুরার দিন কিয়ামত হওয়া প্রসঙ্গে।

আশুরা দিবসের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন যে, 'হাদীস শরীফে এসেছে, এই দিনে কিয়ামত সংগঠিত হবে।'

এই কথাটা ঠিক নয়। যে বর্ণনায় আশুরার দিন কিয়ামত হওয়ার কথা এসেছে তা হাদীস বিশারদদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভিত্তিহীন, জাল।
আল্লামা আবুল ফরজ ইবনুল জাওযী ওই বর্ণনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, 'এটা নিঃসন্দেহে মওযূ বর্ণনা ...।' হাফেয সুয়ূতী রহ. ও আল্লামা ইবনুল আররাক রহ.ও তাঁর ওই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়েছেন।
(কিতাবুল মওযূআত ২/২০২; আল লাআলিল মাসনূআ ২/১০৯; তানযীহুশ শরীআতিল মরফূআ ২/১৪৯)
তবে জুমআর দিন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা সহীহ হাদীসে এসেছে।
দেখুন-তিরমিযী ২/৩৬২; আবু দাউদ ১/৬৩৪; সুনানে নাসায়ী ৩/১১৩-১১৪

ফেব্রুয়ারি ২০০৯

ভ্রান্ত বিশ্বাস

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ. বা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ.-এরও কি আসমায়ে হুসনা রয়েছে?

আল্লাহ্ তাআলার অনেকগুলো গুণবাচক নাম আছে, যেগুলোকে কুরআন মজীদে 'আলআসমাউল হুসনা' বলা হয়েছে। আর এ নামগুলো শুধু ওহীর মাধ্যমে জানা সম্ভব। ওহীর মাধ্যমে অনেক নাম সম্পর্কে জানানোও হয়েছে। এর মধ্যে নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে হাদীস শরীফে এই বিশেষ ফযীলত উল্লেখিত হয়েছে যে, যে এই নামগুলো আত্মস্থ করতে সক্ষম হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী হাদীস ২/৯৪৯; সহীহ মুসলিম হাদীস ২/৩৪২)
কুরআন-হাদীস থেকে খুঁজে বুযুর্গরা ওই নামগুলো সংকলন করেছেন, যা জামে তিরমিযী ও সহীহ বুখারীর শরাহ যেমন ফাতহুল বারী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। এই নামগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে সালাফ অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়।
কুরআন হাকীমে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

তাই আসমায়ে হুসনা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই এবং তাকে ওই নামগুলো দিয়েই ডাকা উচিত। এই নামেই তার কাছে প্রার্থনা করা উচিত এবং এদেরই দোহাই দিয়ে তাঁর কাছে করুণা কামনা করা উচিত।

এটা শুধু আল্লাহ্‌রই হক। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম জপা, অন্য কারো নামের অযীফা পড়া, দূর থেকে তাকে আহ্বান করা কিংবা মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বের কোনো বিষয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা করা, এগুলো সবই শিরক। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তাওহীদ ও সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ আমাদের অনেক কালেমা পাঠকারী ভাই উপরোক্ত শিরকী-বিদআতে লিপ্ত। তারা পীরের নামের অযীফা পড়ে এবং এ উদ্দেশ্যে তারা নিজেরা পীরের বিভিন্ন নাম উদ্ভাবন করে, কিছু তো একেবারেই আজব অর্থহীন। কিছু নাম শিরকের বাহক। এরপর এইসব নামকে 'আসমায়ে পাক' নাম দিয়ে জপতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার 'আসমায়ে হুসনা'র মতো এই নামগুলোর অযীফা পাঠ করে। কোনো কোনো অযীফার কিতাবে মূর্খরা খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ.-এর ১৯৯ নাম তৈরি করে লিপিবদ্ধ করেছে। অযীফা আকারে তা পাঠ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় (নাউযুবিল্লাহ)।

মনে রাখতে হবে যে, এগুলো সব জাহেলী ও শিরকী কাজ। খোদ মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ.-এর আদর্শের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী, মুত্তাবিয়ে সুন্নত বুযুর্গ ও দায়ী ছিলেন। তাঁর দাওয়াতে অসংখ্য মানুষ শিরক-বিদআত ছেড়ে তাওহীদ ও সুন্নতের দিকে এসেছে। ইসলাম গ্রহণ করেছে। অথচ তাঁর অনুসারী হওয়ার দাবি করে একশ্রেণীর মানুষ তাওহীদ ও ইসলাম বিরোধী রসম-রেওয়াজে লিপ্ত হয়ে থাকে। এটা কত বড় আফসোসের বিষয়! আল্লাহ্ তাআলা উম্মতকে হেফাযত করুন। আমীন।

ভুল মাসআলা

দাড়ি লম্বা করার শরয়ী বিধান!

দাড়ি ইসলামের শিক্ষা ও পরিচয়-চিহ্ন হিসেবে গণ্য। দাড়ি লম্বা করা এবং মোচ খাটো করা দীনে তাওহীদের শিক্ষা, যা সকল নবীর শরীয়তে ছিল। দাড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব এবং এক মুষ্ঠি থেকে খাটো করা নাজায়েয। যেহেতু দাড়ি রাখা সকল নবীর পবিত্র রীতি ছিল তাই একে 'সুন্নত'ও বলা হয়। এতে কারো কারো ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, দাড়ি লম্বা করাও অন্যান্য সাধারণ সুন্নতের মতো একটি সুন্নত। অতএব তা করলে ভালো, না করলেও গোনাহ নেই! এটা একদম ভুল ধারণা। দাড়ি এমন কোনো সুন্নত নয়, যা রাখা–না রাখার স্বাধীনতা রয়েছে, এটা একটা 'সুন্নতে ওয়াজিবা'।

অর্থাৎ সুন্নতে মুয়াক্কাদা থেকেও এর গুরুত্ব বেশি এবং এটা পরিত্যাগ করলে গোনাহ হয়।

দেখুন, দাড়ি কামানো বা এক মুষ্ঠি থেকে ছোট রাখা এমন এক গোনাহ, যা মানুষের সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত থাকে এবং এমন একটি গোনাহ, যা গোপন করারও কোনো উপায় নেই। এটা একটা প্রকাশ্য গোনাহ, যা খুবই ভয়াবহ। তদুপরি দাড়ির সঙ্গে এই আচরণটা করা হয় সুন্নতের প্রতি অনীহা এবং অনৈসলামিক ফ্যাশনের প্রতি আকর্ষণের কারণে। এ অবস্থায় তো ঈমানের ব্যাপারেই শঙ্কিত হতে হয়।

ভুল ধারণা

৭৮৬ কি বিসমিল্লাহ্ এর বিকল্প?

যেসব ক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা মাসনূন বা মুস্তাহাব সেসব ক্ষেত্রে অনেকেই '৭৮৬' লিখে থাকে। আবজাদের হিসেবে এটা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর অক্ষরগুলোর সংখ্যামানের সমষ্টি। কারো কারো ধারণা আছে যে, এই সংখ্যাগুলো লিখলে বা উচ্চারণ করলে 'বিসমিল্লাহ্' লেখার বা বলার কাজ হয়ে যায়। এটা একটা ভুল ধারণা। মুখে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে যদি এই অংকগুলো লেখা হয় তাহলে সেটা 'বিসমিল্লাহ্'র চিহ্ন গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সরাসরি এই অংকটাকেই বিসমিল্লাহ্র বিকল্প মনে করা সম্পূর্ণ ভুল।

বলাবাহুল্য যে, একটি 'সুন্নতে মুতাওয়ারাছা'-যা সর্বযুগের ওলামা-মাশায়েখ ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের মধ্যে অনুসৃত ছিল তা বাদ দিয়ে শুধু আবজাদী অংক লেখা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

মার্চ ২০০৯

ভুল ধারণা

ফাতিহা কি কিরাত নয়?

কিরাত আরবী শব্দ। এর মূল অর্থ পাঠ করা। দ্বিতীয় অর্থ পঠিত বস্তু বা পঠিত অংশ। কুরআন মজীদের যে কোনো অংশ পাঠ করা হোক তা কিরাত।

নামাযের প্রতি রাকাতে নামাযীকে প্রথমে ফাতিহা পড়তে হয়। এরপর ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে এবং সুন্নত-নফল নামাযের সব রাকাতে

ফাতিহার সঙ্গে কুরআন মজীদ থেকে আরও কিছু অংশ পাঠ করা জরুরি। আম মানুষের ভাষায় এই পঠিত অংশ কিরাত নামে পরিচিত। এজন্য দেখা যায়, নামাযের ওয়াজিবসমূহের বিবরণ দেওয়ার সময় তারা বলেন, ১. প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া ২. সূরা মিলানো বা কিরাত পড়া। ...

দ্বিতীয় কথাটার অর্থ হল সূরা ফাতিহার পর কুরআন মজীদের কিছু অংশ পড়া। সেটা অন্তত সূরা কাউছার বা তার সমান বড় এক আয়াত বা আয়াতাংশ হতে হবে। যিনি এই বিষয়টাকে সূরা মিলানো বলছেন তাঁর উদ্দেশ্যও এই নয় যে, পূর্ণ সূরা মিলানো ওয়াজিব। তদ্রূপ যাঁরা 'কিরাত পড়া' বলছেন তাঁদেরও উদ্দেশ্য সূরা ফাতিহাকে কিরাত থেকে খারিজ করা নয়। সূরা ফাতিহা কুরআন মজীদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যাকে 'আসসাবউল মাছানী' নামে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাহলে এটা কিরাত হবে না কেন?

হাদীস শরীফে এসেছে–

وَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوْا

অর্থ : 'যখন ইমাম পড়েন তো তোমরা নিশ্চুপ থাক।' (সহীহ মুসলিম হাদীস : ৪০৪; সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস : ৮৪৬)

অর্থ পরিষ্কার যে, যখন ইমাম কুরআন পড়েন তো মুক্তাদীরা নিশ্চুপ থাকবেন। তরজমায় অনভিজ্ঞ কেউ কেউ এই হাদীসের তরজমা কখনও এভাবে করেন যে, 'যখন ইমাম কিরাত পড়েন তখন তোমরা চুপ থাকবে।' এই তরজমা সূক্ষ্ম নয়। তবে একে ভুলও বলা যায় না। কেননা 'কিরাত পড়ার' অর্থ কুরআন পড়া–সে ফাতিহা হোক বা কুরআন মজীদের অন্য কোনো অংশ।

এদিকে একশ্রেণীর মানুষ, যারা ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়াকে ফরয বলেন তারা 'কিরাত' শব্দের লোক-অর্থের দ্বারা সুযোগ নিতে চান। তারা বলেন যে, 'এই হাদীসে ইমামের কিরাত পড়ার সময় মুক্তাদীদেরকে চুপ থাকতে বলা হয়েছে, ফাতিহা পড়ার সময় চুপ থাকতে বলা হয় নি!' অথচ কুরআন-হাদীসের পরিভাষায়, আরবী অভিধান ও ইল্মী পরিভাষায় ফাতিহা পড়াকেও 'কিরাত' বলে। অতএব লোক-প্রচলনের সুবিধা নিয়ে উপরোক্ত কথা বলা হাদীসের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোনো কোনো কট্টর গায়রে মুকাল্লিদকে তো–নাউযুবিল্লাহ–বলতে শোনা যায় যে, ফাতিহা তো কুরআনই নয়। অতএব ইমামের ফাতিহা পাঠকালে

মুকতাদীর চুপ থাকার প্রয়োজন নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, 'মযহাব' রক্ষার জন্য এমনকি কুরআন অস্বীকার করাও তাদের জন্য সহজ!

কুরআন কাকে বলে এটা সবারই জানা আছে। কুরআনের প্রথম সূরা ফাতিহা এবং শেষ সূরা নাস। কুরআন খোলামাত্রই সূরা ফাতিহা চোখে পড়ে। অথচ তারা বলেন, ফাতিহা কুরআন নয়! একদিকে এই কুফরী ধারণা অন্যদিকে হাদীস অনুসরণের দাবি!

কত ভালো হত যদি আমাদের তাকলীদ-ত্যাগী আলেমগণ তাদের অনুসারীদের কিছু খোঁজখবর নিতেন এবং তাদেরকে এ ধরনের অন্যায় প্রান্তিকতা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন!

তাদের এটাও তদন্ত করা কর্তব্য যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এইসব কুফরী মতবাদ কাদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

ভুল ধারণা

দুআয়ে কুনূত কি শুধু আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা ...?

বিতর নামাযের তৃতীয় রাকাতে 'কুনূত' (কুনূতের দুআ) পড়া জরুরি। এর বিভিন্ন দুআ রয়েছে : একটি হচ্ছে 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা ওয়া ... ' আরেকটি হল, 'আল্লাহুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদাইত্ ... ' এ ধরনের আরো দুআ রয়েছে। যেকোনো দুআ পড়া যায়। বরং কুরআন-হাদীসের যেকোনো দুআ পড়ার দ্বারাও কুনূতের ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কেউ কেউ প্রথম দুআটিকেই একমাত্র দুআ মনে করেন। তাদের ধারণা এটা ছাড়া 'কুনূত' আদায় হয় না। এই ধারণা ঠিক নয়। যেকোনো মা'ছূর ও মাসনূন দুআর দ্বারা ওয়াজিব কুনূত আদায় হয়।

হাদীস নয়

শায়খের মর্যাদা তার অনুসারীদের মধ্যে তেমনই যেমন নবীর মর্যাদা তাঁর উম্মতের মধ্যে!

اَلشَّيْخُ فِيْ قَوْمِهٖ كَالنَّبِيِّ فِيْ اُمَّتِهٖ

কোনো কোনো লোককে বলতে শোনা যায় যে, 'শায়েখের মর্যাদা তার অনুসারীদের মধ্যে তেমনই যেমন নবীর মর্যাদা তাঁর উম্মতের মধ্যে।'

কেউ কেউ একে হাদীস হিসেবেও উল্লেখ করে থাকে।

এই বাক্যটা কোনো বুযুর্গের উক্তি, হাদীস নয়। যে রাবী একে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছে সে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। মোটকথা, হাদীস তো কশ্মিনকালেও নয়, প্রশ্ন এই যে, একে বুযুর্গের উক্তি হিসেবেও উল্লেখ করা যাবে কি না? না, যাবে না। কেননা এর দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। কোনো মূর্খ একথা শুনে মনে করতে পারে যে, তার পীরও নবীদের মতো নিষ্পাপ, মাছুম–নাউযুবিল্লাহ! কিংবা পীরের কথাও (নাউযুবিল্লাহ) শরীয়তের দলীল! অথচ একজন নবীই মাছূম এবং কোনো পীরের কথা শরীয়তের কোনো দলীল নয়। পীরের জন্য অপরিহার্য যে, তিনি নবীর সুন্নাহর অনুসরণ করবেন এবং শরীয়ত মোতাবেক মানুষকে পরিচালিত করবেন। তাহলেই শুধু তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

হকের অনুগামী ও সুন্নতের অনুসারী পীর-মাশায়েখের সাহচর্য গ্রহণ করা অবশ্যই শরীয়তে কাম্য। কিন্তু তাদেরকে 'কাননবী ফী কাওকামিহী' বলে দেওয়া নিঃসন্দেহে 'গুলূ' ও সীমালঙ্ঘন। এটা পরিহার করা কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে সহীহ হাদীস এই–

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَ لَا دِرْهَمًا، وَ إِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

আলিমরা নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দীনার-দিরহামের উত্তরাধিকারী করেন না, তারা শুধু ইল্‌মের উত্তরাধিকারী করেন। অতএব যে ইল্‌ম গ্রহণ করল সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করল। (সুনানে আবু দাউদ হাদীস ৩৬৩৬) দেখুন : আলমাকাসিদুল হাসানা পৃ. ৪১২; মীযানুল ই'তিদাল খ. ২, পৃ. ২৩৭-২৩৮; লিসানুল মীযান খ. ৪, পৃ. ৩০৯, ৭/৩১৭

এপ্রিল ২০০৯

ইতিহাস বিষয়ক ভুল

আবু জাহল কি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিল?

আরবের মুশরিক গোষ্ঠীর নেতা আবু জাহল। ইসলামের সঙ্গে তার শত্রুতা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ ও বেআদবী সর্বজনবিদিত। তার সম্পর্কে কোনো কোনো মানুষকে বলতে শোনা গেছে যে, সেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিল, যেভাবে আবু লাহাব তাঁর চাচা ছিলেন। এটা ভুল। আবু লাহাব খাজা আবদুল্লাহর ভাই এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিলেন।

কিন্তু আবু জাহল কোরাইশ বংশের লোক হলেও আবদুল মুত্তালিবের সন্তান ছিল না। আবু জাহলের বংশধারা এই–'আবু জাহল আমর ইবনে হিশাম ইবনে মুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখ্যুম'। (উমদাতুল কারী, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ৮৪)

ভুল ধারণা

খাজা আবদুল্লাহ কি ভাইদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন?

উর্দূ বা বাংলা ভাষায় রচিত সীরাতের কিতাবসমূহে লেখা থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা নয়জন। যেহেতু পিতার বড় ভাইদেরকে 'তায়া' বাংলায় জ্যাঠা বলা হয় তাই কারো কারো ধারণা হয়েছে যে, খাজা আবদুল্লাহ (রাসূলুল্লাহর পিতা) বয়সের দিক থেকে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন। এই ধারণা ঠিক নয়। আবদুল মুত্তালিবের পুত্রদের মধ্যে সবার বড় হলেন হারিস। (সুবুলুল্-হুদা ওয়ার-রাশাদ, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৮২)

ভুল মাসআলা

মাকরূহ ওয়াক্তে কি যিকির-তিলাওয়াত মাকরূহ?

যে তিন ওয়াক্তে যেকোনো ধরনের নামায পড়া মাকরূহ সে ওয়াক্তের ব্যাপারে কারো কারো ধারণা এই যে, সে সময় যিকির-তিলাওয়াত, দুআ-দরূদ পড়াও মাকরূহ। এটা সঠিক নয়। ওই ওয়াক্তগুলোতে যিকির-তিলাওয়াত, দুআ-দরূদ সবই পড়া যায়। এটা মাকরূহ নয়।

ভুল নিয়ম

চার রাকাতের সময় না থাকলে দুই রাকাতও না-পড়া!

হাদীস শরীফে এসেছে যে, 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দুই রাকাত নামায পড়া ছাড়া না বসে।' (সহীহ বুখারী হাদীস : ৪৪৪)

এই নামাযের নাম 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'। বিশেষ কিছু অবস্থা ছাড়া যখনই কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তো তার জন্য এই নামায পড়া মাসনূন। যেসব নামাযের আগে সুন্নতে মুয়াক্কাদা আছে তাতে ওই সুন্নত নামাযই তাহিয়্যাতুল মসজিদের স্থলবর্তী হয়। কিন্তু কিছু মানুষকে দেখা যায়, তারা যখন মসজিদে জামাতে শামিল হওয়ার জন্য আসেন এবং দেখেন যে, চার

রাকাত পড়ার সময় নেই তো জোহর, আসর ও ইশা, যেগুলোতে (সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা গায়রে মুয়াক্কাদা) চার রাকাত নামায রয়েছে, কোনো নামায না পড়ে বসে যান। অথচ কখনো কখনো দুই রাকাত আদায় করার সময় থাকে। ইচ্ছা করলে তারা তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে পারতেন। নামাযের আগের সুন্নতের সময় না থাকলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা তাহিয়্যাতুল ওযুও পড়া যায় না এমন কোনো মাসআলা ফিকহে ইসলামীতে নেই। এছাড়া আসর ও ইশার পূর্বের সুন্নত চার রাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, চার রাকাতও হয়, দুই রাকাতও হয়।

হাদীস নয়

আবু বকর সিদ্দীক রাযি. কি মিলাদ দিতেন?

কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি ফোন করে বললেন যে, জনৈক বিদআতপন্থী প্রচলিত মিলাদের সমর্থনে বলেছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. নাকি প্রতি বছর মিলাদ করতেন। একবার মিলাদের জন্য তাঁর কাছে খরচপাতি ছিল না। স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলছেন, কিছু না থাকলে খেজুর দিয়েই মিলাদ কর!!

ওই ব্যক্তি জানতে চাচ্ছিলেন যে, এই রেওয়ায়েত সহীহ কি না এবং তা কোন কিতাবে আছে।

আমি তাকে বললাম, ভাই, এটা তো একদম তাজা বানানো গল্প। মওযু রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহেও আপনি তা পাবেন না। কে না জানে যে, প্রচলিত মিলাদ নবী-যুগ ও খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবা-যুগের শত শত বছর পরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অনুকরণে শুরু হয়েছে। অতএব এর আলোচনা তো কোনো সহীহ হাদীসের কিতাবে থাকা সম্ভবই নয়।

বিদআতপন্থীদের এই নতুন সৃষ্ট রেওয়ায়েতটি থেকেও বোঝা যায় যে, তাঁদের কাছে মিলাদ মাহফিলের সবচেয়ে বড় বিষয় হল খাবার-দাবার এবং জশন-জুলুস।

অথচ এটা সবাই জানেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর পবিত্র সীরাত আলোচনা দীনের একটা জরুরি আমল, যা যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে হতে পারে। আর এর জন্য খরচপাতিরও প্রয়োজন নেই, অতএব অর্থ না থাকার কারণে তা থেকে বিরত থাকা বা বঞ্চিত থাকার প্রশ্নই সৃষ্টি হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে নবীপ্রেমের সঠিক অর্থ বোঝার এবং তার হক আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে কথার উম্মত না বানিয়ে কাজের উম্মত বানিয়ে দিন। আমীন।

মে ২০০৯

আরবী ব্যাকরণগত ভুল

কিছু সংক্ষিপ্ত হাদীস আছে, যার আরবী বক্তব্য সাধারণ মানুষেরও জানা। হাদীসগুলো সহীহ, কিন্তু সেগুলোর আরবী বলতে গিয়ে অনেকেই ভুল করে থাকেন কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ

ইখলাসের সাথে ইবাদত কর, অল্প আমলই যথেষ্ট হবে।

কিছু মানুষ এই হাদীসের 'ইয়াকফিকা'-এর স্থলে 'ইয়াকফীকা' (মদসহকারে) পড়ে। এটা আরবী ব্যাকরণ হিসেবেও ভুল এবং হাদীস বর্ণনার দিক থেকেও ভুল।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا

'হে লোকসকল, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, সফলকাম হবে।'

এই হাদীসের 'তুফলিহূ'-এর স্থলে কেউ কেউ 'তুফলিহুন' (নূনসহকারে) বলে থাকেন। এটা ভুল।

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যে বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

এই হাদীসে 'দাখালাল জান্নাহ'-এর সাথে 'ফা' যোগ করে 'ফাদাখালাল জান্নাহ' বলে। এটাও ভুল।

مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ

এই হাদীসে দ্বিতীয় شَذَّ কে কেউ কেউ شُذَّ পড়ে এটা ঠিক নয়।

তাফসীর বিষয়ক একটি ভুল

'আবাবীল' কি কোনো বিশেষ পাখির নাম?

যে সমস্ত পাখির দ্বারা কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা আসহাবুল ফীলকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কা'বাকে রক্ষা করেছেন তাদের কথা সূরা ফিল-এ এসেছে। উক্ত আয়াত হল, وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ

অর্থ হল, এবং আল্লাহ্ তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন। এখানে 'আবাবীল' শব্দটি 'ইব্বালা'-এর বহুবচন, যার অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে। উদ্দেশ্য হল, অনেক পাখি পাঠানো হয়েছিল।
সাধারণ মানুষ মনে করে যে, 'আবাবীল' বলে ঐ পাখিগুলোর নাম বুঝানো হয়েছে। এ ধারণা ঠিক নয়। আসলে আবাবীল অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে।
এখন কথা হল, যে পাখি দ্বারা আসহাবুল ফিলকে ধ্বংস করা হয়েছে সে পাখির নাম কি ছিল? এ বিষয়ে কুরআনে কিছু বলা হয় নি এবং এ বিষয়ে ইতিহাসের বক্তব্যও বিভিন্ন ধরনের।

নামের ভুল উচ্চারণ

চান্দ্র পঞ্চম মাসের নামের সঠিক উচ্চারণ কী?

চন্দ্র মাসের পঞ্চম মাসের নাম জুমাদাল উলা এবং ষষ্ঠ মাসের নাম জুমাদাল উখরা, এই দুই নামের উচ্চারণের ক্ষেত্রে কেউ কেউ ভুল করে থাকেন। ভুল উচ্চারণগুলো নিম্নে পেশ করা হল :
ক) জুমাদিউল আওয়াল খ) জুমাদিউল উলা গ) জুমাদাল আওয়াল ঘ) জুমাদিউস ছানী ঙ) জমাদিউস ছানিয়া চ) জুমাদাস ছানী।
আরবীতে এই দুই মাসের উচ্চারণ তা-ই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ জুমাদাল উলা ও জুমাদাল উখরা।

এটি হাদীস নয়, কোনো হাদীসের বক্তব্যও নয়

হাদীসে কি ফুল কেনার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে?

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুটি যদি জোটে তবে
অর্ধেকে ফুল কিনে নিও
হে অনুরাগী!
-মহানবীর হাদীস অবলম্বনে

গুলশান-২ এর চৌরাস্তার মোড়ে একটি ফলকে খোদাই করা এই পংক্তিগুলো দেখলাম।
'মহানবীর হাদীস অবলম্বনে' একথাটি যদি সেখানে না থাকত তাহলে এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু ছিল না।

আমাদের জানামতে এটা না কোনো হাদীস, না কোনো সহীহ্ হাদীস থেকে একথা বুঝা যায়।
এ জাতীয় বক্তব্যের কোনো হাদীস প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীসের কিতাবে আমরা পাই নি।

জুন ২০০৯

অবচেতনে ভুল চিন্তা

দেশের রাজনৈতিক পরিচিতির কারণে আপনজনকে পর মনে করা!

মুসলিম উম্মাহ তাওহীদ ও মিল্লাতে হানীফিয়্যাহর মেলবন্ধনে আবদ্ধ। তাঁরা দীনে তাওহীদ ও শরীয়তে মুহাম্মাদীর অনুসারী, যা আল্লাহ্ তাআলা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন। এই উম্মতের একতার মূল সূত্র হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই কালেমায় বিশ্বাসীরা যে ভূখণ্ডেরই অধিবাসী হোক, যে ভাষা ও বর্ণেরই হোক, যে গোত্র ও সম্প্রদায়েরই হোক পরস্পর ভাই ভাই। তাদের বৈশিষ্ট্য তা-ই যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'মুসলিম জাতি প্রীতি ও ভালবাসায় এক দেহের ন্যায়। দেহের এক অঙ্গে কষ্ট হলে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে।' –সহীহ মুসলিম ২/৩২১

যতদিন ইসলামী খিলাফত অটুট ছিল ততদিন সকল মুসলিম জনপদ একই কেন্দ্রের অধীন ছিল কিন্তু ইসলামী খিলাফত দুর্বল হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর মুসলিম জনপদগুলোকে বিভক্ত করা হল। সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যকে টুকরা টুকরা করে ফেলা হল। এখন যদি এই ভূখণ্ডগত বিভক্তির দ্বারা মুসলিম উম্মাহকেও বিভক্ত করে ফেলা যায় তবেই মুসলিম উম্মাহর সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হয়। ইসলামের দুশমনরা এই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বর্তমান অবস্থায় যদিও প্রত্যেক দেশের সীমান্ত রক্ষাও অপরিহার্য কিন্তু এই রাজনৈতিক বিভক্তি যে আমাদের অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, আমরা অন্যান্য মুসলিম দেশের সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা মনে করি না, অন্যান্য মুসলিম দেশের বিপদ-আপদে আমাদের মনে সামান্য অস্থিরতাও সৃষ্টি হয় না-এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য দীনের মৌলিক চিন্তাধারাকে লালন করা। চিন্তায় ও আলোচনায় তা এ পরিমাণ চর্চা করা প্রয়োজন যাতে পরিস্থিতির কারণে আমরা দীনের মৌলিক চেতনা বিস্মৃত না হই।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কালেমায় বিশ্বাসী মুসলিম যেখানেই বাস করুক, আমারই মতো সে আল্লাহ্র বান্দা, সে আল্লাহ্র যমীনেই বাস করছে। তাওহীদের বন্ধনই মুসলমানদের প্রীতি ও একতার সবচেয়ে বড় বন্ধন, সবচেয়ে দৃঢ় ও স্থায়ী বন্ধন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর হক আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তরজমার ভুল

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ এর অর্থ কি?

পূর্ণ আয়াত সামনে না রাখার কারণে অনেককে দেখা যায় তারা উপরোক্ত আয়াতের তরজমা এভাবে করেন, 'শুধু মুত্তাকীরাই হল আল্লাহ্র ওলী।' এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাকওয়া ও পরহেযগারী ছাড়া আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করা যায় না। কুরআন মজীদে আল্লাহ্র ওলীদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে-

الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ 'যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে।'

অতএব ঈমান ও তাকওয়ায় যে যত উঁচু মাকাম অর্জন করবে সে তত বড় ওলী। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতাংশে এই বিষয়ে বলা হয় নি। পূর্ণ আয়াত তেলাওয়াত করলে পরিষ্কার দেখা যাবে, এর অর্থ হচ্ছে-"একমাত্র মুত্তাকীরাই মসজিদে হারামের অভিভাবক।" অর্থাৎ মুশরিকদের কোনো অধিকার নেই মসজিদে হারামের কর্তৃত্বগ্রহণ করার এবং মুমিনদেরকে প্রবেশে বাধা প্রদান করার। এই মসজিদের উপর তো তাদের কোনো অধিকার নেই। একমাত্র মুত্তাকীরাই অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাসী তাকওয়ার অনুসারী লোকেরাই এই মসজিদের অভিভাবক।

আয়াতের পূর্বাপর লক্ষ না করে মধ্য থেকে একটি অংশ তুলে নিয়ে তরজমা ও তাফসীর করতে থাকলে এ ধরনের ভুল হয়। কুরআন মজীদের বিষয়ে এটা খুবই অসতর্কতা, যা পরিহার করা উচিত।

একটি ভিত্তিহীন রসম বা ভিত্তিহীন বর্ণনা

আসরের পর কিছু খাওয়া কি অনুত্তম?

একজন বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষের নিকট থেকে একথাটা শুনে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি যে, তিনি আসর থেকে মাগরিবের মধ্যে কিছু খান না। পূর্ব থেকেই তার ধারণা যে, এই সময় খাওয়া-দাওয়া করা ভালো না বা নিষেধ আছে।

এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শরীয়তে শুধু রোযার হালতে খাওয়া-দাওয়া নিষেধ। অন্য সময় নিষেধ নয়। তবে কেউ যদি বিশেষ কোনো সমস্যার কারণে বা চিকিৎসকের পরামর্শে বিশেষ কোনো সময় খাওয়া থেকে বিরত থাকে তবে সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু মনগড়াভাবে দিন-রাতের কোনো অংশের ব্যাপারে একথা বলা যে, এ সময় খানাপিনা থেকে বিরত থাকা উত্তম বা ছওয়াবের কাজ, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের রসম-রেওয়াজ মেনে চলা শরীয়তে নিষেধ। কারো প্রয়োজন না হলে খাবে না কিন্তু একে একটি বিধান বানিয়ে দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

জুলাই ২০০৯

ভুল প্রচলন

বিবাহের ইজাব-কবুলের পর সালাম-মুসাফাহা কি সুন্নত?

কারো সঙ্গে দেখা হলে সর্বপ্রথম আমল হচ্ছে সালাম।

اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

সালামের স্থান কুশল বিনিময়েরও পূর্বে। এ বিষয়টি সকলেরই জানা আছে। মুসাফাহাও সাক্ষাতের শুরুতেই করতে হয়। এখন এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিবাহের অনুষ্ঠান চলাকালে বর তো মজলিসের শুরুতেই উপস্থিত হয়। আর আসার পর সালাম-মুসাফাহাও অবশ্যই করে থাকে। কিন্তু অনেক জায়গায় এই প্রচলন দেখা যায় যে, বিবাহের খুতবা ও ইজাব-কবুল হওয়ার পর বর দাঁড়িয়ে উপস্থিত সবাইকে সালাম দেয় এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে মুসাফাহা-মুআনাকা করে। যদি সে নিজে না করে তবে কোনো মুরব্বী তাকে ইশারা করে বলে, সবাইকে সালাম দাও। এটি অন্যান্য রসম-রেওয়াজের মতো একটি রসম। এটি সুন্নত নয়, আবার যুক্তিযুক্ত কোনো কাজও নয়। ইজাব-কবুলের পর সুন্নত আমল হচ্ছে, নব দম্পতির জন্য বরকতের দুআ করা। যে দুআর বাক্য হাদীসে এভাবে এসেছে,

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

(জামে তিরমিযী, হাদীস : ১০৯১)

ভুল মাসআলা

বিধবার অন্যত্র বিবাহ হলে সে কি পূর্বের স্বামীর মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়?

কারো কারো ধারণা যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর যে মীরাস পায় তার জন্য শর্ত হল, অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া। যদি কোথাও বিয়ে করে তাহলে সে পূর্বের স্বামীর মীরাস পাবে না। নাউযুবিল্লাহ!

মনে রাখবেন, এটা সম্পূর্ণ জাহেলী চিন্তা! স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী জীবিত থাকলেই সে মীরাসের হকদার হয়ে যায়। তার অন্যত্র বিবাহ হোক বা না হোক তাতে তার মীরাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করে না। এ কারণে কোনো মহিলাকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হলে তা হবে বড় ধরনের কবীরা গোনাহ। এটা একদিকে তার পাওনা আত্মসাৎ করা অপরদিকে শরীয়তের বিকৃতি সাধন।

আমাদের দেশে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা না করা একটি জাহেলী নিয়ম। এর এখন আরো বড় যুলুম যোগ হয়েছে যে, অন্যত্র বিবাহের কারণে তাকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হয়।

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ

স্মরণ রাখবেন, যাদের তত্ত্বাবধানে কোনো বিধবা রয়েছে তাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, বাস্তব কোনো ওজর না থাকলে (সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কখনোই কোনো ওজর নয়) তার বিয়ের ব্যবস্থা করা। এতে বিভিন্ন উপকারিতার পাশাপাশি মৃত সুন্নত যিন্দা করার সাওয়াবও হাসিল হবে।

এটি হাদীসের দুআ নয়

মুনাজাতে মকবুলে উল্লিখিত 'দুআয়ে ইব্রাহীম' হাদীসের দোয়া নয়!

'মুনাজাতে মকবুল' (হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. কর্তৃক সংকলিত)-এর কোনো কোনো সংস্করণের শেষে একটি দুআ ছাপা আছে। যার শিরোনাম হচ্ছে, 'দুআয়ে ইব্রাহীম' এবং এটি প্রত্যেক জুমায় সকাল-সন্ধ্যা পড়তে বলা হয়েছে।

অনেকেই 'মুনাজাতে মকবুল'-এর দুআগুলোর ন্যায় এটাকেও হাদীসে উল্লেখিত দুআ মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় তা নয়। না এটা কোনো মা'ছূর দুআ, আর না হযরত ইব্রাহীম আ.-এর সাথে এই দুআর কোনো সম্পর্ক আছে। আর এটা 'মুনাজাতে মকবুল'-এর অংশও নয়। কোনো প্রকাশক এটাকে কিতাবের সাথে ছেপে দিয়েছে। কেন, কীভাবে এটা ইব্রাহীম আ.-এর নামে নামকরণ করা হল তারও কোনো সূত্র নেই।

মিরাজ বিষয়ক আলোচনা
কিছু অসতর্কতা

১. যেহেতু কোনো কোনো অবিশ্বাসী মিরাজের ঘটনাকে অসম্ভব মনে করে তাই অনেকে তাদেরকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের অবতারণা করেন এবং মিরাজের সম্ভাব্যতা প্রমাণের প্রয়াস পান। আসলে এটা মৌলিক কাজ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু নিজ শক্তিতে আসমান ও জমিনের এই আশ্চর্য ভ্রমণ সম্পন্ন করেন নি। তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছে এবং করিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা, যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং সকল ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে পবিত্র এজন্য কোনো মুমিন কুরআন-হাদীসের বিবরণের উপর সামান্যতম দ্বিধাও করতে পারে না। এ কথাটিই হচ্ছে এ প্রসঙ্গে মূল কথা।

২. মিরাজের ঘটনা বলার সময় বর্ণনার শুদ্ধা-শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না রাখাও একটি ব্যাপক ভুল। একশ্রেণীর মানুষ যে কোনো চটি পুস্তিকায় কিছু পেলে বা কোনো কাহিনীকারের নিকট কিছু শুনলে তা-ই বিশ্বাস করে বসে এবং এত দৃঢ়তার সাথে তা বর্ণনা করতে থাকে যেন সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমের হাদীস। এমন কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয।

৩. কোনো কোনো জাহেল ব্যক্তি মিরাজের ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করে, যেন আরশ আল্লাহ্ তাআলার থাকার জায়গা এবং তিনি নবীজীকে নিজের ঘরে দাওয়াত করেছেন। নাউযুবিল্লাহ।

এই উপস্থাপনা খুবই মারাত্মক। আল্লাহ্ তাআলা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, আরশ তাঁর মাখলুক, স্থান ও কাল তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সত্তা স্থান-কালের সকল বন্ধনের উর্ধ্বে। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা।

মিরাজের ঘটনাকে ঠিক সেভাবেই বুঝতে হবে যেভাবে সূরা ইসরা ও সূরা নাজমের আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে এবং সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে।

আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০০৯

একটি অন্যায় কাজ

'বিসমিল্লাহ্' ও 'দরূদ' অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণ বলা ও লেখা!

প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে 'আল্লাহ্র যিকর' মাসনূন। যে কাজের সূচনায় শরীয়ত যে যিকর নির্দেশ করেছে সে কাজের জন্য ঐ যিকরই মাসনূন। অনেক কাজে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলা বা লেখার নির্দেশনা রয়েছে। শরীয়তে তা মাসনূন। বিধানগত বিচারে এটা মাসনূন বা মুস্তাহাব হলেও এর তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এর দ্বারা বান্দা নতুন করে- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর অঙ্গিকার করে। আল্লাহ্ তাআলার নেয়াতমসমূহ স্মরণ করে এবং আল্লাহ্র দিকে রুজূ করে কাজের মধ্যে দুরুস্তী ও খায়র ও বরকতের দরখাস্ত করে।

এজন্য এই আমল গুরুত্বের সঙ্গে করা চাই। আর যেহেতু এতে মাহবূবে হাকীকী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র নাম রয়েছে তাই গভীর শ্রদ্ধা ও মহাব্বতের সঙ্গে তা আদায় করা চাই। পূর্ণ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম তাজবীদ ও ইখলাসের সঙ্গে পাঠ করা চাই, শুধু রসম পুরা করার জন্য না হওয়া চাই।

পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে অনেককে অনেক সময় দেখা যায়, যারা বিসমিল্লাহ এমনভাবে পাঠ করে থাকেন, যেন তা একটি অতিরিক্ত কাজ। মূল কাজ হল যা শুরু করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য, যারা এমন মনে করেন তারা এই সুন্নতের তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন নন।

বিসমিল্লাহকে মূল কাজের মতো গুরুত্ব দিয়ে পাঠ করা উচিত; বরং কোনো দুনিয়াবী কাজের শুরুতে যদি 'বিসমিল্লাহ্' পড়া হয় তাহলে তা ওই কাজের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

'আররাহীম' শব্দে ওয়াকফের কারণে দীর্ঘ মদ করতে হবে। কিন্তু যদি এক আলিফ মদও না করা হয় তবে তা হবে 'লাহনে জলী'। তদ্রূপ 'আররাহমান'-এর মীমে এক আলিফ 'মদ' করা জরুরি। অক্ষরগুলো মাখরাজ থেকে আদায় করা, বিশেষত ح ও ه সঠিক মাখরাজ থেকে আদায় করাও জরুরি।

দরূদ শরীফও অত্যন্ত বরকতপূর্ণ আমল। দুআর বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে দরূদ শরীফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ হিসেবে তা আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত। দ্বিতীয়ত এর সম্পর্ক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে, যাঁর হক মুসলমানদের উপর তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি এবং যিনি আল্লাহ্ তাআলার পরে আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী।

দরূদের মাধ্যমে তাঁর জন্য আল্লাহ্র দরবারে দুআ করা হয়। তাই এই আমল অত্যন্ত ভক্তি ও অনুরাগের সঙ্গে আদায় করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ এক মজলিসে বারবার হলে মাসআলাগত দিক থেকে যদিও প্রতিবার দরূদ পড়া জরুরি নয়, মুস্তাহাব, কিন্তু এখানে বিষয়টি মহব্বতের। এজন্য-মাশাআল্লাহ্-মুসলিম উম্মাহ এই মুস্তাহাব আমলের বিষয়ে যত্নবান, কিন্তু এরপরও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কখনো কখনো উদাসীনতার শিকার হয়ে যায়। কেউ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' এমনভাবে পাঠ করে, যেন তা একটি অতিরিক্ত বিষয়, এজন্য এত দ্রুত ও অস্পষ্টভাবে তা পাঠ করা হয় যে, কিছু অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারিতই হয় না। এটা ঠিক নয়। দরূদকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল মনে করে আদায় করা উচিত।

লেখার মধ্যে তো দরূদ শরীফকে খুবই মাজলূম বানানো হয়। কেউ শুধু (স.) লেখেন, কেউ লেখেন (দ.)। যেন এটা শুধু 'অতিরিক্ত' বিষয়ই নয়, একটি 'বিপদ'ও বটে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!!

প্রশ্ন এই যে, সম্পূর্ণ দরূদ লেখা হলে কতটুকু কালি বা কাগজ ব্যয় হবে? আহা! আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারতাম যে, এই ব্যয়টুকুই হতে পারে আমাদের সঞ্চয়।

আমাদের দেশের এমন একজন আলেমে দীনের নাম আমার জানা আছে, যিনি শুধু এজন্য কোনো প্রকাশককে তার কিতাব ছাপতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যে, তারা পূর্ণ দরূদের পরিবর্তে শুধু (দ.) ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

বলাবাহুল্য যে, এমন ব্যক্তিরাই হলেন আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

و الأسف الشديد في ذلك على طلاب العلم، فإن هذا التساهل قد فشا فيهم أيضا، مع أن شعارهم - فيما يزعمون - محبة النبي صلى الله عليه و سلم، و اتباع سنته.

একটি 'কাহিনী'

'দুআয়ে কদ্‌হ' সম্পর্কিত বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই!

কোনো কোনো অযীফার কিতাবে 'দুআয়ে কদ্‌হ' নামে একটি দীর্ঘ দুআ পাওয়া যায়, যার সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে যে, মিরাজের রাতে হযরত জিবরীল আ. তা নবীজীকে দান করেছেন এবং তার বহু ফযীলত উল্লেখ করেছেন!

প্রকৃত বিষয় এই যে, এটা মাছুর দুআ নয়, কেউ তা তৈরি করেছে। আর এর যে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে তা একটি অলিক কাহিনী। বাস্তবতার সঙ্গে এর দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. 'আলহিযবুল আ'যম' কিতাবের শুরুতে এই 'মওযূ' বর্ণনাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে কঠোর সমালোচনা করেছেন। শরহে নুখবার ভাষ্যগ্রন্থেও 'মওযূ' অধ্যায়ে এর সমালোচনা করেছেন।

ভুল কাজ

জানাযার প্রতি তাকবীরে আকাশের দিকে চোখ উঠানো!

ভুলের কোনো শেষ নেই। কোনো কোনো ভুল এতই আজব হয়, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা তা থেকে নিরাপদ রেখেছেন তারা তা চিন্তাও করতে পারেন না এবং এমন ভুল হতে পারে বলে বিশ্বাসও করতে পারেন না।

সম্ভবত এ ধরনের একটি ভুল, যা কারো কারো মধ্যে লক্ষ করা গেছে এই যে, তারা জানাযার নামাযের প্রতি তাকবীরের সময় আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়। তাদের ধারণা, জানাযার নামাযে এরূপ করা চাই!

এই ধারণা ভুল। নামাযের অন্যান্য সময়ের মতো তাকবীর বলার সময়ও দৃষ্টি যমীনের দিকে থাকবে। এ সময় দৃষ্টিকে উপরের দিকে উঠানো যেমন খেলাফে সুন্নত তেমনি অযৌক্তিকও বটে। আর যদি এর পিছনে কোনো ভিত্তিহীন বিশ্বাস থাকে তবে তো বিষয়টা আরো মারাত্মক।

অক্টোবর ২০০৯

একটি চিন্তাগত দুর্বলতা

রমযানুল মুবারকের সমাপ্তিতে আনন্দিত হওয়ার কারণ!

রমযানুল মুবারক সমাপ্ত হলে এজন্য আনন্দিত হওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ মাস দান করেছিলেন, যা ছিল খায়র ও বরকতে পরিপূর্ণ। এ মাসের দিবসে সওম পালন এবং রজনীতে তারাবী ও

তাহাজ্জুদের তাওফীকও আল্লাহ্ তাআলা দান করেছিলেন। এজন্য রমাযানের শেষে মুমিনের অন্তর আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাতের আশায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নিজ মেহেরবানীতে আমাকে ক্ষমা করেছেন। রমযানুল মুবারকের খায়র ও বরকত নিশ্চয়ই আমাকে দান করেছেন। মুমিন তখন আল্লাহ্ তাআলার শোকরগোযারী করে, হামদ ও ছানা করে এবং তাকবীরের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করে। ঈদের দিন আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশিত পন্থায় ঈদুল ফিতর-এর আমলগুলো সম্পন্ন করে।

এই লেখায় যে দুর্বলতাটি উল্লেখ করতে চাই তা এই যে, আমাদের মধ্যে অনেকের কথা ও আচরণে বোঝা যায় যে, মাহে রমযান যেন একটি বিপদ ছিল! শাওয়ালের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার দ্বারা এই বিপদ দূর হয়েছে! তাই আনন্দ!! বস্তুত এই দুর্বলতার শিকার তো তারাই হতে পারে যাদের রোযা রাখার তাওফীক হয় নি। তাদের জন্য তো প্রকৃতপক্ষেই রমযান ছিল ক্ষতির মাস। কিন্তু মুমিন এই মাসের আগমনে এজন্য আনন্দিত হয় যে, এটা তার দ্বীনী ও ঈমানী তরক্কীর মাস। এজন্য একে বিপদের পরিবর্তে মহা সৌভাগ্য মনে করে এবং আগ্রহের সঙ্গে তার প্রতীক্ষায় থাকে। আর এ মাস সমাপ্ত হলে সে এ আশায় আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরওয়ানা তার হাসিল হয়েছে!

হিসনে হাসীন, মুনাজাতে মকবুলের সাত মনযিল!

হিসনে হাসীনের বিষয়বস্তু হচ্ছে ওই দুআগুলো হাওয়ালাসহ একত্র করা, যা কুরআন-সুন্নাহ্য় উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম চার অধ্যায়ে বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন আমল ও ইবাদতের দুআ সন্নিবেশিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সাধারণ দুআসমূহ রয়েছে, যা বিশেষ কোনো সময় বা পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত নয়। এই অধ্যায়ের দুআগুলো অযীফা আকারে পড়া যায়। তবে প্রথম চার অধ্যায়ের দুআ সেসব সময় ও পরিস্থিতিতেই পড়া উচিৎ যে সময় বা পরিস্থিতিতে তা পড়ার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ সময়ের দুআগুলো দিন রাতের সবসময় অযীফা আকারে পাঠ করা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন ধরুন, কেউ যদি সকাল বেলা পাঠ করেন,

أَمْسَيْنَا وَ أَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ ...

(এই সন্ধ্যায় আমরা ও গোটা বিশ্ব জগত আল্লাহ্‌র, প্রশংসা আল্লাহ্‌র ...)। তদ্রূপ কেউ যদি সন্ধ্যায় পাঠ করেন,

أَصْبَحْنَا وَ أَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ ...

(এই ভোরে আমরা ও গোটা বিশ্বজগত আল্লাহ্‌র, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র ...)। তাহলে বিষয়টি কেমন হবে? তদ্রূপ সর্বদা অযীফা আকারে কি এই দুআ পাঠ করা যাবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا ...

(সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে আহার দিলেন, পানীয় দিলেন এবং যিনি আমাদেরকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।) তদ্রূপ-

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَ أَحْيَا

অথচ এখন তার নিদ্রার সময় নয়। কিংবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيْ الْأَذٰى ...

অথচ এখন সে ইস্তিঞ্জা থেকে আসে নি।

মোটকথা, 'হিসনে হাসীন' কিতাবকে বিভিন্ন মঞ্জিলে ভাগ করে অযীফার কিতাব বানানো যুক্তিযুক্ত নয়।

'মুনাজাতে মাকবূল' কিতাবের অধিকাংশ দুআ হচ্ছে ব্যাপক অর্থবোধক দুআ, যা বিশেষ সময় বা পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত নয়। এই দুআগুলো মিনতি ও মনোযোগের সঙ্গে যেকোনো সময় পাঠ করা যায়। সহজতার উদ্দেশ্যে 'আলহিযবুল আ'যম'-এর মতো এই দুআগুলোকেও সাত মঞ্জিলে ভাগ করা হয়েছে। যেন প্রতিদিন এক মনযিল করে পাঠ করা যায় এবং কিতাব ও সুন্নাহ্য় শেখানো অধিকাংশ জামে দুআ প্রার্থনায় এসে যায়। সাত মঞ্জিলে বিভক্ত করার বিষয়টি মাসআলাগতভাবে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি পাঠ সহজ হওয়ার জন্য একটি বিন্যাসমাত্র। যে মঞ্জিলে যে বারের নাম দেওয়া আছে সেদিনই তা পড়তে হবে তা-ও অপরিহার্য নয়। তদ্রূপ এটাও জরুরি নয় যে, একদিনে এক মনযিল পরিমাণই পড়তে হবে। সাত মঞ্জিলে ভাগ করা এবং সপ্তাহের এক-এক দিন, এক-এক মনযিল পাঠ করার কথা উল্লেখিত হওয়া এজন্য নয় যে, হাদীস শরীফে এই দুআগুলো এভাবে পাঠ করতে বলা হয়েছে। অতএব এই ধারণা করা যে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম করার দ্বারা শরীয়তের কোনো হুকুম লঙ্ঘন হবে বা এই দুআগুলোর বরকত

ও ফযীলত হ্রাস পাবে, ঠিক নয়। তবে একে নিছক একটি বিন্যাস মনে করে নিজের সুবিধার জন্য তা অনুসরণ করলে দোষের কিছু নেই।
এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়ার প্রয়োজন এজন্য হয়েছে যে, কারো কারো প্রশ্ন থেকে অনুমিত হয়, তারা এই বিন্যাসের অনুসরণকেও সম্ভবত একটি শরয়ী হুকুম মনে করেন এবং মাসআলার দিক থেকেও এর অন্যথা অনুচিত বলে মনে করেন। অথচ প্রকৃত বিষয় তা-ই যা উপরে লেখা হয়েছে।

নভেম্বর ২০০৯

হরম ও মসজিদে হারাম কি এক?

বাইতুল্লাহর চারপাশে যে মসজিদ তার নাম 'আলমাসজিদুল হারাম', যাতে এক রাকাত নামাযের সাওয়াব লক্ষ রাকাতের সমান। পক্ষান্তরে 'হরম' হচ্ছে মক্কা মুকাররমার ওই বিস্তীর্ণ এলাকা, যার কিছু বিশেষ আহকাম ও আদাব রয়েছে। যাকে কুরআন মজীদে 'হারামান আমিনা' বলা হয়েছে। এটা বাইতুল্লাহর পূর্ব দিকে আরাফা পর্যন্ত, পশ্চিমে হুদাইবিয়া (শুমাইছী) পর্যন্ত, উত্তরে জি'রানা ও ওয়াদীয়ে নাখলা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে শুবাইকা পর্যন্ত বিস্তৃত। চতুর্দিকের সীমানায় চিহ্ন ও ফলক লাগানো আছে।
হরমের বাইরের অংশকে 'হিল্ল' বলে। বাইতুল্লাহ থেকে হিল্ল-এর নিকটতম স্থান হচ্ছে তানয়ীম, যেখানে মসজিদে আয়েশা অবস্থিত।
অনেক সময় মসজিদে হারামকে সংক্ষেপে 'হরম' বা 'হেরেম শরীফ' বলা হয়। এতে অনেকের মনে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, মসজিদে হারামের অপর নাম 'হরম'। তদ্রূপ কেউ কেউ মনে করেছেন, হরমের গোটা এলাকাই মসজিদে হারাম। এই উভয় ধারণা ভুল। মসজিদে হারাম হচ্ছে বাইতুল্লাহর চারপাশের মসজিদের নাম, যার চতুর্সীমানা সবার চোখের সামনে। পক্ষান্তরে হরমে (মক্কী) মক্কার ওই বিস্তৃত অংশকে বলে যার সীমানা উপরে বলা হয়েছে। বাইতুল্লাহ ও মসজিদে হারাম ছাড়াও সাফা-মারওয়া, মিনা, মুযদালিফা ইত্যাদিও হরমের সীমানার ভিতরে অবস্থিত।
এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, ছওয়াবের দিক থেকে হরমের কোনো অংশে কৃত নেক আমলের সাওয়াব মসজিদে হারামে কৃত নেক আমলের সমান কি না। কোনো কোনো সালাফ গোটা হরমের এলাকাকে মসজিদে হারামের মতো

মনে করেন, কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে, হরমের অন্তর্ভুক্ত গোটা এলাকা মসজিদ। অন্যথায় যেসব কাজ মসজিদে করা না-জায়েয বা খেলাফে আদব তা গোটা হরমের মধ্যেও না-জায়েয ও খেলাফে আদব হত।

মনে রাখা উচিত যে, যারা গোটা হরমের এলাকাকে মসজিদে হারাম মনে করে মসজিদে হারামের জামাতে শামিল হয় না তারা নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, হরমের কোনো স্থানে এক রাকাতে লক্ষ রাকাতের সাওয়াব পাওয়া যায় (অথচ এর উপর কোনো স্পষ্ট ও শক্তিশালী দলীল বিদ্যমান নেই) তবুও মসজিদে হারামের বরকত ও নূরানিয়াত, বাইতুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার উত্তম প্রভাব, আল্লাহ্র নেক বান্দাদের এত বড় জামাতে শামিল হওয়ার বরকত মসজিদে হারামের বাইরে কীভাবে পাওয়া যাবে? এজন্য মক্কায় থাকা অবস্থায় কোনো বাহানাতেই মসজিদে হারামের জামাত থেকে বঞ্চিত থাকা উচিত নয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন।

ইহরামের চাদরকেই ইহরাম মনে করা।

হজ্ব বা উমরার সূচনা হয় 'ইহরাম' দ্বারা। হজ্ব বা ওমরার নিয়তে তালবিয়া পাঠ করলে 'ইহরাম' সম্পন্ন হয়। ইহরামের মাধ্যমে হজ্ব শুরু হয় এবং নির্ধারিত সময়ে চুল মুণ্ডন বা ছোট করার দ্বারা 'হালাল' হওয়া পর্যন্ত ইহরামের হালত বাকী থাকে। ইহরাম গ্রহণকারী ব্যক্তিকে 'মুহরিম' বলে। ইহরামের হালতে পুরুষের জন্য পোশাকের বিধান এই যে, শরীরের কোনো অঙ্গের আকারে প্রস্তুতকৃত বা সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা যাবে না। টুপি, মোজা, জামা, কোর্তা, সদরিয়া, গেঞ্জি, পাজামা, সেলোয়ার, শার্ট, প্যান্ট, আন্ডারওয়্যার এবং এ ধরনের সকল পোশাক ইহরামের হালতে পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। এজন্য তারা ইহরামের হালতে শুধু চাদর ব্যবহার করবেন। একটি চাদর পাজামার স্থলে অপরটি পাঞ্জাবির স্থলে। ইহরামের হালতে লুঙ্গি পড়ার অনুমতি থাকলেও উত্তম হল চাদর পরিধান করা। পুরুষের জন্য ইহরামের হালতে মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করাও জায়েয নয়। এজন্য চাদর পরিধান করা যাবে, কিন্তু এর দ্বারা মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা যাবে না। এই দুই চাদর পাক-সাফ হওয়া চাই। সাদা হলে ভালো। তবে নতুন হওয়া জরুরি নয়।

এই চাদর যেহেতু ইহরামের হালতের পোষাক তাই অনেক সময় একে 'ইহরাম' বলা হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ ছাড়া শুধু এই কাপড় পরলেই কেউ 'মুহরিম' হয়ে যাবে। কেননা নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ ছাড়া শুধু দুটো সাদা কাপড় পরার দ্বারা 'ইহরাম' সম্পন্ন হয় না এবং হজ্বও শুরু হয় না।

অদ্রূপ ইহরামের চাদরকে ইহরাম মনে করার কারণে কেউ কেউ মনে করেন, ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করা যায় না কিংবা তা নাপাক হয়ে গেলে যেন ইহরামই নষ্ট হয়ে গেল! অথচ তা নয়। ইহরামের চাদর পরিবর্তন করার, ধোয়ার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। অদ্রূপ তা নাপাক হয়ে গেলেও ইহরামের কোনো ক্ষতি হয় না। চাদরটি ধুয়ে পাক করে নিলেই হল কিংবা তা বদলে নিলেই হল।

এই বিষয়টি এত লম্বা করে বলার কারণ এই যে, আমি নিজে অনেক ভাইকে এই সব ভুল ধারণা পোষণ করতে দেখেছি, যার মূল কথা এই যে, তারা ইহরামের পোষাককেই 'ইহরাম' মনে করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই মাসআলাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যদি কোনো ব্যক্তি ভুলক্রমে ইহরামের চাদর ব্যাগে রেখে দেয় এবং তা অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ভিতরে চলে যায়, যার কারণে জিদ্দা পৌঁছার আগে ওই কাপড় পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না, অন্যদিকে বিমান বন্দরে ইহরামের হালতে পরা যায় এমন কোনো কাপড়ের ব্যবস্থা করাও সম্ভব না হয় তখন এই দুশ্চিন্তায় পড়ে যাওয়ার কারণ নেই যে, 'ইহরাম' কীভাবে সম্পন্ন হবে? বরং কর্তব্য হল বিমান জিদ্দায় পৌঁছার ঘন্টাখানেক আগে সাধারণ কাপড় পরিহিত থাকলেও নিয়ত ও তালবিয়ার মাধ্যমে 'ইহরাম' সম্পন্ন করবে। জিদ্দা পৌঁছার পর লাগেজপত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোষাক পরিবর্তন করে চাদর পরিধান করবে। আর ইহরামের হালতে দু-আড়াই ঘন্টা বা তার বেশি সময় জামা-পাজামা ইত্যাদি পরিহিত থাকার কারণে যে কাফফারা আসে তা আদায় করবে।

তো যাদের এই বিভ্রান্তি আছে যে, ইহরামের চাদরই ইহরাম তারা সেই চাদর পরা ছাড়া নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ করলেও ইহরাম হবে না মনে করে বিনা ইহরামে জিদ্দায় পৌঁছে যায়, যার কারণে বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার গোনাহ যেমন হয় তেমনি দমও ওয়াজিব হয়ে যায়। এজন্য কর্তব্য হল, হজ্বের পূর্বে হজ্বের মাসাইল পরিষ্কারভাবে জেনে নেওয়া যেন

বিভ্রান্তি বা ভুল প্রচারণার শিকার হয়ে অযথা কষ্ট পোহাতে না হয় এবং অসচেতনভাবে হজ্ব অসম্পূর্ণ বা বিনষ্ট হওয়ারও আশঙ্কা না থাকে।

হিযবুল বাহ্‌র মাছূর দুআ নয়

হিযবুল বাহর নামে যে অযীফাটি প্রসিদ্ধ তাতে বিক্ষিপ্তভাবে কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন দুআ বিদ্যমান থাকলেও সব দুআ কুরআন-হাদীসের নয়। তদ্রূপ পূর্ণ অযীফা এইভাবে তো কুরআন-হাদীসে অবশ্যই নেই। এটি আবুল হাসান শাযিলী রহ. তদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ইলহামের মাধ্যমে লাভ করেছেন। একে কুরআন-হাদীসের মাছূর দুআর মতো গুরুত্ব দেওয়া কিংবা তার চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া ঠিক নয়। তবে যেহেতু এই অযীফায় কোনো ভুল কথা নেই এবং এর অধিকাংশ শব্দ বিক্ষিপ্তভাবে কুরআন-হাদীসে রয়েছে এজন্য ব্যক্তিগতভাবে কেউ আমল হিসেবে পড়লে তা না-জায়েযও নয়। তবে সাওয়াব ও বরকত অবশ্যই মাছূর দুআতেই বেশি। যদিও দুনিয়াতে কখনো কোনো গায়রে মাছূর দুআর ক্রিয়া দ্রুত দেখা যাক। কেননা, এটি ভিন্ন বিষয়। আল্লাহ্‌র খাস বান্দারা সর্বদা বাহ্যিক ক্রিয়ার চেয়ে সাওয়াব, বরকত ও নূরানিয়াতের প্রতি লক্ষ করে থাকেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, আজকাল আমাদের মাঝে যিকির ও দুআর বিষয়ে অত্যন্ত শৈথিল্য লক্ষ করা যায়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সব ধরনের উদাসীনতা থেকে রক্ষা করুন! আমীন।

জানুয়ারি- ২০১০

একটি উদাসীনতা

হিজরী বর্ষ ও চান্দ্রমাসের তারিখ ব্যবহারে উদাসীনতা!

এ প্রসঙ্গে আলকাউসারে একাধিকবার লেখা হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল দ্বীনদারদের মধ্যেও এ বিষয়ে ব্যাপক উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। কাউকে তারিখ জিজ্ঞাসা করলেই নিঃসঙ্কোচে ও কোনো ভূমিকা ছাড়াই ইংরেজি ক্যালেন্ডারের তারিখ বলে থাকেন। যেন এটাই একমাত্র ক্যালেন্ডার। কোনো চিঠি বা লেখায় তারিখ লিখতে হলে ইংরেজি তারিখ লেখা হয়, কোনো ঘটনার তারিখ বলতে হলেও তা-ই বলা হয়, এমনকি অধিকাংশ তালিবে ইল্‌ম তাদের শিক্ষাজীবনের তারিখও যদি মনে রাখে তাহলে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসাবেই মনে রাখে।

গত বছর মদীনা মুনাওয়ারায় শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা (হাফিযাহুল্লাহ্)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্র তারিখের পর ইংরেজি তারিখ উল্লেখ করেছিলাম। তিনি তখন বলেছিলেন,

نحن لا نعرف ذلك إنما نعرف...

এই ক্যালেন্ডারের সঙ্গে তো আমাদের পরিচয় নেই।

পক্ষান্তরে অন্য এক ব্যক্তির কোনো প্রশ্নের উত্তরে আমি যখন চন্দ্র তারিখ বলেছি তখন তিনি কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ইংরেজি তারিখ বলুন!

কোনো সন্দেহ নেই যে, হিজরী সন-তারিখ ব্যবহারের বিষয়ে এই উদাসীনতা এখন আর সাধারণ মানুষের ভুল-ত্রুটির মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। এটি এখন (খাওয়াছের) বিশিষ্ট-ব্যক্তিদের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে।

এটি খুবই দুঃখজনক। এই উদাসীনতা বাহ্যত ছোট মনে হলেও তা অনেক বড় কিছু বিষয়ের ফলাফল। তদ্রূপ এর পরিণতিও অত্যন্ত মারাত্মক। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

ভুল মাসআলা

শিশুর জন্য কি তার বোনের দুধ পান করা নিষেধ?

এই পাতার লেখাগুলো যখন তৈরি করছি তখন এক ভাইয়ের ফোন এল যে, 'একটি শিশুর জন্মের সময় তার মা ইন্তেকাল করেন। (আল্লাহ্ তাআলা তার মাগফিরাত করুন এবং তাকে জান্নাত নসীব করুন এবং তার সন্তানের উত্তম প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে দিন। আমীন।) এখন তাকে দুধ পান করানোর মতো কেউ নেই। শুধু বড় বোন তাকে দুধ পান করাতে পারে কিন্তু এটা তো সম্ভবত জায়েয না? এখন তার জন্য কী করা যায়?' আমি আরজ করলাম, শিশু তার বোনের দুধ পান করতে পারে না, তা আপনাকে কে বলেছে? তিনি বললেন, সবাই তো এমনই মনে করে। আমি আরজ করলাম, সবাই যদি এমন মনে করে থাকে তবে তা প্রচলিত ভুলের অন্তর্ভুক্ত। সঠিক বিষয় এই যে, দুধ পানের মেয়াদের ভিতরে শিশুকে যে কোনো মহিলার দুধ পান করানো যায়, তিনি শিশুর মাহরাম হোন অথবা গায়র মাহরাম। তবে এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, শিশুর দুধ-মা হিসেবে দ্বীনদার মহিলা নির্বাচন করা আবশ্যক, ফাসিক-ফাজির নারীর দুধ পান না করানো উচিত। কেননা, শিশুর স্বভাব-চরিত্র তৈরির পিছনে দুধেরও ভূমিকা থাকে।

ভুল ধারণা

মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায জরুরি মনে করা।

মসজিদে জামাতে নামায পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি মসজিদে নববীতে জামাতে শামিল হওয়ার সুযোগ হয়ে যায় তাহলে তো নূরুন আলা নূর। কেননা, এখানে এক নামায (কম সে কম) হাজার নামাযের সমতুল্য। হজ্বের সময় মসজিদে নববীতে উপস্থিত হওয়ার এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারকে গিয়ে সরাসরি সালাম আরজ করার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশে সফরের ধারা হাজী ছাহেবানদের মধ্যে রয়েছে, যা অতি উত্তম আমল। কিন্তু সেখানে অবস্থানের জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো মেয়াদ নির্ধারিত নেই। অর্থাৎ এটা অপরিহার্য নয় যে, সেখানে কম সে কম আট দিনই থাকতে হবে।

কোনো কোনো মানুষ আট দিন অবস্থানকে এত জরুরি মনে করে যে, এর জন্য নিজেকে, সফরসঙ্গীদেরকে এবং কাফেলার আমীরকে কষ্টে ফেলে দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। অথচ তা শরীয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত কোনো মেয়াদ নয় যে, তা পূরণ করা এত জরুরি মনে করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে মুসনাদে আহমদ (৩/১৫৫) ও তবারানীতে (৫৪৪) একটি রেওয়ায়েত আছে যে, কেউ যদি এই মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে নববীতে) ধারাবাহিকভাবে চল্লিশ নামায আদায় করে তাহলে সে জাহান্নামের আযাব ও নিফাক থেকে মুক্তি পাবে।

এই রেওয়ায়েতের কারণে লোকেরা আট দিন অবস্থান করা জরুরি মনে করে নিয়েছে। অথচ সনদের বিচারে তা জয়ীফ। উপরন্তু এই হাদীসের প্রসিদ্ধ মতন সেটি যা তিরমিযীতে রয়েছে- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য চল্লিশ দিন জামাতে তাকবীরে উলার সঙ্গে নামায আদায় করে তার জন্য দুটো পরোয়ানা লেখা হয় : জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরওয়ানা ও নিফাক থেকে মুক্তির পরওয়ানা।' (জামে তিরমিযী হাদীস : ২৪১)

অতএব স্পষ্টত বোঝা যায় যে, এই ফযীলত যে কোনো মসজিদে জামাতে শামিল হওয়া দ্বারা হাসিল হতে পারে।

প্রসঙ্গত ভুল না বোঝার অনুরোধ করব। ফযীলতের ক্ষেত্রে জয়ীফ রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য, তা আমার জানা আছে। কিন্তু একই সাথে এটাও সত্য যে, জয়ীফ দ্বারা শরীয়তের কোনো বিধান প্রমাণ হয় না এবং কোনো

মেয়াদ বা পরিমাণ নির্ধারিত হয় না। এজন্য সহজভাবে সেখানে আট দিন থাকার সুযোগ হয়ে গেলে ভালো, কিন্তু একে জরুরি মনে করা বা জরুরি বিধানের মতো এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া যে, কষ্ট ও পেরেশানিতে পড়ে যেতে হয় কিংবা পরস্পর মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়, ঠিক নয়। প্রকৃত করণীয় হচ্ছে, হারামাইনে যতদিন থাকার সুযোগ হয় চেষ্টা করবে যেন মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করা হয়।

হাদীস নয়

জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও।

আরবীতে বলা হয়– اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ

বাক্যটি ব্যাপকভাবে হাদীস হিসাবে বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটি পরবর্তী কারো বাণী। তবে সন্দেহ নেই যে, বক্তব্যটি সঠিক ও বাস্তবসম্মত। ইল্‌মে দ্বীন হাসিলের জন্য যত দূরের সফরই হোক, তাওফীক হলে করা উচিত। ইল্‌ম অন্বেষণে কখনো মেহনত-মুজাহাদাকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। তদ্রূপ পার্থিব জীবনে প্রয়োজনীয় শিল্প ও বিদ্যা শিক্ষার জন্যও দূর-দূরান্তে সফর করা জায়েয; বরং তা একটি পর্যায় পর্যন্ত কাম্যও বটে। এই সকল কিছু স্বস্থানে বিদ্যমান আছে এবং শরীয়তের বিভিন্ন দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বাক্যটি হাদীস নয়। যদিও তা হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সনদে আবু 'আতিবা তরীফ ইবনে সুলায়মান নামক একজন রাবী আছে যে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের দৃষ্টিতে মতারূক (পরিত্যক্ত)। তাকে হাদীস জাল করার অভিযোগেও অভিযুক্ত করা হয়েছে।

রিজাল ও রেওয়ায়েত-শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আবু জা'ফর উকাইলী লেখেন–

و لا يحفظ ولو بالصين,إلا عن أبي عاتكة، و هو متروك الحديث، و فريضة على كل مسلم الرواية فيها لين أيضا، متقاربة في الضعف.

–আয-যুআফাউল কাবীর, উকাইলী ২/২৩০; কিতাবুল মাজরূহীন, ইবনে হিব্বান ১/৩৮২; মিযানুল ইতিদাল ২/২৫৮; আলমুনতাখাব মিনাল ইলাল লিল-খাল্লাল ইবনে কুদামাহ পৃ. ১২৯-১৩০; আলমাকাসিদুল হাসানা, সাখাভী পৃ. ১২১

ভুল ধারণা

শাহজালাল রহ. ও শাহজালালের মাযার কি এক বিষয়?

বর্তমান অজ্ঞতার যুগে মানুষের বিচার-বিবেচনা এতই হ্রাস পেয়েছে যে, অশ্রুতপূর্ব কথা-বার্তা এবং অভাবিতপূর্ব ধ্যান-ধারণা কর্ণগোচর হওয়া স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবর ও মাযারের গর্হিত কার্যকলাপ এবং শিরক ও বিদআত সম্পর্কে যখন কাউকে সাবধান করা হয়, যেমন কবরে মেলা বসানো, ওরস করা, আলোকসজ্জা করা, ফুল দেওয়া, কবরের উপর ছাদ বা ইমারত নির্মাণ করা, কবরের তাওয়াফ করা, সিজদা করা, কবর কিংবা তার উপর নির্মিত দেয়াল বা ইমারতে হাত বুলানো বা চুম্বন করা, কবরওয়ালার নিকটে প্রার্থনা, মাযারের নামে মান্নত, মাযারের উদ্দেশে সফর, নারীদের মাযারে গমন, পর্দাহীনতা, পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ইত্যাদি শিরক, বিদআত ও গর্হিত কার্যকলাপ সম্পর্কে যখন সাবধান করা হয় তখন কিছু মানুষ বোকার মতো বলতে থাকে যে, ভাই! এই সব কাজ তো শাহজালাল রহ. এবং অমুক অমুক বুযুর্গের মাযারে হয়ে থাকে। তাহলে তা না-জায়েয কীভাবে হয়? এমনিভাবে অনেকে মাযারের গর্হিত কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করাকে বুযুর্গদের সঙ্গে বেআদবী বলে মনে করে! তাহলে কি তারা বুযুর্গের মাযারকেই বুযুর্গ মনে করে কিংবা মনে করে যে, মাযারে শায়িত বুযুর্গেরা এইসব মাযার ও মাযার-পুজার সূচনা করে গেছেন? অথবা মাযার-ব্যবসায়ী ভণ্ড এবং মাযার-পুজারী ভক্তদেরকেও বুযুর্গানে দ্বীন মনে করে?! শাহজালালের দরগায় গর্হিত কার্যকলাপে লিপ্ত লোকেরাও কি শাহজালাল?!

একথা তো বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না যে, কোনো ব্যক্তি নিজের কবরকে মাযারে পরিণত করতে পারে না। কবরে শায়িত ব্যক্তি কীভাবে ওই কবরের উপর মাযার নির্মাণ করবে? অতএব বুযুর্গানে দীনের কবরকে মাযারে পরিণত করা এবং তাতে বিভিন্ন গর্হিত কর্মকাণ্ড আরম্ভ করা নিশ্চয়ই পরবর্তী কারো কাজ হবে। শাহজালাল রহ.-এর কবরে এইসব কাজ কারা শুরু করেছে? তাঁর কোনো শীষ্য, খলীফা, সুন্নতের অনুসারী কোনো বুযুর্গ? কক্ষনো না; বরং এসব তাঁর ইন্তেকালের বহু বছর পর একশ্রেণীর মাযার-ব্যবসায়ী এবং সুফী-সাধনার নামে অবাধ যৌনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পৃষ্ঠপোষক বিদআতী ও মুলহিদ গোষ্ঠীর উদ্ভাবন। এজন্য কেউ যদি এইসব গর্হিত কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেন এবং মাযারের পাণ্ডা ও দর্শনার্থীদের

সম্পর্কে (যারা ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে বা ভুল পন্থায় যিয়ারত করে থাকে) আপত্তি করেন তা হবে ঈমানের দাবি পূরণ, যা মাযারে শায়িত ওইসব বুযুর্গরাও প্রচার করে গেছেন, তাকে বুযুর্গানে দীনের মর্যাদা নষ্টকারী বা বিদ্বেষ পোষণকারী আখ্যা দেওয়া চরম মূর্খতা। তাঁরা বুযুর্গানে দীনের অবমাননাকারী নয়; বরং তাঁদের ঈমানী ও কুরআনী শিক্ষারই ধারক-বাহক। অতএব সাবধান; মাযার ও মাযারে শায়িত বুযুর্গদের এক মনে করবেন না। অন্যথায় আপনিই হবেন বুযুর্গানে দীনের অবমাননাকারী।

ভুল চিন্তা

ইসলাহে নফস এবং যিকির ও অযীফা কি শুধু বাইয়াত হওয়া মুরীদের কাজ?

আমাদের মাঝে কত মানুষ যে জেনে-বুঝে বা নিজের অজান্তে উপরোক্ত ভুল ধারণার শিকার, তার ইয়ত্তা নেই। মনে করা হয় যে, ইসলাহে নফস তো ওই ব্যক্তির কাজ, যে কোনো পীরের হাতে মুরীদ হয়েছে। অথচ কে তাকে বোঝাবে যে, এটা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য? বাইয়াত হওয়া বা মুরীদ হওয়া তো এর অনুশীলনের জন্য। অর্থাৎ এই দায়িত্ব মুরীদ হওয়ার কারণে অর্পিত হয় না; বরং তা সাধারণভাবে সকল মুসলমানের কর্তব্য। বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা পাওয়া।

চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক মুসলমান কালেমা পাঠের মাধ্যমেই বাইয়াত হয়েছে এবং আখিরাতের ইরাদা রাখার কারণে সে মুরীদও বটে। প্রথাগত বাইয়াত তো উপরোক্ত বাইয়াত ও ইরাদারই নবায়নমাত্র। অতএব মুসলিমমাত্রই মুরীদ ও সালিক।

একজন মুমিনের চিন্তার স্তর পরিমাণ উন্নত অবশ্যই হওয়া চাই যে, নফস ও শয়তানের এসব স্পষ্ট প্রতারণা তাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। এজন্য আমি নিজেকে ও আমার সুহৃদয় বন্ধুদেরকে বিনীত অনুরোধ করছি, তারা যেন মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নুমানী রহ.-এর পুস্তিকা 'তাসাওফ ক্যায়া হ্যায়' (তাসাওউফ কী ও কেন) বা তাঁর কিতাব 'দ্বীন ও শরীয়ত'-এ উপস্থাপিত ইসলাহী কর্মসূচি মোতাবেক কাজ শুরু করেন এবং যিকির ও দুআর ইহতিমাম করেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

একটি আশ্চর্য অপবাদ

কাফির মারা গেলে কি 'ফী নারি জাহান্নামা' বলতে হয়?

একজন ধর্ম-বিদ্বেষী ব্যক্তি সম্পর্কে শুনেছি যে, সে দ্বীনী মাদরাসা সম্পর্কে সমালোচনা করে লিখেছে, 'এসব প্রতিষ্ঠানে শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়, কোনো বিধর্মীর মৃত্যুর সংবাদ পেলে 'ফী নারি জাহান্নামা খালিদীনা ফীহা' বলতে হয়!'

আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে মিথ্যাচার ত্যাগ করার তাওফীক দান করুন। উপরোক্ত বক্তব্য শরীয়ত ও দ্বীনী মাদরাসা উভয়ের সম্পর্কেই মিথ্যাচার। না মাদরাসায় এই শিক্ষা দেওয়া হয় আর না শরীয়তে কোথাও এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

একজন ব্যক্তি জীবদ্দশায় কাফির হলেও তার মৃত্যু কোন হালতে হয়েছে তা তো গায়েবী বিষয়, যা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। যাদের কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণের সংবাদ শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তাদের বিষয় আলাদা। এছাড়া সাধারণভাবে কারো সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, সে কাফির অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেছে। অতএব তার মৃত্যুতে 'ফী নারি জাহান্নামা' কীভাবে বলা যায়? উপরন্তু কাফির অবস্থায় মারা গেলেও এই বাক্য পড়তে হয়–এই বিধান কোথায় আছে? কারো সম্পর্কে কিছু বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা শুধু শরীয়তেরই বিধান নয়, সভ্যতা ও শরাফতেরও অপরিহার্য দাবি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এই শরাফত দান করুন। আমীন।

মার্চ -২০১০

একটি কুসংস্কার

বৃষ্টির জন্য ব্যাঙের বিয়ে!

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই যুগকে যেখানে সচেতনতার যুগ বলে দাবি করা হয়, সেই সময় এই ধরনের মারাত্মক কুসংস্কারের কথা যখন পত্রিকার পাতায় দেখি তখন বড়ই অবাক হতে হয়। বৃষ্টির জন্য পুরো দেশজুড়ে হাহাকার উঠলে দেশের উত্তর-দক্ষিণবঙ্গে এই ধরনের একটি প্রথার কথা আমি বেশ ক'বার পত্রিকার পাতায় দেখেছি। অনাবৃষ্টির কারণে এক গ্রামের লোকেরা মিলে একটি ব্যাঙ ধরে অত্যন্ত ঢাকঢোল পিটিয়ে আরেক গ্রামের একটি ব্যাঙের সাথে বিশেষ কায়দায় বিয়ে দেয়। এতে উভয় গ্রামের লোকেরা

বিয়ের মতো হৈ-হুল্লোড় করে আনন্দ উদযাপন করে! তাদের ধারণা, এতে করে বৃষ্টি নেমে আসে!! নাউযুবিল্লাহ।

বৃষ্টির সাথে ব্যাঙের কী সম্পর্ক? আর তাদের বিয়েরই বা কী তাআল্লুক? এমন হিন্দুয়ানী কুসংস্কার আদি যুগের অনেক কুসংস্কারকেও হার মানায়। আর কেউ যদি বৃষ্টি বর্ষণকে ব্যাঙের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় তবে তা তো সুস্পষ্ট ঈমান বিধ্বংসী বিশ্বাস। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।'

অনাবৃষ্টি হলে কী করতে হবে, তার সুন্দর নির্দেশনা ইসলামেই বিদ্যমান। ইস্তিগফার করা, উন্মুক্ত মাঠে 'সালাতুল ইসতিস্কা' আদায় করা, সম্মিলিতভাবে দুআ করার কথা হাদীসে এসেছে। প্রত্যেকটি হাদীসের ও ফিকহের কিতাবে এই সংক্রান্ত স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। অতএব সে নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ্র কাছেই বৃষ্টি চাওয়া উচিত।

ভুল ধারণা

চাশতের নামায কি আট রাকাতই পড়তে হবে?

সেদিন একজনকে খুব আফসোসের সাথে বলতে শুনলাম, সময়ে কুলোয় না, তাই চাশতের নামায পড়তে পারি না। ওযু করে আট রাকাত নামায পড়তে তো আর কম সময় লাগে না! বললাম, আট রাকাতই পড়তে হবে কেন? সে আশ্চর্য সুরে বলল, এর কমে কি চাশত হয়?

আসলে এটি একটি ভুল ধারণা। আট রাকাতের কমেও চাশত পড়া যায়। একটি হাদীসে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাত চাশত পড়তেন। আল্লাহ্ চান তো, এর চাইতে বেশিও পড়তেন।' –সহীহ মুসলিম হাদীস : ৭১৯

হযরত আবু যর রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়া-গ্রন্থির উপর সদকা রয়েছে। অতএব (এর জন্য) প্রত্যেক তাসবীহ সদকা হবে। প্রত্যেকটি তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ বলা) সদকা হবে, প্রত্যেকটি তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সদকা হবে, প্রত্যেকটি তাকবীর সদকা হবে, আমর বিল মারূফ সদকা হবে, নাহি আনিল মুনকার সদকা হবে। (অর্থাৎ এর প্রত্যেকটি দ্বারা ঐ সদকা আদায় করা যাবে।) আর এর

প্রত্যেকটির জন্য চাশতের দু'রাকাত নামাযই যথেষ্ট হবে।' –সহীহ মুসলিম হাদীস : ৭২০
অতএব চাশতের নামায কমপক্ষে দু'রাকাতও পড়া যাবে। বেশি তো পড়া যাবেই।

হাদীস নয়

যে আমার সেবা করে, তুমি তার সেবা কর আর যে তোমার সেবা করে তাকে কষ্ট দাও...!

أَوْحَى اللهُ إِلَى الدُّنْيَا،أُخْدُمِيْ مَنْ خَدَمَنِيْ،وَ أَتْعِبِيْ مَنْ خَدَمَكِ

দুনিয়ার কাছে আল্লাহ্ ওহী প্রেরণ করেছেন, (দুনিয়া!) যে আমার সেবা করে, তুমি তার সেবা কর আর যে তোমার সেবা করে তাকে কষ্ট দাও।
দুনিয়া-বিমুখতা ও আখিরাতের জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে কোনো কোনো মানুষ এই কথা বলে থাকেন যে, হাদীসে কুদসীতে আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার কাছে এই মর্মে ওহী পাঠিয়েছেন যে, হে দুনিয়া! যে ব্যক্তি আমার সেবা করে, তুমিও তার সেবা কর। আর যে ব্যক্তি তোমার সেবা করে (অর্থাৎ দুনিয়ার পেছনে পড়ে থাকে) তুমি তাকে কষ্ট দাও।'
এটি হাদীস নয়। কারণ এর সূত্রের মধ্যে 'হুসাইন বিন দাউদ বালাখী' নামক একজন রাবী রয়েছে, যে হাদীস জাল-করণের অভিযোগে অভিযুক্ত।
(দেখুন : আলমুগনী ১/২৫৩; তানযীহুশ শরীয়াহ ১/৫২)

তাই খতীবে বাগদাদী রহ. 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে (৮/৪৪) এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে বলেন,

تفرد بروايته الحسين عن الفضيل، و هو موضوع

অন্যান্য হাদীস বিশারদও তার সঙ্গে একমত।

দেখুন, ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূআত ২/৩২৩; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূআ ২৩৮, আরো দেখা যায় : আল-লাআলী ২/৩২১; তানযীহুশ শরীয়াহ ২/৩০৩

তবে উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার আসক্তি ও ভালবাসা ত্যাগ করা, দুনিয়ায় বসবাস করেও দুনিয়া-বিমুখতা আর আখেরাতের অফুরন্ত জীবনের ভালবাসা ও তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের উপর উদ্বুদ্ধকারী কুরআন মজীদের অজস্র আয়াত আর অসংখ্য সহীহ হাদীস তো রয়েছেই, যা একজন মুমিনের জন্য যথেষ্ট।

এরপরও এমন ভিত্তিহীন কোনো বর্ণনার পেছনে পড়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সকল বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

এপ্রিল ২০১০

একটি নতুন রসম

প্রবল বৃষ্টি বন্ধের জন্য আযান!

গত সংখ্যার প্রচলিত ভুল বিভাগে অনাবৃষ্টির দিনে বৃষ্টির অবতরণ কামনা করে প্রচলিত একটি কু-সংস্কারের কথা লিখেছিলাম। সেদিন একজন লেখকের একটি লেখায় আরেকটি নতুন রসমের কথা পড়লাম। তবে তা বৃষ্টি অবতরণের জন্য নয়; বৃষ্টি বন্ধের জন্য। তিনি লিখেছেন , 'বৃষ্টিপাত প্রবল থেকে প্রবলতর হয়, ... কেউ কেউ ব্যাকুল হয়ে ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করে আযান দেওয়ার জন্য, যিনি বৃষ্টি দেন সেই আল্লাহ্ আযান শুনে হয়তবা অনুভব করবেন তাঁর বান্দার অসহায়ত্ব, রহমত করবেন এবং ফিরিয়ে নেবেন বজ্র, বৃষ্টি, বাতাস।'

জানি না, বজ্র-বৃষ্টি ও ঝড়ো বাতাসের সমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'আযান দেওয়ার' এই আমল লেখকের স্রেফ কল্পনা না বাস্তবেও কোনো এলাকায় এর প্রচলন রয়েছে। হয়তো দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পেতে মহান আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাওয়ার চিন্তা থেকেই এই নতুন আমল।

এখানে উল্লেখ্য, সুদিনে আল্লাহ্র শোকর আদায় করা, দুর্দিনে সবর করা এবং তাঁর দেয়া আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে এই কথাও মনে রাখতে হবে যে, এই শোকর, সবর ও আশ্রয় প্রার্থনার ক্ষেত্রে একজন মুমিনকে প্রথমত ঐ আমলগুলোই করা উচিত, যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, অনাবৃষ্টি ও অতি বৃষ্টি দু'টোই বান্দার কষ্টের কারণ। এ থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। অনাবৃষ্টির সময় আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি চাওয়ার সুন্দর নিয়ম যেমন ইসলামে রয়েছে তেমনি অতি বৃষ্টির ক্ষতি থেকে বাঁচতে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় নেওয়ার সুন্দর শিক্ষাও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে দিয়েছেন। একজন মুমিনকে তাঁর শিক্ষা দেওয়া আমলের মাধ্যমেই আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করা উচিত।

সহীহ হাদীসে এসেছে, একবার মদীনায় এক সপ্তাহ একাধারে প্রবল বৃষ্টিপাত হল। অবিরাম বৃষ্টির সমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে সাহাবীগণ প্রিয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌র দরবারে দুআ করার জন্য অনুরোধ করেন। তখন নবীজী এভাবে দুআ করেন,

اللهم حواليا و لا عليا، اللهم على الآكام و الطراب و بطون الأودية و منابت الأشجار

নবীজীর দুআর ফলে মুহূর্তে মদীনার আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

–সহীহ বুখারী, হাদীস : ১০১৪

এমনিভাবে ঝড়-তুফানের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ করতেন,

اللهم إني أسألك خير ما أمرت به، و أعوذ بك من شر ما أمرت به

আর বাতাস কমে বৃষ্টি নেমে এলে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল দেখাত। তখন তিনি আল্লাহ্‌র 'হামদ' করতেন, বলতেন, এটি 'রহমত'। আরও বলতেন,

اللهم صيبا نافعا –ফাতহুল বারী ২/৬০৪, ৬০৮

অতএব হাদীসে বর্ণিত এসব দুআ, এছাড়া অন্যান্য দুআ-ইস্তিগফার বা 'সালাতুল হাজত' পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে এ সকল বালা-মুসিবত থেকে পানাহ চাওয়া উচিত। কিন্তু আযান তো ইসলামের অন্যতম শেআর। যার জায়গা ও ক্ষেত্রগুলো শরীয়ত কর্তৃক সুনির্ধারিত। তাই সেই নির্ধারিত জায়গাতেই এই আমল সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

হাদীস নয়

মকতবে ঈসা আ.-এর আলিফ, বা... ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেওয়া!

কোনো কোনো বক্তাকে এই ধরনের ঘটনা বলতে শোনা যায় যে, *হযরত ঈসা আ.-কে বাল্যকালে তাঁর মা মারইয়াম আ. যখন মকতবে পাঠিয়েছিলেন তখন মকতবের শিক্ষক তাঁকে বললেন, বল, আলিফ, বা...। ঈসা আ. প্রশ্ন করলেন, আলিফ অর্থ কী? শিক্ষক ছোট ছেলের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তখন ঈসা আ. নিজেই শিক্ষকের চেয়ারে বসে আলিফ থেকে শুরু করে ইয়া পর্যন্ত প্রতিটি বর্ণের ব্যাখ্যা*

করলেন এবং প্রত্যেকটি বর্ণ থেকে আল্লাহ্‌র বিভিন্ন মহিমার বর্ণনা দিলেন। আবার অনেক বক্তার মুখে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের প্রতিটি বর্ণের আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা দেওয়ার কথাও শোনা যায়।

কিন্তু বাস্তবতা হল, এই সংক্রান্ত ঘটনা ও বর্ণনা কোনোটিই প্রমাণিত নয়। যে সকল বর্ণনায় এই ধরনের ঘটনা রয়েছে তাকে হাদীস-বিশারদরা প্রমাণিত নয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. বলেছেন,

ما يصنع مثل هذا إلا ملحد يريد شين الإسلام، أو جاهل في غاية الجهل، و قلة المبالاة بالدين (আলমাওযূআত ১/৩২৮-৩৩০)

হাফেয সুয়ূতী রহ.সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসও তার সাথে একমত। আল্লামা শাওকানী রহ. বলেছেন,

هو موضوع كما قال ابن الجوزي،و في إسناده إسماعيل بن يحيى كذاب

আলফাওয়াইদুল মাজমূআহ পৃ. ৪৯৭। আরো দেখা যেতে পারে : আলকামিল ১/৩০৩; মিযানুল ইতিদাল ১/২৬৯-২৭০; লিসানুল মিযান ২/১৮১-১৮২; তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/১৯; আললাআলী ১/১৭২, তানযীহুশ শরীয়াহ ১/২৩১)

এছাড়া সেই সময় ঐ এলাকার ভাষাও আরবী ছিল না যে, মকতবে আরবী বর্ণমালার পাঠদান চলবে। আর বাল্যকাল থেকে হযরত ঈসা আ. থেকে প্রমাণিত ও সত্য আশ্চর্যজনক ঘটনাবলি বা মুজিযা অনেক রয়েছে, সেগুলোই বয়ান করা উচিত। অতএব এ ধরনের ভিত্তিহীন বর্ণনার বয়ান একেবারেই পরিহার করা উচিত।

মে ২০১০

ভুল শব্দ

অকাল মৃত্যু

কম বয়সে কারো মৃত্যু হলে অকাল মৃত্যু শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই প্রয়োগ এড়িয়ে চলা কর্তব্য। কারণ প্রত্যেক প্রাণীর জন্য 'মৃত্যু' যেমন অনিবার্য তেমনি তার দিন-ক্ষণও নির্ধারিত। সেই নির্ধারিত সময়েই তার মৃত্যু হবে। এতে সামান্য এদিক-সেদিক হবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, و ماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا

আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না। কেননা, তা সুনির্ধারিত।
–সূরা আলইমরান : ১৪৫

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন,

وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّ لٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى، فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

আর যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের জুলুমের কারণে শাস্তি দিতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কোনো প্রাণীকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতপর যখন তাদের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয় তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারে না। –সূরা নাহল : ৬১। আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন,

قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

আপনি বলে দিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর। –সূরা আল ইমরান : ১৬৮

হায়াত-মওতের মালিক আল্লাহ্ তাআলা এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রাণীর জীবনকাল আল্লাহ্ তাআলার নিকট সুনির্ধারিত। অতএব কেউ যদি মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পর মারা যায়, তবে এইটুকুই তার হায়াত। তদ্রূপ কেউ যদি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যৌবনকালে মৃত্যুবরণ করে তবে এই পঁচিশ-ত্রিশ বছরই তার হায়াত। তার মৃত্যু সেই সময় মতোই হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা যা তার জন্য নির্ধারিত করেছেন।

এমনিভাবে একশ বছর বয়সে কারো মৃত্যু হওয়ার মানে এই নয় যে, সে তার জন্য নির্ধারিত সময়কালের অধিক হায়াত পেয়েছে।

এটি অতি সহজ একটি কথা। সুতরাং কম বয়সে কারো মৃত্যু হলে সমবেদনা জানাব, মরহুমের মাগফিরাতের জন্য দুআ করব, বড় জোর বলব যে, তার তাকদীরে কত কম হায়াত লিখিত ছিল! কিন্তু এটাকে আবেগের বশে অকাল মৃত্যু শব্দে ব্যক্ত করব না।

একটি ভুল শ্লোগান

ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার!

এই মুখরোচক শ্লোগানটি ইদানীং খুব শোনা যায়। একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তোতাপাখির মতো তা আওড়ে থাকেন। সম্ভবত তারা বলতে চান, ধর্ম

ব্যক্তিগত বিষয়। অতএব সমাজ-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।

এই সেক্যুলার ধ্যান-ধারণা হয়তো মানবরচিত ধর্মের ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্ম ইসলামের বেলায় তা সম্পূর্ণ অবাস্তব। এতে অনুপরিমাণ সন্দেহ নেই।

এই বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের পরিষ্কার ধারণা ও অটল ঈমান থাকা অপরিহার্য কর্তব্য।

ইসলামী খেলাফত থাকা অবস্থায় সকল মুসলিম জনপদ ছিল একই কেন্দ্রের অধীন। তখন ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থাসহ ইসলামের জীবন-ব্যবস্থার বাস্তব কাঠামো ছিল প্রত্যেক মানুষের সামনে দৃশ্যমান।

কিন্তু একসময় আমাদের কৃতকর্মের কারণে ইসলামী খেলাফতের দুর্বলতার সুযোগে আল্লাহ্‌র দুশমনরা বিশাল মুসলিম সালতানাতকে টুকরা টুকরা করে ফেলে। মুসলিম জনপদগুলো রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে গেলে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র দেওয়া খেলাফত-ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। দুঃখজনকভাবে বর্তমান সময়ে পৃথিবীর কোনো ভূ-খণ্ডেই পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী খেলাফত-ব্যবস্থা চালু নেই। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মানুষের মন থেকে চিরতরে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থার চিত্র মুছে দিতে আল্লাহ্‌র দুশমনরা এই সব অর্থহীন শ্লোগানের কৌশলী ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছে।

অতএব এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সকল মুমিন-মুসলমানের মনে অনুশোচনা থাকতে হবে এবং জীবনের সকল অঙ্গনে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় শরীয়তসম্মত উপায়ে চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সর্বোপরি অটল বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যদিও আমরা সাময়িকভাবে ইসলামী খেলাফতের রহমত থেকে বঞ্চিত, কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য ইসলামে সুষ্ঠু, সুষম ও প্রতিযুগে কার্যকর আদর্শ ব্যবস্থা রয়েছে, যা সর্বযুগে অশান্ত পৃথিবীর জন্য শান্তির একমাত্র চাবিকাঠি। আল্লাহ্ সকলকে হেফাযত করুন এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ভুল ধারণা

ইস্তিখারার জন্য কি ঘুমাতে হয়?

কোনো কাজ করার ইরাদা করলে কিংবা অত্যাসন্ন কোনো বিষয়ে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতে তাঁরই দরবারে কায়মনোবাক্যে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রার্থনা করার নাম ইস্তিখারা। অর্থাৎ ইস্তিখারার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র কাছে এই প্রার্থনা করে যে, আমি যা করতে চাই তাতে যদি আমার কল্যাণ থাকে তাহলে তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং বরকত দান করুন। আর যদি তাতে কল্যাণ না থাকে তাহলে তা থেকে আমাকে বিরত রাখুন এবং যাতে আমার কল্যাণ তা-ই আমাকে দান করুন। এটিই হল ইস্তিখারার হাকীকত।

ইস্তিখারার জন্য দুটো কাজ করণীয় বলে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে। দুরাকাত নামায আদায় করা এবং ইস্তিখারার প্রসিদ্ধ মাসনূন দু'আটি মনোযোগের সাথে পড়া। সময়ের স্বল্পতা বা অন্য কোনো কারণে এই দুটো কাজ সম্ভব না হলে তিনবার বা সাতবার এই দুআ পড়েও ইস্তিখারা করা যায়,

اللهم خر لي واختر لي

(ইবনুস সুন্নী, হাদীস : ৫৯৭, ৫৯৮)

অতপর যে দিকে কলবের ইতমিনান হবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে সেই কাজ আরম্ভ করবে।

এভাবে আমল করলে ইস্তিখারা হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, এই আমল করার জন্য শরীয়তে নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। রাত বা দিনের যে কোনো সময় তা করা যায়।

কিন্তু অনেকে মনে করে, ইস্তিখারার জন্য ঘুমাতে হয় কিংবা রাত্রি বেলায় ঘুমানোর আগেই শুধু ইস্তিখারা করা যায়। আবার অনেকে মনে করে, স্বপ্ন দেখলেই ইস্তিখারা পূর্ণ হবে।

আসলে এর কোনোটিই ইস্তিখারার জরুরি কোনো বিষয় নয়; বরং রাত-দিনের যে সময় নামায পড়া যায় তখনই দুই রাকাত নামায ও নির্দিষ্ট দুআটি পড়ে ইস্তিখারা করে নেওয়া যায়।

হাদীস নয়

আঠারো হাজার মাখলুকাত।

উপরের কথাটি লোকমুখে এতই প্রসিদ্ধ যে, অনেকের কাছে তা কুরআন-হাদীসের বাণীর মতো স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু মাখলুকাতের এই নির্দিষ্ট সংখ্যা না কুরআনে আছে, না কোনো সহীহ হাদীসে।

বাস্তবতা হল, আল্লাহ্ তাআলা অগণিত মাখলুক পয়দা করেছেন। জলে ও স্থলে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মাখলুক আল্লাহ্র অসীম কুদরতের প্রমাণ। মানুষের জানার বাইরেও রয়েছে অসংখ্য মাখলুক।

আল্লাহ্ তাআলা কত ধরনের মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তার নির্দিষ্ট সংখ্যা সহীহ হাদীসে বলা হয় নি। একটি 'মুনকার' বর্ণনায় এর সংখ্যা 'এক হাজার' বলা হয়েছে। কিন্তু অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনাটিকে মাওযূ বা জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। (আলমাওযূআত, ইবনুল জাওযী ২/২১৬; আলফাওয়াইদুল মাজমুআ পৃ. ৪৫৮-৪৫৯)

এছাড়া এই সংখ্যা সম্পর্কে কিছু মনীষীর উক্তিও রয়েছে। যেমন মারওয়ান ইবনুল হাকামের কথামতে সতের হাজার জগত রয়েছে। আর আবুল আলিয়ার অনুমান অনুযায়ী চৌদ্দ হাজার কিংবা আঠারো হাজার মাখলুকাত আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। এই বিভিন্ন সংখ্যা কিছু মনীষীর উক্তিমাত্র, হাদীস নয়। দ্বিতীয়ত তাদের বক্তব্য থেকেও অনুমিত হয় যে, নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বোঝাতে নয়; বরং আধিক্য বোঝাতেই তারা এ সব কথা বলেছেন। তাও আবার অনুমান করে।

এই কারণে এর কোনোটিকেই প্রমাণিত সত্য মনে করার কোনো কারণ নেই; বরং এ বিষয়ে ইবনে কাসীর রহ.-এর কথাটিই মূল কথা, যা তিনি আবুল আলিয়ার পূর্বোক্ত কথাটি পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করার পর বলেছেন। আর তা হল,

و هذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح

অর্থাৎ এটি এমন একটি আজব কথা, যার জন্য বিশুদ্ধ দলীলের প্রয়োজন রয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/২৬)

অতএব আঠারো হাজার নয়; বরং বলা উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা অসংখ্য অগণিত মাখলুক পয়দা করেছেন, যা আমরা গুণে ও হিসাব করে শেষ করতে পারব না।

ভুল মাসআলা

রিকশা বা যানবাহনে বসে কুরআন তেলাওয়াত করা কি নিষেধ?

আমাদের একজন বড় বুযুর্গ ব্যক্তির মুখে তাঁর নিজের এই ঘটনা কয়েকবার শুনেছি যে, একবার তিনি রিকশায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। চালক তাঁর আখলাকে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিল। রিকশা থেকে নেমে বিদায়ের সময় চালক বলল, আপনার ব্যবহার আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তবে একটি কাজ আপনি ঠিক করেন নি। তা হচ্ছে, আপনি রিকশায় বসে বসে কুরআন শরীফ পড়েছেন। এটা ঠিক না!

বলাবাহুল্য, এটা ঐ বেচারার ভুল ধারণা। কারণ চলাফেরা, উঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ সর্বাবস্থায় যিকর করতে কুরআন মজীদে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আর সর্বোত্তম যিকর হচ্ছে, কুরআন মজীদ তেলাওয়াত।

জুলাই ২০১০

দুটো বিদআত

লাইলাতুর রাগাইব ও শবে ইস্তিফতাহ পালন

কিছুদিন আগে একটি মসজিদে 'ইসলামী পবিত্র দিনসমূহ' শিরোনামের একটি তালিকা নজরে পড়ল। সযত্নে লেখা এই তালিকাটিতে দেখলাম, রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার 'লাইলাতুর রাগাইব' আর রজবের পনেরো তারিখ 'শবে ইস্তিফতাহ'।

আসলে রজব মাস নিয়ে কোনো কোনো মহলে বিভিন্ন কল্পিত বিদআত ও রসমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এর সমর্থনে ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও জালকৃত বিভিন্ন বর্ণনাও 'মাকছুদুল মুমিনীন' ও 'বার চাঁদের ফযীলত ও আমল' জাতীয় কিছু অনির্ভরযোগ্য বইয়ে পাওয়া যায়। যেমন একটি জাল বর্ণনা হল, 'যারা রজব মাসে রোযা রাখে তাদের গুনামাফীর জন্য ফেরেশতাকুল রজবের প্রথম জুমআর রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দোয়ায় মগ্ন থাকেন।'

এরকম আরেকটি ভিত্তিহীন বর্ণনা হল, 'যে ব্যক্তি রজবের প্রথম বৃহস্পতিবার রোযা রাখে অতপর মাগরিব ও ইশার মাঝখানে দুরাকাত করে (বিশেষ পদ্ধতিতে) বার রাকাত নামায আদায় করে তার সকল প্রয়োজন পূরণ করা হয় এবং তার সকল গোনাহ মাফ করা হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা, বালুকণা, পাহাড়ের ওজন এবং বৃক্ষের পাতার সমপরিমাণ হয়। আর কিয়ামতের দিন সে তার পরিবারের সাতশ গোনাহগার জাহান্নামের

উপযোগী মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।' প্রয়োজন পূরণের কথিত এই রাতটির নামও রাখা হয়েছে 'লাইলাতুর রাগাইব'। আর বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখিত নামাযের নাম 'সালাতুর রাগাইব'।

এমনিভাবে পনের রজবের রাত সম্পর্কিত একটি জাল বর্ণনা হল, 'এ রাতে চার রাকাত নামায বিশেষ নিয়মে আদায় করে নির্দিষ্ট পরিমাণ দুরূদ, তাসবীহ-তাহমীদ ও তাহলীল আদায় করলে আল্লাহ্র পক্ষ হতে তার নিকট এক হাজার ফেরেশতা পাঠানো হয়। যারা ঐ ব্যক্তির জন্য নেকী লিখতে থাকেন এবং ঐ রাত পর্যন্ত যত গোনাহ সে করেছে সব ক্ষমা করে দেন। অবশেষে তার কাঁধে হাত রেখে একজন ফেরেশতা বলে, তুমি নতুন করে আমল শুরু কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন ...।'

গোনাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নতুন করে আমল শুরু করার এই বানোয়াট বর্ণনার কারণেই সম্ভবত এই রাতের নাম রাখা হয়েছে 'শবে ইস্তিফতাহ'।

উল্লেখিত বর্ণনা ছাড়াও এই দুই রাত সম্পর্কে এই ধরনের আরো প্রচুর পরিমাণ ভিত্তিহীন বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু আসল কথা হল, শরীয়তে 'লাইলাতুর রাগাইব' ও 'শবে ইস্তিফতাহ' নামে বিশেষ কোনো রাতের অস্তিত্বই নেই!

নামে-বেনামে রজব মাসে এই বিশেষ রাত উদযাপন হচ্ছে নবউদ্ভাবিত বিদআত। কুরআন ও সুন্নাহ্য় যার কোনো প্রমাণ নেই। তেমনিভাবে ঐ রাত বা দিনগুলোতে কোনো নির্দিষ্ট নামায-রোযা বা অন্য কোনো বিশেষ আমলের কথাও ইসলামে নেই। এ সম্পর্কিত সকল বর্ণনা ও রেওয়ায়েত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও জাল।

অতএব 'লাইলাতুর রাগাইব' হোক কিংবা 'শবে ইস্তিফতাহ' এগুলো উদযাপন করা কিংবা কল্পিত ও ভিত্তিহীন বর্ণনার উপর নির্ভর করে বিশেষ ধরনের আমল করা সবই পরিত্যাজ্য। এগুলো থেকে দূরে থাকাই একজন মুমিনের একান্ত কর্তব্য।

একটি বদ রসম

প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, শ্রদ্ধা নিবেদন!

আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আ. হতে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সকল মানুষ এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ছিল এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী

করত। তাদের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিল না। পরবর্তীতে কুফর-শিরকের মতো মারাত্মক ব্যাধির বিস্তার ঘটার পেছনে মূল কারণ ছিল ছবি ও প্রতিকৃতি।

একটি সহীহ্ হাদীস থেকেও বোঝা যায় যে, পূর্ববর্তী যুগের স্মরণীয় বরণীয় নেককার লোকের মৃত্যু হলে তাদের ছবি ও প্রতিকৃতি বানানো হত। ছবি থেকে সম্মান প্রদর্শন, তা থেকে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ানো, তা থেকে সিজদা করাসহ্ ধীরে ধীরে এসব প্রতিকৃতির ইবাদত-বন্দেগী শুরু হল। আল্লাহ্‌র সাথে তাদেরও কিছু অংশীদারিত্ব জুড়ে দিয়ে তারা মুশরিক জাতিতে পরিণত হল।

ইসলামে শিরকের এই উৎসমুখ কঠোরভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে প্রতিকৃতি নির্মাণ বড় ধরনের গোনাহ, সেখানে নানা উপলক্ষে বিভিন্ন মনীষী ও ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতির সামনে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং এ জাতীয় বিভিন্ন উপায়ে শ্রদ্ধা নিবেদন যে কত জঘন্য অপরাধ তা সহজেই অনুমেয়। এ সকল কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী, যা একদিকে মানুষকে শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে এইসব মরহুম মানুষের (আল্লাহ্ সকল বিচ্যুতি ক্ষমা করে তাদের সাথে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মুআমালা করুন) সকল অবদান ও কীর্তিকে কলুষিত করা হচ্ছে।

অতএব শরীয়ত নির্দেশিত পন্থাতেই স্মরণীয়-বরণীয় মরহুম মানুষকে স্মরণ ও বরণ করা উচিত। এ পথেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের মুক্তি ও সফলতা। অন্য কোনো পথে নয়।

অক্টোবর ২০১০

ভুল মাসআলা

বছরের শুরু-শেষের মধ্যে সম্পদের সর্বনিম্ন পরিমাণের যাকাত দেওয়া!

কানাডা-প্রবাসী এক ভাই জানালেন, সে দেশের কিছু ইসলামী সংগঠনের পক্ষ হতে সরবরাহকৃত যাকাতের হিসাব সহজে বের করার নকশাসম্বলিত কাগজে লেখা আছে যে, যাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে বছরের শুরু ও শেষ উভয় সময়ের মধ্যে সম্পদের যে পরিমাণ সর্বনিম্ন সে হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হয়। অতএব যাকাতদাতাকে এই সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পদের যাকাত দিতে হবে। বছরের শেষে এই পরিমাণের চেয়ে সম্পদ বেশি থাকলেও।

এটি সঠিক মাসআলা নয়; সঠিক মাসআলা হল, যাকাত-বর্ষ পূর্ণ হওয়ার সময় যে পরিমাণ সম্পদ থাকবে তার যাকাত আদায় করতে হবে। বছরের শুরুতে ও মাঝে সম্পদ কম থাকুক বা বেশি। যেমন বছরের শুরুতে মুহাম্মাদ আলী সাহেবের কাছে এক লক্ষ টাকার সম্পদ ছিল। বছর শেষে দেখা গেল, তার সম্পদের পরিমাণ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা। তাহলে এখন তাকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। বছরের শুরু কিংবা শুরু-শেষের মাঝে সর্বনিম্ন পরিমাণের হিসাবে নয়।
এই মাসআলা হাদীস, আছার ও ফিকহে ইসলামীতে স্পষ্টভাবে বলা আছে। অতএব মাসআলা দেওয়া ও প্রচার করা সহ দ্বীনী যেকোনো কাজে সকলের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

ভুল ধারণা

বিধর্মীদের 'ঈয়াদাত' ও তাদের সুস্থতার জন্য দুআ করা যাবে কি না?

অমুসলিম প্রতিবেশী বা পরিচিত কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া যাবে না–এমন একটি ধারণা অনেকের রয়েছে। আবার অনেকে মনে করে যে, মানবিক কারণে 'ঈয়াদাত' করা গেলেও সুস্থতার জন্য দুআ করা যাবে না।
দুটো ধারণাই ভুল; বরং প্রতিবেশী, আত্মীয় বা পরিচিত কেউ অমুসলিম হলেও অসুস্থ হলে তার 'ঈয়াদাত' করা উচিত। সেক্ষেত্রে একজন মুসলমানের তাকে দেখতে যাওয়া, খোঁজ-খবর নেওয়া এবং সম্ভাব্য সকল সেবা-শুশ্রূষা করা, উপরন্তু তাদের সুস্থতা ও হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্র কাছে দুআ করাতে অসুবিধার কিছু নেই; বরং পারিপার্শ্বিক অন্য কোনো সমস্যা না থাকলে এমনটি করাই উত্তম। কোনো বিধর্মী আত্মীয় বা প্রতিবেশী অসুস্থ হলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখতে যেতেন এবং দীনের দাওয়াত দিতেন।
সহীহ বুখারীতে আছে, এক ইহুদী কিশোর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তখন সে মুসলমান হয়ে গেল। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩৫৬, ৫৬৫৭)
সুতরাং কোনো পরিচিত অমুসলিম ব্যক্তি অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া ও তার সুস্থতার জন্য দুআ করার অবকাশ আছে। সম্ভব হলে তার সামনে

দীনের দাওয়াতও পেশ করা উচিত। হতে পারে আল্লাহ্ তাআলা তাকে হক কবুল করার তাওফীক দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দান করবেন।

ভুল বিশ্বাস

আলোচনা চলাকালে উপস্থিত হলে হায়াত দীর্ঘ হয়!

অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে কথা চলছে এমন সময় সে উপস্থিত হলে অনেককে বলতে শোনা যায় যে, তুমি লম্বা হায়াত পাবে, আমরা তো তোমার কথাই আলোচনা করছিলাম!

এই ধরনের কথা এত বেশি প্রচলিত যে, শুনে মনে হতে পারে, তা একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এর সাথে হায়াত বাড়া-কমার কোনো সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিশ্বাস। শরীয়তে যেমন এর কোনো ভিত্তি নেই তেমনি বিবেক-বুদ্ধিও এই ধরনের অলীক ধারণা সমর্থন করে না। অতএব এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

হাদীস নয়

মাদরাসা রাসূলের ঘর!

কোনো কোনো ওয়াযমাহফিলে এই ধরনের কথা শোনা যায় যে, 'মসজিদ আল্লাহ্র ঘর আর মাদরাসা রাসূলের ঘর।' আবার কোনো কোনো দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তা আরেকটু আগে বেড়ে এটাকে হাদীস হিসেবে এভাবেও বর্ণনা করেন যে,

اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللهِ وَ الْمَدْرَسَةُ بَيْتِيْ

'মসজিদ আল্লাহ্র ঘর আর মাদরাসা আমার ঘর।'

এখানে লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত কথায় দুটো বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্যটি হল, 'মসজিদ আল্লাহ্র ঘর'। এটি কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত। প্রায় এর কাছাকাছি শব্দ বিভিন্ন হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্য অর্থাৎ 'মাদরাসা রাসূলের ঘর' এটি কোনো হাদীস নয়। কেউ এটাকে হাদীস হিসেবে বললে ঠিক হবে না। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, 'মাদরাসা' যেখানে দীনি তালীম-তরবিয়ত হয়, কুরআন-হাদীসের শিক্ষা দেওয়া হয়, আল্লাহ্ ও রাসূলের কথা আলোচনা হয় তা নিঃসন্দেহে মুবারক

স্থান। এ সকল স্থান ফেরেশতারা ঘিরে রাখেন এবং সেখানে আল্লাহ্র রহমত ও সাকীনা নাযিল হয়। অতএব ওইসব ঘরও আল্লাহ্ ও রাসূলেরই ঘর। কিন্তু তাই বলে 'মাদরাসা রাসূলের ঘর' বাক্যটিকে হাদীস হিসেবে বলার সুযোগ নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি বলেছেন তার কোনো প্রমাণ নেই। আর মসজিদ-মাদরাসার মধ্যে এভাবে বিভাজনও অনুচিত।

নভেম্বর ২০১০

একটি রসম

দিনের প্রথম উপার্জনকে ভক্তি জানানো!

সকালবেলা রাস্তায় চলাচল করলে অনেক সময় দেখা যায় যে, রিকশা, সিএনজি চালকরা দিনের প্রথম উপার্জন হাতে পাওয়ার পর তাতে চুমো দেয়, গাড়ির স্টিয়ারিং, হাতল বা কোনো অংশে ছোঁয়ানোর পরে বুকে ও চোখে লাগায়। অনেককে কপালে ঠেকাতেও দেখা যায়। তদ্রূপ কোনো কোনো ব্যবসায়ীও দিনের প্রথম উপার্জনকে এভাবে ভক্তি জানিয়ে থাকে।

নিজের কষ্টার্জিত অর্থের উপর মানুষের মায়া থাকা স্বাভাবিক। 'দীনে ফিতরাত' ইসলামে এই স্বাভাবিক আকর্ষণ দোষণীয় নয়, কিন্তু উপরোক্ত ছোঁয়াছুয়ি ও কপালে ঠেকানোর মতো ভক্তিমূলক আচরণ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। প্রথম উপার্জনকে ভক্তি জানালে পরবর্তী উপার্জনের পথ সুগম হবে–এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এসব আচরণের সবচেয়ে নিন্দিত দিকটি হল, উপার্জনের মাধ্যমকে অর্থাৎ গাড়ি, পণ্য বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে উপার্জনদাতা মনে করা, এমনকি কারো কারো কথাবার্তা থেকে তো পৌত্তলিকতারও আভাস পাওয়া যায়।

বাস্তব কথা এই যে, এই মাধ্যমগুলো উপলক্ষ্য মাত্র। তাই সবকিছু ঠিক থাকার পরও সবার উপার্জন এবং সব সময়ের উপার্জন সমান হয় না। উপার্জন ও রিযিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার হাতে। তিনি কখন কাকে কিভাবে রিযিক দিবেন এবং কোন উপায়ে দিবেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের কাজ হল হালাল উপার্জনের চেষ্টায় আল্লাহ্র দেওয়া মেধা ও শক্তি ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্র কাছে রিযিক প্রার্থনা করা। অতপর মাওলা দয়া করে বান্দাকে যা কিছু দান করেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকা ও তাঁর শোকর গোযারী করা। সর্বোপরি এই অটল বিশ্বাস রাখা যে, উপার্জন

আল্লাহ্‌র নেয়ামত। আর নেয়ামতের শোকারগোযারী করলে আল্লাহ্‌ তাআলা তা বাড়িয়ে দেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

'তোমরা যদি শোকর কর তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে আরো বেশি দান করব।'

উপার্জন হাতে আসার পর এই হল একজন মুমিনের কর্তব্য। তা না করে উপার্জনের মাধ্যম এবং উপার্জিত অর্থ-কড়িকে ভক্তি জানিয়ে মাথায় ও কপালে ঠেকানো সম্পূর্ণ অর্থহীন আচরণ। এর সাথে যদি কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাস যুক্ত হয় তাহলে তা যে একটি গর্হিত কাজে পরিণত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

একটি শব্দের অর্থহীন প্রয়োগ

'রূহ' বা 'বিদেহী আত্মা'র মাগফিরাত কামনা!

মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দুআর ক্ষেত্রে 'মরহুমের রূহ কিংবা বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা' জাতীয় শব্দ ব্যবহারের প্রচলন আছে।

মরহুমের জন্য মাগফিরাতের দুআ করা একটি নেক আমল। হাদীস শরীফে এ আমলের তারগীব দেওয়া হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে অনেক মাসনূন দুআও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অতএব মরহুমের জন্য মাগফিরাতের দুআ করা উচিত। কিন্তু বিষয়টিকে মরহুমের রূহ বা 'বিদেহী আত্মা'র সাথে যুক্ত করার কী অর্থ?

মাগফিরাত কামনার অর্থ হল, আল্লাহ্‌ যেন তার 'গোনাহখাতা' মাফ করে দেন, এই দুআ করা। গোনাহ যেমন মানুষের আভ্যন্তরীণ 'নফস' দ্বারা হয় তেমনি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও হয়। তদ্রূপ আল্লাহ্‌ তাআলা না করুন–দুনিয়ার এইসব গোনাহখাতার জন্য যদি আখিরাতের আযাব ভোগ করতে হয় তাহলে রূহ যেমন তা ভোগ করবে তেমনি দেহও যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তা ভোগ করবে। এটিই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আকীদা। একইভাবে নেয়ামত, সুখ-শান্তিও দেহ-আত্মা উভয়ই ভোগ করবে। তাই দেহকে বাদ দিয়ে শুধু রূহের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনার কোনো অর্থ হয় না।

ভুল কথা

বিয়েতে 'কালেমা' পড়ানো!

তাবলীগের একজন সাথী আমাকে বলেছেন যে, একদিন গাশতে তিনি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভাই কালেমা পড়তে জানেন? লোকটি অবাক করে দিয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য স্বরে বলল, নাহ! আমি তো এখনও বিয়ে করি নি!!

বিয়ের আক্বদ পড়ানোকে অনেকে 'কালেমা' পড়ানো বলে। কিন্তু এই তাবলীগী সাথীর ঘটনায় বুঝলাম, 'কালেমা পড়ানোর আরো অর্থ আছে।

সাধারণত কালেমা বলতে 'কালেমা তাইয়েবা' অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বা ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা সম্বলিত কয়েকটি কালেমাকেই বুঝায়। বিয়ের আক্বদের সময় এই ধরনের কোনো কালেমা পড়া বা পড়ানোর নিয়ম নেই। মাসনুন খুতবার পর স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে মেয়ে পক্ষের সম্মতিক্রমে খতীব ঈজাব বা প্রস্তাব দেন। ছেলে 'কাবিলতু' কিংবা কবুল করলাম শব্দ বলার সাথে আক্বদ পূর্ণ হয়ে ছেলেমেয়ে উভয়ে স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয়ে যায়।

এখানে কালেমা পড়ানোর কোনো বিষয় নেই। তবে কাবিলতু বা কবুল করলাম শব্দটিকে যদি আরবী আভিধানিক অর্থে কালেমা বলা হয় তবুও তো এখানে পড়ানোর কিছু নেই। যেহেতু বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে তাই বিয়ের আক্বদকে কালেমা পড়ানো না বলাই ভালো।

সবচেয়ে বড় কথা হল, দ্বীন সম্পর্কে কী পরিমাণ অজ্ঞতা ও উদাসীনতা থাকলে একজন মুসলমান কালেমা পড়াকে বিয়ের সময়ের বিষয় বলে মনে করতে পারে তা ভেবে দেখা উচিত এবং এ বিষয়ে আমাদের কোনো করণীয় আছে কি না তাও ভেবে দেখা কর্তব্য।

জানুয়ারি-২০১১

নামাযে কয়েকটি ভুল

নামাযে মনে মনে কুরআন পড়া!

যে সমস্ত নামাযে আস্তে কেরাত পড়া হয়, সে সকল নামাযে অনেককে দেখা যায়, মুখ-ঠোঁট না নেড়ে মনে মনে সূরা কেরাত পড়েন। হয়তো তারা এই ভুল ধারণা করে আছেন যে, আস্তে আস্তে কেরাত পড়া মানে মনে মনে পড়া।

এটি ঠিক নয়। কারণ যে সকল নামাযে কেরাত আস্তে পড়তে বলা হয়েছে, তার অর্থ হল, নিচু স্বরে তিলাওয়াত করা। আর এতো খুবই সহজ কথা যে, মনে মনে পড়া কোনোক্রমেই নিচু স্বরে পড়া নয়।
ফিকহ্-ফাতাওয়ার কিতাবাদি থেকেও বোঝা যায় যে, আস্তে কেরাত পড়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল এমনভাবে পড়া, যেন সে নিজে শুনতে পায়। আর সর্বনিম্ন এতটুকু তো অবশ্যই জরুরি যে. সহীহ-শুদ্ধভাবে হরফ উচ্চারণ করা হবে এবং ঠোঁট-জিহ্বার নড়াচড়া দেখা যাবে। একটি হাদীসে আছে যে, যোহর ও আসর নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআন পড়তেন, তখন কোনো কোনো আয়াত সাহাবায়ে কেরামও কখনো কখনো শুনতে পেতেন। হযরত আবু মামার বলেন, আমরা হযরত খাব্বাব রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি যোহর ও আসর নামাযে কুরআন পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনারা কীভাবে বুঝতেন? তিনি বললেন, 'বিজতিরাবি লিহয়াতিহী'–তাঁর দাঁড়ি মোবারক নড়াচড়া দ্বারা। (সহীহ বুখারী–ফাতহুল বারী ২/২৮৪-২৮৭)
অতএব কেরাত পড়ার সময় জিহ্বা ও ঠোঁট ব্যবহার করে মাখরাজ থেকে সহীহ-শুদ্ধভাবে হরফ উচ্চারণ করতে হবে। অন্যথায় শুধু মনে মনে পড়ার দ্বারা কেরাত আদায় হবে না।

তাকবীরে তাহরীমা মনে মনে বলা!

এটি আরেকটি ভুল। ইমামের পিছনে নামায পড়ার সময় এই ভুলটি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে বাঁধাকেই অনেকে যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, নামাযের শুরুতে তিনটি কাজ করতে হয়। প্রথমে মনে মনে কোন নামায পড়ছি–এর সংকল্প করতে হবে। এর নাম নিয়ত, যা নামায সহীহ হওয়ার জন্য জরুরি। উল্লেখ্য, মনে মনে সংকল্প করে নিলেই নিয়ত হয়ে যাবে, মুখে উচ্চারণ করতে হবে না।
দ্বিতীয় কাজটি হল, তাকবীরে তাহরীমা। অর্থাৎ স্পষ্ট উচ্চারণে 'আল্লাহু আকবার' বলা। যেহেতু এই তাকবীরের মাধ্যমে নামায বহির্ভূত সকল কাজ হারাম হয়ে যায় তাই একে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলে। এই তাকবীর বলা ফরয। যা স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ করতে হবে।
তৃতীয় কাজ হল, কান পর্যন্ত দুই হাত উঠিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে নাভির নিচে বাঁধা। এই কাজটি সুন্নত।

প্রচলিত পরিভাষায় 'নামাযের নিয়ত বাঁধা' এই তিন আমলের সমষ্টিকেই বোঝায়।
এখন কেউ যদি শুধু হাত উঠিয়ে তা বেঁধে নিল কিন্তু আল্লাহু আকবার বলল না বা মনে মনে বলল তাহলে নামাযের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবটিই আদায় হয় নি। ফলে তার নামায আদায় হবে না।
অতএব এখানেও তাকবীর স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ করা অপরিহার্য। শুধু মনে মনে বলা যথেষ্ট নয়।

আমীন মনে মনে বলা!

এটিও আরেকটি ভুল। নিয়ম হল, জামাতে নামায পড়ার সময় ইমাম সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করার পর মুকতাদী 'আমীন' বলবে। আমীন আস্তে বলা ও জোরে বলা দুটোই শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যদিও অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল আস্তে বলাই ছিল, তাই অনেক ফকীহ আস্তে বলাকেই উত্তম বলেছেন। কিন্তু এর অর্থ কোনোভাবেই মনে মনে বলা নয়। 'আস্তে বলা' কিংবা 'অনুচ্চস্বরে' বলা আর মনে মনে বলা এক কথা নয়।
আমীন বলার ফযীলতপূর্ণ সুন্নতটি আদায় করার সময়ও তা স্পষ্টভাবে মুখে উচ্চারণ করা উচিত।
উদাহরণস্বরূপ এই তিনটি আমলের কথা বলা হল, অন্যথায় তাকবীর, তাসবীহ, তাশাহহুদ ও দুআর ক্ষেত্রেও একই ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হয়। অথচ এই আমলগুলোও মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে আদায় করতে হয়।
অতএব উদাসীনতা বা অবহেলার কারণে হোক কিংবা না-জানার কারণে, সর্বাবস্থায় উল্লেখিত সকল ক্ষেত্রে মনে মনে বলার ভুল পদ্ধতি সংশোধনযোগ্য।

ভুল কথা

কার মুখ দেখে যে বের হয়েছিলাম!

দিনের প্রথম উপার্জনকে প্রণাম করা সম্পর্কে পূর্বে লেখা হয়েছে। এটা পড়ে একজন পাঠক জানালেন, বিপদাপদের সম্মুখীন হলে কোনো কোনো মানুষকে এই ধরনের কথাও বলতে শোনা যায় যে, 'কার মুখ দেখে যে বের হয়েছিলাম!!'

বাস্তবে এটি আরেকটি গর্হিত কথা, যার কোনো ধরনের ভিত্তি নেই। আর এই ভিত্তিহীন কথার উপর নির্ভর করে দিনের প্রথম দেখা মানুষটির ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা তো মারাত্মক অন্যায়।

কারণ আল্লাহ্ তাআলাই বিভিন্ন হিকমতে বান্দাদেরকে বালা-মুসিবত দিয়ে থাকেন যেমন দিয়ে থাকেন অসংখ্য নিয়ামত। এর সাথে প্রথম দেখা মানুষটির কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম এই ধরনের মানসিকতাকে কঠোরভাবে প্রত্যাহার করেছে। ঘোষিত হয়েছে,

لَا عَدْوٰى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ لَا صَفَرَ

অর্থাৎ 'রোগ লেগে যাওয়া, কুলক্ষণ, পেঁচা ও সফর-এর কোনো বাস্তবতা নেই।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৭০৭)

তাছাড়া অযথা কারো প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা গোনাহ। ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা পরিহার করো। কারণ কোনো কোনো ধারণা গোনাহ। (হুজুরাত : ১২)

অতএব এই ধরনের আমূলক ধারণা ও অসমীচীন কথা পরিত্যাগ করা একজন মুমিনের অবশ্যকর্তব্য।

ফেব্রুয়ারি ২০১১

ভুল চিন্তা

তাওবা করলে বা করালে কি মউত এসে যায়?

যতই তাজ্জবের বিষয় মনে হোক, দীনের সহজ-সরল বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা নেই। কোনো কোনো এলাকার মানুষের ধারণা, তাওবা করলে কিংবা তাওবা করানো হলে মউত এসে যায়। তারা মনে করে, তাওবা মৃত্যুর পূর্বে করার বিষয়, এর পূর্বে নয়। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা।

এ ধারণা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত; বরং তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিন জীবনের সার্বক্ষণিক ওযীফা। হাদীসে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে সত্তর থেকে এক শতবার তাওবা-ইস্তিগফার করতেন।

(সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৩০৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৭০২)

কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা থাকবে।

তাওবাতে বিলম্ব করা গোনাহ। এরপরও আল্লাহ্ তাআলা সব সময়ের জন্যই তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন। বান্দা যখন চায় তখনই তাওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসতে পারে। যখন মৃত্যু উপস্থিত হবে সে সময়ের তাওবা কবুল হওয়ার প্রতিশ্রুতি নেই তাই তাওবাতে বিলম্ব করা বড় ক্ষতির বিষয়। কারণ আমাদের কারো জানা নেই, কখন মৃত্যু উপস্থিত হবে। তাওবা মৃত্যু নয়; বরং তা হল মুমিন বান্দার জীবন।
যে কোনো ধরনের গোনাহ করলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন-এমন কাজ থেকে তাওবা করা মানে হল, ঐ গোনাহ ছেড়ে দেওয়া। কৃত গোনাহর কারণে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা না করার সুদৃঢ় সংকল্প করা। আর গোনাহ বান্দার হক সংক্রান্ত হয় তাহলে তা থেকে দায়মুক্ত হওয়া।
তাওবার ব্যাখ্যা থেকেও বোঝা যায় যে, এটি প্রত্যেক মুমিনের জন্য সব সময়ের আমল।

ভুল কথা
হাঁচি এল মানে কেউ স্মরণ করছে!
কারো হাঁচি এলে বা খাওয়ার সময় গলায় কিছু আটকে গেলে বলা হয় যে, কেউ তাকে স্মরণ করছে।
বাস্তবে এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। হাঁচি আসা ও গলায় খাবার আটকে যাওয়ার সাথে কারো স্মরণ করার কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব এই ধরনের ভিত্তিহীন কথা না বলা উচিত।

ঈমানবিধ্বংসী বানোয়াট কিসসা
একজন বেদআতী ওয়ায়েয হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে এই কিসসার অবতারণা করেছেন যে, নাউযুবিল্লাহ *-আল্লাহ্ তাআলার নাকি একবার মানুষের গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হল। তখন তিনি হযরত মুসা আ.কে আদেশ দিলেন, যাও, মানুষের গোশত নিয়ে এস। হযরত মুসা আ. অনেকের কাছে চাইলেন। কিন্তু কেউ নিজের শরীরের গোশত কেটে দিতে রাজি হল না। আশাহত হয়ে তিনি একটি পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি পাহাড় থেকে ডাক দিল, হে মুসা! এদিকে আস। আমার কাছ থেকে গোশত নিয়ে যাও। অতপর ঐ ব্যক্তি নিজের শরীর কেটে গোশতের একটি টুকরা দিয়ে দিলেন। ওই টুকরা নিয়ে হযরত মুসা আ. আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করলেন। তখন আল্লাহ্*

বললেন, হে মুসা! তুমিও তো একজন মানুষ। তুমি তো দিতে পার নি। যে দিয়েছে সে কে জান? সে আমার আবদুল কাদের জিলানী!!!

পুরো কিসসাটির আগা-গোড়া নির্জলা মিথ্যা আল্লাহ পানাহার-নিদ্রা ইত্যাদি মানবীয় দূর্বলতা থেকে চিরমুক্ত। ঘটনাটি এমনই বাতিল ও উদ্ভট যে, কোনো মুসলিম তা উচ্চারণ করতে পারে না। অথচ কিছু বিকৃত চিন্তার মানুষ এ জাতীয় কিছু বর্ণনা করে দুর্বল বোধ-বুদ্ধির অধিকারী মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করে চলেছে। অথচ এ জাতীয় কথাবার্তা শোনামাত্রই বলা উচিত– হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র সত্ত্বা। এটি সুস্পষ্ট অপবাদ।

কে না জানে, আবদুল কাদের জিলানী রহ. মূসা আ.এর কয়েক হাজার বছর পরের মানুষ। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত।

হাদীস নয়

নেককারদের আলোচনাকালে রহমত নাযিল্ হয়!

عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ

নেককার-বুযুর্গদের আলোচনার সময় অনেককে উপরোক্ত কথাটি হাদীস হিসেবে বলতে শোনা যায়। মুহাদ্দিসীনে কেরামের সিদ্ধান্ত হল, এটি হাদীস নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত-এর কোনো সনদ নেই; বরং এটি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. (১০৭ হি.-১৯৮ হি.)-এর উক্তি। (হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/৩৩৫; আততামহীদ ১৭/৪২৯)

এই কারণে মুহাদ্দিস ও হাফেযে হাদীস আল্লামা ইরাকী রহ. বলেন–

ليس له أصل مرفوع، و إنما هو قول سفيان بن عيينة

'মারফূ' (সরাসরি নবীজী থেকে বর্ণিত) হাদীস হিসেবে এর কোনো ভিত্তি নেই; বরং এটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ.-এর একটি উক্তিমাত্র।' (তাখরীজে ইরাকী–ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/৩২৯; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন (৬/৩৫০-৩৫১)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসও একই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। (আলমাকাসিদুল হাছানা ৪৬৭; আল ফাওয়াইদুল মাজমুআ ২/৬২২) আরো দেখুন : মোল্লা আলী কারী, আল মাওযূআতুল কুবরা ৮৩, তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওযূআত ১৯৩

তবে মূল কথাটি যেহেতু অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত। তাই হাদীস হিসেবে বর্ণনা না করে বুযুর্গদের উক্তি হিসেবেই বর্ণনা করা উচিত। নির্ভরযোগ্য

সূত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত না হলে তা হাদীস হিসেবে বলার কোনো সুযোগ নেই।

মার্চ- ২০১১

ভুল মাসআলা

দাফনের পূর্বে ঈসালে সাওয়াব ও দুআ-ইস্তিগফার নিষেধ!

পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত একটি দৈনিকে মাসআলাটি পড়ে বিস্মিত না হয়ে পারি নি। কোনো এক প্রসঙ্গে সেখানকার এক পার্লামেন্ট সদস্য পার্লামেন্টে এ মাসআলা বয়ান করেছেন যে, মৃত ব্যক্তির দাফনের পূর্বে তার জন্য ফাতিহাখানি ও ঈসালে সাওয়াব করা যায় না।

এই বক্তব্য সঠিক নয়; বরং যাকে আমরা জানাযার নামায বলি, সেটাও মূলত মাইয়িতের জন্য মাগফিরাতেরই দুআ। বলা বাহুল্য, তা মাইয়িতের দাফনের পূর্বেই করা হয়। জানাযা ও দুআয়ে মাগফিরাত হওয়ার কারণেই ওলামায়ে কেরাম জানাযার পর পুনরায় হাত উঠিয়ে মুনাজাত করাকে বিদআত বলেছেন। আর তা শরীয়ত কর্তৃকও প্রমাণিত নয়। হয়তোবা এখান থেকেই কেউ কেউ ঐ ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন যে, দাফনের পূর্বে ঈসালে সাওয়াব ও দুআয়ে মাগফিরাত করা যায় না।

কিন্তু সঠিক মাসআলা হল, শরয়ীভাবে কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকলে মৃত্যুর পর হতে মৃত ব্যক্তির উপকারে আসে–এমন যে কোনো আমল দ্বারা সাধারণ শরীয়তসম্মত পন্থায় ঈসালে সাওয়াব করা যায়।

এক্ষেত্রে দাফনের পূর্ব ও পরের কোনো পার্থক্য নেই।

ভুল কথা

হাত চুলকালে টাকা আসে!

কারো হাত বা হাতের তালু চুলকালে বলা হয় যে, তার হাতে টাকা বা অর্থ-কড়ি আসছে! বাস্তবে এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। হাত বা হাতের তালু চুলকানোর সাথে টাকা-পয়সা আসা-যাওয়ার কোনোই সম্পর্ক নেই। অতএব এই ধরনের অবাস্তব ও অযৌক্তিক কথা পরিহার করা উচিত।

ভুল ঘটনা

হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের দিন কা'বা শরীফে আযান শুরু!

প্রচলিত আছে যে, হযরত ওমর রাযি. যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন, সেই দিন থেকে কা'বাঘরে প্রথম আযান শুরু হয়।

রাহাতুল কুলুব জাতীয় কিছু বাজারী অনির্ভরযোগ্য বইয়েও এটিকে আরেকটু চটকদার করে উত্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'যতদিন পর্যন্ত হযরত আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. ইসলাম আনেন নি ততদিন পর্যন্ত নামাযের আযান গুহায়-গহ্বরে দেওয়া হত। কিন্তু যেদিন হযরত আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক রাযি. ঈমান আনলেন সেদিন তিনি তলোয়ার কোষমুক্ত করে দাঁড়িয়ে হযরত বেলাল রাযি.-কে বললেন, কা'বাঘরের মিম্বরে উঠে আযান দাও। হযরত বেলাল রাযি. তাঁর নির্দেশমতো কাজ করলেন।'

বহুল প্রচলিত হলেও এই ঘটনাটি ভুল। কারণ বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র মতে, আযানের আদেশ এসেছিল মদীনায়, নবীজীর হিজরতের পর। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬০৪; ফাতহুল বারী ২/৯৩-৯৪)

অথচ হযরত ওমর রাযি. ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মক্কায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগে। অতএব তাঁর ইসলাম গ্রহণের দিন কা'বা শরীফে আযান শুরুর কথা অযৌক্তিক।

তবে এই কথা সত্য, হযরত ওমর রাযি. ইসলাম কবুলের পর ইসলামের শান-শওকত অনেক বুলন্দ হয়। ইসলামের প্রকাশ্য কার্যক্রম শুরু হয়। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, আমরা ওমরের ইসলাম গ্রহণের ফলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। আমরা পূর্বে কা'বা শরীফে নামায আদায় করতে পারতাম না। যখন ওমর ইসলাম কবুল করলেন তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন, ফলে তারা আমাদেরকে বাইতুল্লায় নামায পড়তে দিতে বাধ্য হল। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৬৮৪; ফাতহুল বারী ৭/৫৯; তবাকাতে ইবনে সাদ ৩/২৭০)

হয়ত বাইতুল্লায় প্রকাশ্য নামায আদায়ের রেওয়ায়েতটিকেই ভুলভাবে উপস্থাপন করে আযান দেওয়ার শব্দে বলা হয়েছে। অথচ সহীহ রেওয়ায়েতে আযানের কোনো উল্লেখ নেই।

হাদীস নয়

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

যে ব্যক্তি ইল্ম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ্ তাকে না জানা বিষয়ের ইল্ম দান করেন।

লোকমুখে এটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু হাদীস বিশারদদের মত হল, এটি হাদীস নয়। কারণ

নবীজী পর্যন্ত এর নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র নেই। যে সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে-তাকে জাল সাব্যস্ত করে হাফেয আবু নুআইম রহ. স্পষ্ট ভাষায় বলেন,

ذكر أحمد بن حنبل-هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام، فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه و سلم، فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته و قربه، و هذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل (হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/১৫, রিসাতুল মুসতারশিদীন পৃ. ১৫৫)

এই কারণে অন্য মুহাদ্দিসগণও তাদের মাওযূআত বিষয়ক কিতাবাদিতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। (দেখুন : আলফাওয়াইদুল মাজমুআ ২/৩৬৭; আলআসরারুল মারফূআ ২৩৫; তাযকিরাতুল মাওযূআত ২০)

অতএব উল্লেখিত কথাটিকে হাদীস হিসেবে উদ্ধৃত করা ঠিক নয়।

এপ্রিল ২০১১

একটি রসম

ফাতিহায়ে ইয়াযদহম পালন!

রবিউস সানীর এগার তারিখে অনেককে ফাতিহায়ে ইয়াযদহম (এগার তারিখের ফাতিহা) বা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর ওফাত দিবস পালন করতে দেখা যায়। এ উপলক্ষে মসজিদে আলোকসজ্জা করা হয় এবং মাহফিল-মজলিসের আয়োজন করা হয়।

এটা একটা কু-রসম। ইসলামী শরীয়তে জন্মদিবস ও মৃত্যুদিবস পালনের নিয়ম নেই। নবী-রাসূল, খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরাম আমাদের জন্য আদর্শ। তাঁদের কারোরই জন্মদিবস-মৃত্যুদিবস পালন করার কথা শরীয়তে নেই। তাদের জন্ম বা মৃত্যুদিবস পালন করতে হলে তো বছরের প্রতিদিনই পালন করতে হবে। অথচ নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম তো সকল ওলি-বুযুর্গেরও আদর্শ। আর এজন্যই বুযুর্গানেদীন নিজেদের জন্মদিবস পালন করেন নি বা অনুসারীদেরকে জন্মদিবস ও মৃত্যুদিবস পালনের আদেশ করেন নি। পরবর্তী যুগের লোকেরা তা উদ্ভাবন করেছে।

ফাতিহায়ে ইয়াযদহম সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যে তারিখে 'ফাতিহায়ে ইয়াযদহম' পালন করা হয় অর্থাৎ এগার রবিউস সানী তা

ঐতিহাসিকভাবে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর মৃত্যুদিবস হিসেবে প্রমাণিতও নয়।

কারণ তাঁর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তাঁর জীবনীগ্রন্থ 'তাফরীহুল খাতির ফী মানাকিবিশ শায়খ আবদুল কাদির'-এ এই সম্পর্কে কয়েকটি মত উল্লেখ করা হয়েছে : রবিউস সানীর নয় তারিখ, দশ তারিখ, সতের তারিখ, আঠার তারিখ, তের তারিখ, সাত তারিখ ও এগার তারিখ। আবার কারো কারো মতে রবিউল আউয়ালের দশ তারিখ। এই আটটি মত উল্লেখ করার পর গ্রন্থকার দশই রবিউস সানীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (দেখুন : ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/৭৬-৭৭)

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আল্লামা হাফেয যাহাবী রহ. (৭৪৮ হি.)ও বলেছেন–

توفي في عاشر ربيع الآخر سنة إحدى و ستين، و له تسعون سنة

'তিনি নব্বই বছর বয়সে ৫৬১ হিজরীর রবিউস সানীর দশ তারিখে ইন্তেকাল করেন।' (তারীখুল ইসলাম ২৯/৬০)

এছাড়া ইতিহাস ও আসমাউর রিজালের অন্যান্য কিতাবেও আট, নয় ও দশ তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগার তারিখ নয়।

আর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতবিরোধ না থাকলেও 'মৃত্যুদিবস' পালন করা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়; বরং বছরের যেকোনো দিন নেককার বুযুর্গদের জীবনী আলোচনা করা যায় এবং তাঁদের জন্য ঈসালে সাওয়াব করা যায়। তা না করে নির্দিষ্ট একটি দিনে জায়েয-নাজায়েয বিভিন্ন রকমের কাজকর্মের মাধ্যমে দিবস উৎযাপন- রসম ও বিদআত ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরনের বিদআত ও রসম পালনের মাধ্যমে খোদ শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর মতো বুযুর্গ ওলিদের অবমাননাই করা হয়। আর আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টিসহ বিদআতের অন্যান্য শাস্তি তো রয়েছেই।

ভুল পদ্ধতি

নামাযে তাকবীরে তাহরীমা না বলে রুকুতে চলে যাওয়া!

জামাতের নামাযে ইমাম যখন রুকুতে যান, তখন অনেককে দেখা যায়, রাকাত পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে একটি তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে চলে যান। এ পদ্ধতি সঠিক নয়। কারণ যে তাকবীরটি বলতে বলতে মুসল্লী রুকুতে যাচ্ছে, সেটাকে রুকুর তাকবীর বলা যায়। তাহলে তার তাকবীরে তাহরীমা তো আদায় হয় নি। অথচ তাকবীরে তাহরীমা ফরয।

অতএব ইমামকে রুকুতে পেতে হলে কয়েকটি কাজ করা জরুরি। প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে একবার আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করবে। তারপর হাত না বেঁধে সোজা ছেড়ে দিবে। অতপর আরেকটি তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে যাবে।

সারকথা এই যে, এখানে তাকবীর দুটো। প্রথমটি তাকবীরে তাহরীমা, যা নামাযের প্রথম কাজ। এই তাকবীর না বললে নামাযই হবে না। আর দ্বিতীয়টি রুকুর তাকবীর। এই তাকবীর বলা সুন্নত। কেউ যদি রুকুতে ইমামের সাথে শামিল হতে চায় তাহলে তার জন্য নিয়মমাফিক এই দুটো তাকবীর আদায় করা উচিত। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে রুকুর তাকবীর তো ছাড়া যেতে পারে, কিন্তু স্থির দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা অবশ্যই বলতে হবে। এ বিষয়ে অধিক তাড়াহুড়া বা অবহেলা করলে নামায শুদ্ধ না হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

হাদীস নয়

আযানের জবাবে পুরুষ পাবে এক লক্ষ নেকী, মহিলা দুই লক্ষ নেকী!

বছরখানেক আগে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, উপরের কথাটা হাদীস কি না। কিন্তু অনেক তালাশের পরও সহীহ হাদীসের কিতাবে তো নয়ই মওযূ ও জাল রেওয়ায়েতের কিতাবাদিতেও তার সন্ধান পাই নি। অথচ সহীহ হাদীসে আজানের জবাব দেওয়ার অনেক ফযীলত আছে। কোথাও ফযীলতের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পার্থক্য ও আলাদা আলাদা ছওয়াবের কথা চোখে পড়ে নি। অতএব সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ধরনের ফযীলত বর্ণনা করা উচিত নয়।

মে ২০১১

একটি কু-রসম

শ্বশুর বাড়ি প্রবেশের আগে নববধুর পা ধোয়ানো!

কোনো কোনো এলাকায় প্রথা আছে, শ্বশুরবাড়িতে প্রথম প্রবেশের সময় ঘরের বাইরে নববধুর পা ধোয়ার আয়োজন করা হয় এবং যারা তার পা ধুয়ে দেয় তাদেরকে বখশিশ দেওয়া হয়। মনে করা হয়, এই আচার পালন ছাড়া নববধুকে ঘরে তোলা অনুচিত। এটি একটি কু-রসম। ইসলামে যার কোনো ভিত্তি নেই।

পায়ে ময়লা বা ধুলা-বালি লাগলে তা পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পা ধোয়ানোর আয়োজন সমর্থনযোগ্য নয়। উপরন্তু এতে রয়েছে নববধুর প্রতি এক ধরনের মানসিক পীড়ন, যা একজন সচেতন নারী সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। আর কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া, সে পুরুষ হোক বা নারী, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। সাধারণ কোনো অতিথির সাথেও এমন আচরণ করা হলে নিঃসন্দেহে তিনি অপমানবোধ করবেন। তাহলে বাড়ির বধু হিসেবে যাকে গ্রহণ করা হচ্ছে তার সাথে এই আচরণের কী অর্থ?!

কোনো মানুষকে শুধু শুধু অশূচি ও অপবিত্র মনে করার ধারণা হিন্দু-সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু ইসলাম মানব ও মানবতাকে অনেক উঁচু মর্যাদা দিয়েছে। সত্তাগতভাবে কোনো মুমিনকে অশুচি ও অপবিত্র মনে করার সুযোগ ইসলামে নেই। অতএব কোনো কুসংস্কার বা ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকার হয়ে নববধুর পা ধোয়ার আয়োজনও ইসলাম সমর্থন করে না। তাছাড়া শ্বশুরবাড়ির এমন কোনো আলাদা মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য নেই যে, সেখানে প্রবেশ করতে হলে পা ধুয়েই প্রবেশ করতে হবে।

ইসলামের পরিচ্ছন্ন আকীদায় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের উচিত এই জাতীয় কু-রসম পরিত্যাগ করা।

দুটো ভুল ধারণা

ক) খাওয়ার পর বরতন ধুয়ে খাওয়া কি সুন্নত?

কেউ কেউ মনে করে যে, খাওয়ার পর বরতন ধোয়া পানি পান করা সুন্নত। এই ধারণা সঠিক নয়। হাদীস ও সুন্নাহর কিতাবে এমন কোনো সুন্নতের কথা নেই। সুন্নত হল, খাওয়ার পর হাত, হাতের আঙ্গুল চেটে খাওয়া এবং বরতন ভালোভাবে মুছে খাওয়া। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে আঙ্গুল ও বরতন ভালোভাবে পরিষ্কার করে খাওয়ার আদেশ করেছেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২০২২)

সুতরাং আঙ্গুল ও প্লেট ভালোভাবে পরিষ্কার করে খাওয়া সুন্নত, ধুয়ে পানি পান করা সুন্নত নয়। তবে সুন্নত ও মুস্তাহাব মনে না করে কেউ যদি প্লেট ধুয়ে পানি পান করে তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং তা মুবাহ। কিন্তু একে সুন্নত বলা ঠিক নয়।

খ) খাওয়ার পর মুখমণ্ডলে ও পায়ের তালুতে হাত মোছা কি সুন্নত?

কোনো মজলিসে দেখলাম, এক ব্যক্তি খাবারের পর অতি গুরুত্বের সাথে পায়ের তালুতে হাত মুছলেন এবং সঙ্গীকেও সুন্নত বলে এতে উৎসাহিত করলেন।

আসলে এটিও সুন্নত নয়। একে সুন্নত বলা ভুল; বরং চর্বিযুক্ত খাবারের ক্ষেত্রে হাত সাবান বা গরম পানি দ্বারা উত্তমভাবে পরিষ্কার করে রুমাল বা তোয়ালে জাতীয় কিছুতে মুছে নেওয়া উচিত। হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন আহার করে, তখন সে যেন আঙ্গুল চেটে খাওয়ার আগে রুমালে হাত না মোছে। (মুসনাদে আহমদ ১/৩৪৬, হাদীস : ৩২৩৪)

যাই হোক, খাওয়ার পর পায়ের তালুতে হাত মোছা বা বরতন ধুয়ে পানি পান করা না-জায়েয নয়, কিন্তু একে সুন্নত বলা ভুল। কোনো কাজ বৈধ হওয়া আর সুন্নত হওয়া এক কথা নয়।

জুন ২০১১

তাওবার জন্য কি ওযু জরুরি?

একটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি কলামে লেখা হয়েছে, 'গ্রামের প্রচলিত বিশ্বাস, তাওবা পড়ানো হলে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। তাওবা পড়ানোর জন্য মুন্সী আনা হল। সাফিয়া বিবি বললেন, না গো! আমি তাওবার মধ্যে নাই। তাওবা করতে হইলে ওযু করা লাগবে। শইল্যে পানিই ছোঁয়াতে পারি না, ওযু ক্যামনে করব।

সাফিয়া বিবির মনে হয়তো ভয় ঢুকে গিয়েছিল, তাওবা মানেই মৃত্যু। তিনি মৃত্যু চান না ... ।'

কলামটির উদ্ধৃত অংশে কয়েকটি ধারণার উল্লেখ রয়েছে। এক. তাওবা করলে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ধারণা। ইতিপূর্বে এ বিভাগে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। ওই লেখায় বলা হয়েছিল যে, তাওবা মানে জীবনের অবসান নয়; বরং তাওবা মানে গোনাহমুক্ত নতুন জীবন লাভ।

দুই. তাওবার জন্য ওযু লাগে। এটিও ভুল ধারণা।

তিন. তাওবা নিজে করার বিষয় নয়; বরং এর জন্য মুন্সী ডাকতে হয়। এই ভুল ধারণাগুলোর মূল কারণ অজ্ঞতা ও জাহালত। তাওবা কাকে বলে তা

জানা থাকলে এইসব ভিত্তিহীন ধারণা সৃষ্টি হয় না। এখানে তাওবা সম্পর্কে কিছু কথা বলা হল।

তাওবা মানে গোনাহ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা এবং অন্তর থেকে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাওবা হল আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন।

বান্দার যখন গোনাহ হয়ে যায় তখন তার কর্তব্য, আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা-ইস্তিগফার করা। অপরাধটি হক্কুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত হলে চারটি কাজ করতে হবে। তাহলে তাওবা পূর্ণাঙ্গ হবে। ১. গোনাহ ছেড়ে দেওয়া। ২. লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। ৩. ভবিষ্যতে এই ধরনের গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করা। ৪. কোনো ফরয-ওয়াজিব ছুটে গিয়ে থাকলে মাসআলা অনুযায়ী তার কাযা-কাফফারা আদায় করা।

আর অপরাধটি যদি হয় হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক সংক্রান্ত তাহলে আরো একটি কাজ করতে হবে। যার হক্ব নষ্ট করা হয়েছে তার হক্ব আদায় করে কিংবা ক্ষমাগ্রহণ করে দায়মুক্ত হওয়া। এভাবে আল্লাহ্‌র কাছে নিজের কৃতকর্মের জন্য কান্নাকাটি ও অনুতাপের অশ্রু ফেলার নামই তাওবা।

আল্লাহ্‌র দরবারে রোনাজারি ও ক্ষমাপ্রার্থনা নিজের ভাষায়ও করা যায়। তেমনি হাদীস শরীফে তাওবা-ইস্তিগফারের যে দুআগুলো আছে সেগুলো পড়েও তাওবা-ইস্তিগফার করা যায়।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে যে কথাগুলো বোঝা যায়, তা এই –

এক. তাওবা করা তারই দায়িত্ব, যে গোনাহ করেছে। নিজের গোনাহর জন্য নিজেকেই অনুতপ্ত হতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাইতে হবে। যদিও আল্লাহ্‌র কোনো নেক বান্দার কাছ থেকে তাওবা-ইস্তিগফারের নিয়ম জেনে নিয়ে তার বলে দেওয়া শব্দ উচ্চারণ করেও তাওবা করা যায়, কিন্তু তাওবার জন্য এটা জরুরি নয়। তাই তাওবা নিজে করা যাবে না, কারো মাধ্যমেই করাতে হবে এই ধারণা ঠিক নয়। তদ্রূপ তাওবার ক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্তগুলো পালন না করে শুধু কারও বলে দেওয়া তাওবার বাক্যগুলো উচ্চারণ করলেই তাওবা হয়ে যায় না। তাওবা হল মুমিন-জীবনের সার্বক্ষণিক আমল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও দিনে সত্তর থেকে একশ বার ইস্তিগফার করতেন বলে হাদীসে এসেছে।

দুই. আরো বুঝা গেল যে, তাওবার জন্য ওযু অপরিহার্য নয়। তবে কেউ যদি সালাতুত তাওবা বা তাওবার নামার আদায় করতে চায়, তাহলে অন্যান্য নামাযের মতোই তাকে ওযু করতে হবে। এ প্রসঙ্গে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ কোনো গোনাহ করে ফেলে অতপর পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে নামাযে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ্র কাছে গোনাহ মাফ চায় তাহলে আল্লাহ্ তার গোনাহ মাফ করে দিবেন। অতপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, (তরজমা) 'এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনো কোনো মন্দ কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের গোনাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর কে আছে আল্লাহ্ ছাড়া, যে গোনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনেশুনে তাঁদের কৃত-কর্মের উপর অবিচল থাকে না।' -সূরা আলইমরান : ১৩৫; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩০০৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৫২১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৩৯৫

তবে সাধারণ তাওবার জন্য ওযু জরুরি নয়।

অতএব তাওবাকে মৃত্যু মনে করা, ওযু ছাড়া তাওবা হয় না কিংবা অন্যের সহযোগিতা অপরিহার্য ইত্যাদি হচ্ছে কিছু ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণা। তাওবা কী তা জানা থাকলে এ জাতীয় ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে না ইনশাআল্লাহ্।

হাদীস নয়

মিরাজে নবীজীর সাতাশ বছর সময় লেগেছিল!

মেরাজ সম্পর্কে এক ওয়ায়েযকে বলতে শুনেছি যে, তাতে নাকি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতাশ বছর সময় ব্যয় হয়েছিল। আরেক ওয়ায়েয এই কথাটি বললেন আরো চটকদার করে। তার ভাষায়, ইন্তেকালের সময় যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিবরীল ও মালাকুল মউত হাজির হল, তখন তিনি মালাকুল মউতকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এত তাড়াতাড়ি কেন এলে? আল্লাহ্ তো আমাকে নব্বই বছর হায়াত দিয়েছিলেন। তখন জিবরীল বললেন, আপনার জীবনের সাতাশ বছর তো মেরাজের রাতেই অতিবাহিত হয়ে গেছে!

উপরোক্ত বর্ণনার কোনো ভিত্তি আমরা পাই নি। মিরাজের সহীহ ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতগুলোর কোথাও বলা হয় নি যে, মিরাজে নবী কারীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত সময় অতিবাহিত হয়েছিল। কুরআন মজীদ এবং সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, এই ঘটনাটি একটি রাতে সংঘটিত হয়েছিল। তাতে পুরো রাত লেগেছিল নাকি রাতের কিছু অংশ, না চোখের পলকেই ঘটে গিয়েছিল তা সহীহ হাদীসে নেই। হাদীসে এই কথাও নেই যে, আল্লাহ্ তাআলা তখন সময় ও সৃষ্টিজগতকে স্থির রেখেছিলেন কি না।

অতএব মিরাজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার রহস্য ও তাৎপর্য আলোচনার সময় এই সব অমূলক কথাবার্তার আশ্রয় নেওয়া খুবই নিন্দনীয় ও সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য। কোনো দায়িত্বশীল ও আমানতদার ব্যক্তি এ ধরনের কথা বলতে পারেন না। আল্লাহ্ তাআলার পরিষ্কার আদেশ–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

'যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই এর পিছনে পড়ো না।' এরপরও শুধু অনুমান ও ধারণার উপর ভিত্তি করে বলা, বিশেষত মানুষের সামনে বর্ণনা করা বড়ই অন্যায়। উপরন্তু তা যখন হয় আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে সম্পর্কিত তখন তো এর ভয়াবহতা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

সেপ্টেম্বর- ২০১১

হাদীস নয়

একটি জনপদের উপর পবিত্রতা যখন পাখা বিস্তার করে উড়ে যায় আকাশ তখন শহীদের রক্ত ধারণ করে!

বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত লেখকের লেখায় এমন কথা পড়েছি। তিনি লিখেছেন, 'ইফতারির সময় রোযাদারদের কাছে আকাশ আজ অন্যান্য সন্ধ্যার তুলনায় অনেক বেশি লাল বলে মনে হয়, গাঢ় এবং গম্ভীর সেই রঙ দেখে কারো কারো মনে পড়ে যায়, হ্যাঁ, এ রকম তাঁরা শুনেছে, একটি জনপদের ওপর পবিত্রতা যখন পাখা বিস্তার করে উড়ে যায়, আকাশ তখন শহীদের রক্ত ধারণ করে।'

কিন্তু এই ধরনের কোনো রেওয়ায়েত আমরা পাই নি যে, কোনো জনপদের উপর পবিত্রতার আলামত স্বরূপ আকাশ শহীদের রক্ত ধারণ করে; বরং এই ধরনের কথার কোনো যৌক্তিকতাও নেই।

অতএব যে কোনো দায়িত্বশীল লেখকের উচিত, কোনো কিছু লিখা বা বলার আগে তার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করে নেওয়া। কারো থেকে শোনে, কোনো বাজারি বইয়ে পড়ে কিংবা কোনো কিছু কল্পনা করে তাকে রেওয়ায়েতের মতো করে লিখে দেওয়া কোনো দায়িত্বশীল লোকের কাজ হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সুমতি দান করুন। আমীন।

ভুল চিন্তা

কবরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা কি নিষেধ?

অনেকে মনে করে, কবরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা ঠিক নয়। এতে নাকি আঙ্গুল পঁচে যায়।

এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। জীবিত মানুষের দিকে যদি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা যায় তাহলে কবরের দিকে ইশারা করলে দোষ হবে কেন? আর শরীয়তের দৃষ্টিতেও এতে কোনো বাধা নেই। আর এই কারণে কারো আঙ্গুল পঁচে গেছে–এমন কোনো নজিরও নেই। অতএব এই ধরনের ভিত্তিহীন কথা বলা ও বিশ্বাস রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ভুল তথ্য

সুরমা কি তুর এর তাজাল্লী থেকে সৃষ্টি?

সুরমার বিষয়ে কোনো কোনো লোককে বলতে শোনা যায় যে, হযরত মুসা আ. যখন তুর পাহাড়ে আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন তখন আল্লাহ্র তাজাল্লীতে পাহাড় ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। সেই ভস্মিভূত পাহাড় থেকেই সুরমার উৎপত্তি ও ব্যবহার।

এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সুরমা একটি খণিজ দ্রব্য। এর সাথে তুর পাহাড়ের কোনো সম্পর্ক নেই। মুসা আ.-এর আল্লাহ্কে দেখার ইচ্ছা ও তুর পাহাড়ের মূল ঘটনাটি সত্য। কুরআন মজীদে এর পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। (সূরা আ'রাফ : ১৪৩ দ্রষ্টব্য) কিন্তু কোথাও এই ঘটনার সাথে সুরমাকে জড়িয়ে দেওয়ার কথাটির সামান্যতমও উল্লেখ নেই। অতএব এই ধরনের কথা পরিহার করা জরুরি।

ভুল ধারণা

কষ্টের সংবাদ দিয়ে না গেলে কবরে বৃক্ষ জন্মায় না!

একজন সাহিত্যিক একটি বইয়ে লিখেছেন, 'আমরা উত্তর বিনা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে চাই না, কি তোমার কষ্ট, তুমি আমাদের বল সাহেবচান্দ, আমরা শুনেছি, মানুষের কষ্টের সংবাদ না দিয়ে যারা কবরে যায় তাদের কবরে কোনো বৃক্ষ কোনোদিন হয় না।'

উক্ত শোনা কথাটি ভিত্তিহীন। কুরআন-হাদীসে এমন কোনো কথা নেই। তাছাড়া এটা স্বাভাবিকও নয়।

মানুষের মনে নানা দুঃখ-কষ্ট থাকে। মৃত্যুর আগে কাউকে না কাউকে এই সব দুঃখ-কষ্টের কথা বলতেই হবে তা অপরিহার্য নয়। শরীয়তও এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নি। বরং এমন সব কথা, যা অন্যের মনোকষ্টের কারণ হতে পারে কিংবা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে তা না বলাই ভালো।

অতএব কারো মনে এই ধরনের অলীক কথা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস থাকলে তা পরিহার করা চাই।

অক্টোবর ২০১১

ভুল ধারণা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় কি দর্জি ছিল না?'

কয়েকদিন পূর্বে এক ভাই ফোনে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা তো জানতাম সাহাবীগণ কাপড় কোনোরকম শরীরে বেঁধেই পোশাকের কাজ সারতেন। হঠাৎ ওই দিন একজন বললেন, 'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাকি একটি জুব্বা ছিল। আমার কাছে বড় আশ্চর্য মনে হল যে, সে যামানায় আবার দর্জি কোথায় ছিল? জুব্বাই বা কীভাবে তৈরি হবে!'

তাকে উত্তরে বলা হল, এ ধারণা ঠিক নয়। দর্জি পেশা অনেক আগ থেকেই আছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ও ছিল। এটি একটি বাস্তব ইতিহাস। তাছাড়া বিভিন্ন সহীহ হাদীসেও বিষয়টি উদ্ধৃত আছে। বুখারী শরীফ, বুয়ূ' অধ্যায়ে হাদীস নং : ২০৯২ এ সে যুগের এক দর্জির আলোচনা রয়েছে।

ভুল তথ্য

মুনাজাতে মকবুল-এ যা কিছু ছাপা হচ্ছে সবই কি থানভী রহ.-এর সংকলন?

মুনাজাতে মকবুল হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর একটি সুন্দর সংকলন। এতে হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন জামে' তথা ব্যাপক অর্থবহ দুআসমূহ একত্রিত করা হয়েছে। এতে হযরতের মূল অবলম্বন ছিল ইমাম ইবনুল জাযারী-এর 'আলহিসনুল হাসীন' এবং মোল্লা আলী কারী রহ.-এর 'আলহিযবুল আ'যম'।

সংকলনটি ব্যাপকভাবে মকবুল হওয়ায় অনেক প্রকাশক তা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, কোনো কোনো প্রকাশক এতে এমন অনেক অযীফা যোগ করে দিয়েছেন, যা হাদীসে বর্ণিত নয়। এমনকি অর্থ ও মর্মের দিক থেকেও আপত্তিকর।

অনেকে ধারণা করে মুনাজাতে মকবুলের সাথে যত কিছুই ছাপা হয়ে থাকে সব কিছুই থানভী রহ.-এর সংকলন বা তার পক্ষ থেকে অনুমোদিত। মনে রাখবেন, বিষয়টি এমন নয়। মুনাজাতে মকবুল সমষ্টিতে শুধু নিম্নোক্ত বিষয়গুলো হযরতের সংকলন বা তাঁর পক্ষ থেকে অনুমোদিত।

১. সাত মঞ্জিলের আরবী মুনাজাতে মকবুল।

২. উর্দু কাব্যে সাত মঞ্জিলে তার অনুবাদ।

৩. মাসনবী থেকে নির্বাচিত ফার্সী কাব্যের দুআসমূহের সাত মনযিল।

৪. হিযবুল বাহর।

তবে হিযবুল বাহর-এর শুরুতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তা মা'ছূর বা বর্ণিত নয় এবং এর আমলের সীমারেখাও চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

এ চারটি বিষয় ছাড়া অন্য যা কিছু বিভিন্ন প্রকাশনায় এ সমষ্টির সাথে যুক্ত করা হয়েছে তা থানবী রহ.-এর সংকলন নয়। ঐগুলোর যথার্থতা আলেমদের কাছে জেনে নেওয়া জরুরি।

ভুল ধারণা

যফর আহমদ উছমানী রহ. কি শাব্বীর আহমদ উছমানী রহ.-এর ভাই?

প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিই নি। পরে বেশ কিছু মানুষকেই এরকম বলতে শুনেছি, হযরত মাওলানা যফর আহমদ উছমানী রহ. (১৩১০ হি.–১৩৯৪ হি.) আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানী রহ. (১৩০৫ হি.–১৩৬৯ হি.)-এর সহোদর ভাই। কথাটি ঠিক নয়।

প্রথমজন হলেন হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর ভাগ্নে। যাঁর আব্বা মাওলানা লতীফ আহমদ। তাঁর বাড়ি থানাভবন। আর দ্বিতীয়জনের আব্বা হলেন মাওলানা ফজলুর রহমান। তাঁর বাড়ি দেওবন্দ। থানভী রহ.-এর সঙ্গে তাঁর এ জাতীয় কোনো সম্পর্ক ছিল না।

হাদীস নয়

লেন-দেন কর অপরিচিতের মতো। আর তোমাদের পারস্পরিক আচরণ যেন হয় ভাইয়ের মতো!

تَعَامَلُوْا كَالْأَجَانِبِ، وَ تَعَاشَرُوْا كَالْإِخْوَانِ

বিভিন্ন হাদীসের শিক্ষার আলোকে কথাটি কোনো বিজ্ঞজন বলেছেন। কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লেন-দেনের ক্ষেত্রে তার সাধারণ নিয়ম-কানূন যথাযথ পালন করা উচিত। নতুবা বিভিন্ন সময় পেরেশানিতে পড়তে হয়। আর লেনদেনের সকল বিধি-বিধান ও পারস্পরিক হকগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া তো মাসআলার দিক থেকেই জরুরি। বন্ধুত্ব বা অন্য কোনো সম্পর্কের কারণে এতে শীথিলতা কোনো ভাবেই বাঞ্চনীয় নয়।

তবে যাই হোক, উপরোক্ত উক্তিটি কারো মুখে হাদীস হিসেবে শোনা গেলেও তা মূলত হাদীস নয়। কোনো মনীষীর বাণী মাত্র। আরবী প্রবাদ বাক্যসমূহের একাধিক সংকলনে তা উল্লেখ আছে। যেমন–মাজমাউল আমছাল, মায়দানী পৃষ্ঠা ৭৭০

নভেম্বর ২০১১

ভুল মাসআলা

আততাহিয়্যাতুর শুরুতে কী আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয়?'

কিছুদিন আগে এক দ্বীনী ভাইয়ের সাথে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেন, আমি তো মনে করতাম যে, আততাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ইত্যাদির শুরুতেও আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ পড়া মুস্তাহাব!! তার মতো অন্য কেউ হয়ত এই ভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকবেন তাই এ বিষয়ে লিখছি।

মনে রাখা উচিত যে, আততাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ কিংবা দুআর শুরুতে চাই তা নামাযের ভিতর হোক বা বাইরে, আউযুবিল্লাহ্ অথবা বিসমিল্লাহ্ পড়া মুস্তাহাব নয়; বরং এসব ক্ষেত্রে আউযুবিল্লাহ্ বা বিসমিল্লাহ্ পড়তেই হয় না। এই দুটো জিনিস তো তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা শেষ করে পড়তে

হয় এবং নামাযের বাইরে কোরআন তিলাওয়াতের শুরুতে পড়তে হয়। (যার জন্য তা পাঠের বিধান আছে)

ভুল মাসআলা

প্রত্যেক মুসল্লির জন্য কী ছানার পর আউযুবিল্লাহ্-বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয়?

অনেককে দেখা যায়, তারা প্রত্যেক মুসল্লির জন্য ছানার পর আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ পড়াকে সুন্নত মনে করেন। অথচ এই ধারণা ঠিক নয়। আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ শুধু ঐসব মুসল্লির জন্য সুন্নত, যারা সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। যেমন-ইমাম ও মুনফারিদ (একাকী নামায আদায়কারী)। ইমামের পিছনে ইকতিদা করার কারণে যেহেতু মুক্তাদিকে সূরা ফাতিহা পড়তে হয় না তাই সে আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ও পড়বে না।

একটি ভিত্তিহীন ঘটনা

হে নূহ! কিশতী ভেঙ্গে ফেল

জনৈক কাহিনীকার ওয়ায়েযকে বলতে শুনেছি, *নূহ আ. তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে কিশতী থেকে অবতরণ করার কিছুদিন পর আল্লাহ্ তাআলা আদেশ করলেন, হে নূহ! এখন তো এই কিশতীর প্রয়োজন নেই। তাই এটি ভেঙ্গে ফেল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! এটিকে তো আমি নিজ হাতে বানিয়েছি। এখন কীভাবে ভেঙ্গে ফেলব? আমার তো কষ্ট হবে। আল্লাহ্ তাআলা বললেন, তোমার বদ দুআর কারণে তো আমি আমার সৃষ্টিকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছি। তাহলে ভেবে দেখ, আমার কতটা কষ্ট হয়েছে? তারা তো আমারই হাতে গড়া সৃষ্টি ছিল!!*

অসার ও ভিত্তিহীন এই ঘটনা শুনিয়ে সে লোকদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, আল্লাহ্র কোনো সৃষ্টি কাফির-মুশরিক হলেও আল্লাহ্ তাআলা তাকে ভালবাসেন, তার প্রতি দয়া করেন।

মনে রাখবেন, আগেই বলা হয়েছে এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর কোনো সহীহ সূত্র ও নির্ভরযোগ্য কোনো উদ্ধৃতিও নেই। এটি সম্পূর্ণ মনগড়া একটি ইসরাইলী বর্ণনা মাত্র।

সৃষ্টির প্রতি দয়াপরবশ হয়েই তো আল্লাহ্ তাআলা নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। এমনকি শেষ নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এই ধারার সমাপ্তি ঘটিয়ে তাঁকে

কিয়ামত পর্যন্ত নবী বানিয়েছেন। তাঁর প্রতি নাযিলকৃত আসমানী কিতাব আলকুরআনুল কারীম ও এর কার্যত ও ব্যবহারিক ব্যাখ্যা হাদীস-সুন্নাহ্ এবং তাঁকে প্রদত্ত শেষ শরীয়ত সবকিছুর হেফাযতের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি হঠকারিতা অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌র এ সকল দূতের উপহাস করে, তাদের দাওয়াত কবুল করে না এবং কুফুরীতে লিপ্ত থাকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি তার কোনো ভালবাসা থাকে না। বরং সে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে ক্রোধের পাত্র। কুরআন সাক্ষী যে, কাফিরদেরকে নূহ আ.-এর বদদুআ করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ীই ছিল। বিষয়টি এমনও নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করতে চান নি, শুধু নূহ আ.-এর খাতিরে ধ্বংস করে দিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

আবার এমনও নয় যে, নূহ আ. ওই কাফিরদের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে বদদুআ করেছিলেন। তিনি তো সাড়ে নয়শ বছর তাদেরকে দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যা সম্ভাব্য সকল পন্থায় দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। কিন্তু হঠকারিতার কোনো প্রতিষেধক তো কারো কাছেই নেই! নূহ আ. সম্পর্কে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ কেউ মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াত করলে সহজেই বুঝতে পারবে যে, তাদের বিরুদ্ধে নূহ আ.-এর বদদুআ আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছানুরূপই ছিল। আর সেসব কাফিরদেরকে আল্লাহ্ তাআলা তাদের হঠকারিতা, অহংকার, আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে উপহাসের কারণে ধ্বংস করেছেন।

و قد أشار الذهبي إلى قصة كسر السفينة في ميزان الاعتدال،و أنها منكرة باطلة،

و ليراجع الطلاب كتاب إرشاد القاري إلى صحيح البخاري للمفتي رشيد أحمد

-পৃষ্ঠা : ৪২২-৪২৩

নাম সঠিকভাবে বলা ও লিখা

কারো নাম হুবহু বলা ও লিখা উচিত। এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। নাম সংক্ষিপ্ত করতে হলে এর জন্যও স্বতন্ত্র্য নীতি ও আদব রয়েছে, যেগুলো জেনে সে অনুযায়ী আমল করা উচিত।

আজকাল অনেককে বলতে শোনা যায় যে, তারা আহসানুল ফাতাওয়ার মুসান্নিফকে মুফতী আবদুর রশীদ বলেন। অথচ তাঁর নাম রশীদ আহমদ। আবার কেউ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর নামের সাথে

মুফতী শব্দ যোগ করে সুপরিচিত এই ফকীহকে অপরিচিত বানিয়ে দেয়। তারা জানে না যে, হযরতের নামের সাথে মুফতী শব্দ ব্যবহৃত হয় না। কেননা, তিনি মুফতী নন, উস্তাযুল মুফতীন ওয়াল ফুকাহা (মুফতী ও ফকীহগণের উস্তাদ) ছিলেন।

তেমনিভাবে অনেককে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর নাম মাহমুদুল হাসান লিখতে দেখা যায়। অথচ তাঁর নাম মাহমুদ হাসান। আলিফ-লাম ছাড়া।

এদিকে কিছু লোককে দেখলাম, তারা আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী (১৩৩৩ হি.-১৪২০ হি.) ও আহসানুল ফাতাওয়ার গ্রন্থকার মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী রহ. (১৩৪১ হি.-১৪২২ হি.) দুজনকে একই ব্যক্তি মনে করেন। এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব।

ডিসেম্বর ২০১১

ভুল মাসআলা

কুরবানীর শরীক সংখ্যা কি বেজোড় হওয়া জরুরি?

কিছু লোককে বলতে শোনা গেছে, যে পশুতে সাতজন শরীক হতে পারে তাতে শরীকের সংখ্যা বেজোড় হওয়া জরুরি। সুতরাং একটি গরুতে এক, তিন, পাঁচ বা সাতজন শরীক হতে পারবে। দুই, চার বা ছয়জন শরীক হতে পারবে না।

এটা বিলকুল গলত কথা। একটি গরু যেমন এক ব্যক্তি একা কুরবানী করতে পারে তেমনি দুই থেকে সাত পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যক শরীক একত্র হয়েও কুরবানী করতে পারে। এতে কোনো বাধা নেই। তেমনি শরীকের সংখ্যা জোড় না হয়ে বেজোড় হওয়ার মাঝেও এমন আলাদা কোনো ফযীলত নেই, যার কারণে পাঁচ শরীকের স্থলে ছয় শরীক বা ছয় শরীকের স্থলে সাত শরীক একত্র হয়ে কুরবানী করতে উৎসাহ দেওয়া যায়।

একটি অবাস্তব দাবি

বাস্তবেই কি তাঁরা শিয়াদের ইমাম?

যে সকল ফিরকা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে তাদের মধ্যে শিয়া অতি প্রাচীন ফিরকা। খোদ শিয়ারাও অনেক দল-উপদলে বিভক্ত। বর্তমানে ইসনা আশারিয়্যাহ শিয়া সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তাদের জনসংখ্যাও সবচেয়ে বেশি। এদেরকে ইমামিয়্যাহ শিয়াও বলা হয়।

তাদের একটি গলত আকীদা হচ্ছে, আকীদায়ে ইমামত। তাদের মতে, হযরত আলী রাযি. থেকে হযরত হাসান আসকারী রহ. ও তাঁর পুত্র পর্যন্ত মোট বারজন সম্পর্কে তাদের দাবি এই যে, এঁরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঘোষিত ইমাম। তাঁরা শুধু নবীগণের মতো মাসুমই নন; বরং এমন মাকাম ও মর্যাদার অধিকারী, যে পর্যন্ত আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফেরেশতা এবং কোনো নবী-রাসূলও পৌঁছতে পারে না ...!

এ কথা স্বয়ং রুহুল্লাহ খোমেনীর কিতাব 'আলহুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ'-তেই আছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা সরাসরি কুফরি আকীদা। কোনো মুসলমান এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে না।

আমি এখানে যে কথাটি বলতে চাই তা হল, হাসান আসকারী রহ.-এর পুত্রের অন্তর্ধানের যে ঘটনা, তা সম্পূর্ণ বানোয়াট একটি কাহিনী।

আর আলী রাযি. থেকে হাসান আসকারী রহ. পর্যন্ত এগারজন সম্পর্কে শিয়াদের প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ে অনেকেই তাঁদেরকে সত্যি সত্যি শিয়াদের ইমাম ও নেতা মনে করেন। এটা ঠিক এরকম, যেমন অনেক লোক ঈসা আ.-কে বর্তমান খৃস্টান সম্প্রদায়ের আদর্শ মনে করে।

অথচ বাস্তবতা হল, না খৃস্টানরা হযরত ঈসা আ.-এর আদর্শ গ্রহণ করেছে, না শিয়ারা উপরোক্ত ইমামদের আদর্শের অনুসরণ করেছে; বরং তারা তো নিজেদের আবিষ্কৃত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আচারের অনুসারী। শুধু মানুষকে প্রতারিত করার জন্য ঐ সকল ইমামগণের নাম তারা ব্যবহার করে থাকে। তাঁদের আদর্শ ও শিক্ষার সাথে শিয়াদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁরা তো শিয়াদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড এবং তাঁদের রসম-রেওয়াজ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন। নিচে ওই এগারজন মহান ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

১. আলী ইবনে আবী তালিব রাযি. (হিজরতপূর্ব ২৩–৪০ হিজরী)

২. হাসান ইবনে আলী রাযি. (৩–৪৯ হি.)

৩. হুসাইন ইবনে আলী রাযি. (৪ হি.–৬১ হি.)

৪. যাইনুল আবেদীন আলী ইবনুল হুসাইন রহ. (৩৮-৯৪ হি.)

৫. মুহাম্মাদ ইবনে আলী আলবাকের রহ. (৫৬-১১৪ হি.)

৬. জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আসসাদিক রহ. (৮০-১৪৮ হি.)

৭. মুসা ইবনে জাফর আল কাযেম রহ. (১২৮-১৮৩ হি.)

৮. হযরত আলী মুসা আররেজা রহ. (১৪৮-২০৩ হি.)

৯. মুহাম্মাদ ইবনে আলী আলজাওয়াদ রহ. (১৯৫-২২০ হি.)
১০. আলী ইবনে মুহাম্মাদ আলহাদী রহ. (২১৪-২৫৪ হি.)
১১. হাসান ইবনে আলী আলআসকারী রহ. (২৩২-২৬০ হি.)

এঁদের মধ্যে প্রথমজন তো খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা ছিলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী ও আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম ছিলেন। পরের দুজনও সাহাবী ও আল্লাহ্‌র রাসূলের দৌহিত্র ছিলেন। কোনো সাহাবী কখনোই কোনো বাতিল ফেরকার ইমাম হতে পারেন না।

কোনো বাতিল ফেরকা যদি তাঁদের কারো অনুসারী হওয়ার দাবি করে তাহলে সেটা হবে নির্জলা মিথ্যা।

হযরত যাইনুল আবেদীন, বাকের ও জাফর সাদেক এই তিনজন তাবেয়ী ছিলেন। মুসা কাজেম তাবে তাবেয়ী ছিলেন। বাকি পাঁচজন তাবে তাবেয়ীগণের শাগরেদদের তবকার ছিলেন।

এঁরা সকলেই ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আদর্শের অনুসারী। শিয়াদের আবিষ্কৃত বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সামান্যতম সম্পর্কও তাঁদের ছিল না।

এছাড়া তাঁদের মধ্যে অনেকেই শিয়াদের বাতিল মতবাদ ও কর্মকাণ্ড থেকে সম্পর্কহীনতার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। তাঁদের এ বিষয়ক কিছু বক্তব্য খোদ শিয়াদের কিতাবেও রয়েছে।

সুতরাং ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার যে, না শিয়ারা ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের অনুসারী, না তাঁরা (আল্লাহ্‌ মাফ করুন) শিয়াদের মিথ্যা ও বাতিল আকীদাকে সহীহ মনে করতেন। সুতরাং ঐ সকল বিষয় তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত করার কোনো অবকাশ নেই।

আল্লাহ্‌ আমাদেরকে হক বোঝার ও হককে গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন।

সমাপ্ত

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো

আমাদের প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ